আলো আছে

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স

কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ :
এপ্রিল ১৯৬৫

প্রকাশিকা :
অপর্ণা জানা
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রণ :
জে. ডি. প্রেস
৫২এ কৈলাস বোস স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ :
সুধীর মৈত্র

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :
ওয়েলনোন প্রিণ্টার্স
১২৪/বি, রাজা রাম মোহন সরণী
কলকাতা-৭০০০০৯

১

রামগোপাল মল্লিক লেন কোনদিকে? বাস থেকে নেমে তমাল অনিশ্চিতভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল। বাস যেখানে নামিয়েছে তাকে সেটা চৌরাস্তা। সাংবাদিক এখানেই নামতে বলেছিল। —দেখবেন একটা চৌরাস্তা পড়বে। মিলিটারি ক্যাম্প স্টপেজের ঠিক পরে। ঐ চৌরাস্তায় নেমে ডানদিকের রাস্তা ধরবেন। ঐ রাস্তা দিয়ে কিছুটা হেঁটে একটা স্টেশনারি দোকান। গরাই ব্রাদার্স না কী নাম যেন। ঐ দোকানটার পাশ দিয়ে যে সরু রাস্তা .....। রাস্তা না বলে ওটাকে গলি বলাই ভাল। একটা ট্যাক্সি ঢুকবে এমন স্পেস নেই। তো সেটাকে কী বলবেন? গলিই তো। ঐ গলি দিয়ে ঢুকে একেবারে শেষ মাথায় একটা দোতলা বাড়ি। বেশ পুরনো বাড়ি বুঝলেন? দেখলেই বোঝা যায় অনেকদিন সংস্কার হয়নি। বাড়ির বাসিন্দার আর্থিক অবস্থাও বোঝা যায়। ... যা হোক ঐ বাড়িটাই। ওখানে সুহাস থাকত। মাত্র একুশ বছর বয়স। একেবারে তাজা জোয়ান ছেলে। সেই ছেলে এত সেন্টিমেন্টাল! রাতে একা একা ছাদে উঠে নিজের শরীরে কেরোসিন ঢেলে দেশলাই কাঠি জ্বেলে দিল! একদিক থেকে খুবই সাহসী ছেলে ভাই। আবার অন্যদিক থেকে দেখতে গেলে বড় বেশি ইমোশনাল। কী বলবেন ভাই আপনি সুহাসকে ? ... এ যুগের সঙ্গে যেন ঠিক খাপ খায় না। আ সেন্টিমেন্টাল ফুল।

সাংবাদিক যুবকের নাম কী ছিল? তমাল ভাবতে চেষ্টা করে। চৌরাস্তার মাথায় দাঁড়িয়ে ভাবতে চেষ্টা করে। খুব ব্যস্ত চৌরাস্তা। তার ওপর এখন সকাল এগারোটা। যদিও এটা ছুটির দিন। রবিবার। সুহাসদের বাড়িতে কে আছে তমাল জানে না। সুহাসের মা এবং বাবা দুজনেই নিশ্চয়ই আছে। মাথার ওপরে হয়তো দাদা আছে। দিদিও থাকতে পারে। ছোটভাই কিংবা ছোটবোনও থাকতে পারে। যে বা যারাই থাকুক, রবিবারে নিশ্চয়ই তাদের অনেকেরই বাড়ি থাকার কথা। তাই তমাল অনেক ভেবে সুহাসদের বাড়ি, আজ, রবিবারেই যাওয়ার কথা ভেবেছে।

চৌরাস্তার মোড়ে যথারীতি একজন ট্রাফিক পুলিশও আছে। কাঠের ছোট এবং চৌকো স্ট্যান্ড। পুলিশকর্মীর দাঁড়াবার শেড। ওখানে, ঐ শেডের নীচে দাঁড়িয়ে ঐ কর্মীর ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করার কথা। কিন্তু পুলিশকর্মীটি শেডের ঠিক নীচে দাঁড়ায়নি।

একটু তফাতে সরে গিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ডিউটি করছে। বন্যাস্রোতের মতন গাড়ির পর গাড়ি আসছে। চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে রাস্তা পার হওয়া বেশ কঠিন। চারপাশ দিয়ে গাড়ি আসছে। একটু অসতর্ক হলেই চলন্ত গাড়ির ধাক্কা খেতে হতে পারে। এরকম জায়গায় অটোমেটিক সিগন্যাল হলে খুব সুবিধে হয় পথচারীদের। কিন্তু অটো-সিগন্যাল এই শহরের সর্বত্র চালু হয়নি। একজন বা দুজন পুলিশকর্মীর ওপর যান-চলাচল নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব থাকে। তমাল একসময় মোড়ের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে গিয়ে সাংবাদিকের কথামতন ডান দিকের রাস্তা ধরবে ঠিক করেছিল। পা বাড়াতে যাবে সেইসময় পুলিশকর্মী তাকে বলল—ওরকম তাড়াহুড়ো করলে হবে? আমি কি এখনও হাত তুলে থামতে বলেছি ট্রাফিককে? আপনি সিগন্যাল ইগনোর করে রাস্তা পার হচ্ছেন? মরবেন না কি? কাঁচুমাচু মুখে তমাল নিজেকে সংযত করল। সে নিয়মিত সংবাদপত্র খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে। সে জানে রাস্তা পার হবার ব্যাপারে আজকাল পথচারীদের প্রতি নানা রকম সরকারি নির্দেশ আছে। সেই নির্দেশগুলোর কোনও একটা লঙ্ঘন করলে পথচারীর অনেক টাকা জরিমানা হতে পারে। অনেক সময় কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশ বা সার্জেন্ট নিয়মভঙ্গকারীর স্পট-ফাইন করে। সেই ফাইন বা জরিমানার টাকা সঙ্গে সঙ্গে দিতে না পারলে হাজতবাস অব্দি হতে পারে। তমালের বুক একপলক কেঁপে গেল। তার পকেটের মানিব্যাগে এখন পঞ্চাশ টাকাও হয়তো নেই। কিছু কমই আছে নিশ্চয়ই। ভুলভাবে, বিধি ভেঙে রাস্তা পেরোবার অপরাধে যদি তার পঞ্চাশ টাকার বেশি জরিমানা হয় তা হলে সে এখনই এই টাকা দিতে পারবে না। সে ক্ষেত্রে তার হাজতবাসের সম্ভাবনা থেকে যাবে।

পুলিশকর্মী তমালকে আড়চোখে লক্ষ্য করছিল। এখনও সে হাত তুলে গাড়িকে এগিয়ে যাবার নির্দেশই দিয়ে যাচ্ছে। এবার হয়তো সিগন্যাল পালটে ফেলবে। থেমে যাবে গাড়ির স্রোত। তমাল রাস্তা পার হবে।

— কোতায় যাবেন ভাই আপনি? পুলিশকর্মীটি জিজ্ঞেস করল।

— রামগোপাল মল্লিক লেন। —বেশ আগ্রহ নিয়ে তমাল বলল।

— রামগোপাল মল্লিক লেন? ... এখানে?

— তাই তো আমাকে বলা হয়েছে।

তমাল এরকম উত্তর দেওয়ায় পুলিশকর্মীটি আবার জিজ্ঞেস করতেই পারত কে বলেছে। কিন্তু সে রকম কোনও প্রশ্ন অবশ্য তার কাছ থেকে এল না। সে হাতের সিগন্যাল পালটেছে এতক্ষণে। ট্রাফিক থেমে গেছে। তমাল রাস্তা পার হবার জন্যে পা বাড়িয়েছে। পুলিশকর্মীটি তার উদ্দেশে বলল—সামনে গিয়ে রামগোপাল মল্লিক লেন খুঁজে নিন। কাউকে জিজ্ঞেস করলেই পেয়ে যাবেন। এই ভদ্রতার বিনিময়ে কিছু বলতেই হয়। তমাল মুখ ফিরিয়ে দেখল তাকে। বলল—ধন্যবাদ।

গ্র্যাজুয়েট হয়ে সে একবছর বাড়িতে বসে আছে। চুপচাপ বসে নেই। চাকরির চেষ্টা করে যাচ্ছে। সাধারণ গ্র্যাজুয়েটকে আজকাল কে চাকরি দেবে? চাকরির

আকাল চলছে দেশে। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে তমাল কয়েকটা বেসরকারি সংস্থায় চাকরির জন্যে আবেদন করেছিল। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই উত্তর আসেনি। মাত্র দুটো জায়গা থেকে সে ইনটারভিউয়ের জন্যে ডাক পেয়েছিল। দুটো জায়গাতে তার দুরকম অভিজ্ঞতা হয়েছিল। একটা অফিসে গিয়ে মনে হয়েছিল তারা নানা ধরনের প্লাস্টিকের তৈরি পণ্য বানানো ও চালান দেওয়ার কাজ করে। ইনটারভিউ নেওয়ার সময় তমালকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে সে কলকাতা ছেড়ে বাইরে যেতে পারবে কি না। তমাল জানতে চেয়েছিল, বাইরে মানে কোথায় যেতে হবে। সে উত্তর পেয়েছিল যে, বাইরে মানে ভারতবর্ষের যে কোনও রাজ্যে, যে কোনও অঞ্চলে। আমেদাবাদ, বাঙ্গালোর, চেন্নাই, কটক, লখনউ; এমনকি দিল্লিও হতে পারে। তমাল জানতে চেয়েছিল সে মাইনে কত পাবে আর কী ধরনের কাজ তাকে করতে হবে। কারণ খবরের কাগজে যে বিজ্ঞাপন ঐ সংস্থা প্রকাশ করেছিল তা খুবই সংক্ষিপ্ত ছিল। মাত্র তিন লাইনের। অফিস-অ্যাসিস্ট্যান্ট চাওয়া হয়েছিল। আর বলা ছিল—গ্র্যাজুয়েট ক্যানডিডেটস মে অ্যাপ্লাই। এরকম ছিল বিজ্ঞাপনের ভাষা। অস্পষ্ট। তাই তমালের কাছে প্রাঞ্জল হয়নি কী কাজ তাকে করতে হবে। তমাল জেনেছিল যে তাকে আসলে সেলস-রিপ্রেজেণ্টেটিভের কাজ করতে হবে। কলকাতা ছেড়ে বাইরে গিয়ে। আর তাকে মাসিক বেতন দেওয়া হবে তিন হাজার টাকা। এছাড়া মাল বিক্রয় করতে পারলে কমিশন। যারা ইনটারভিউ নিচ্ছিলেন, তাঁদের সামনে বসে থেকে আর কথাবার্তা বলে বৃথা সময় নষ্ট করতে চায়নি তমাল। কারণ সে তো তিনহাজার টাকার জন্যে কলকাতা এবং নিজের বাবা-মাকে ছেড়ে থাকতে পারবে না। দশ হাজার টাকা হলে সে ভেবে দেখত।

অন্য আর একটা অফিসে ইনটারভিউ দিতে গিয়ে অন্যরকম অভিজ্ঞতা হয়েছিল। সেই অফিসের কাজ কী তা ইনটারভিউ দিতে গিয়ে জেনেছিল তমাল। মেয়েদের জন্যে স্যানিটারি ন্যাপকিন প্রস্তুতকারক সংস্থা ছিল সেটি। একতলা বাড়িতে অফিস। উত্তর কলকাতার প্রান্তে বাগুআটির দিকে। একটা ঘরে চারজন বসে ছিল। ঐ সংস্থার কর্তাব্যক্তি হবে হয়তো। তারাই প্রার্থীদের ইনটারভিউ নিচ্ছিল। একজন তমালকে জিজ্ঞেস করেছিল—আপনি কি আগে কোথাও চাকরি করেছেন? তমাল ঘাড় নেড়েছিল। সবে কয়েকমাস সে তখন গ্র্যাজুয়েট হয়েছে। —ও কোথাও চাকরির অভিজ্ঞতা নেই আপনার? প্রশ্নকারী যেন একটু হতাশ হয়েছিল। আর একজন তমালকে জিজ্ঞেস করেছিল—হোয়াট ইজ ফ্যালোপিয়ান টিউব? তমাল এই প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে পারেনি। আর একজন তমালকে জানিয়েছিল যে, তাদের সংস্থা স্যানিটারি ন্যাপকিন তৈরি করে। সেই পণ্য বাজারে বিকোবার জন্য তারা কয়েকজন মহিলাকে খুঁজছে। এই কথায় তমালের রাগ হয়ে গিয়েছিল হঠাৎ। তার এরকমই হয়। এমনিতে তমাল খুব শান্তশিষ্ট। তাকে দেখলে একজন নিরীহ যুবক বলেই মনে হয়। কিন্তু কেউ না জানলেও তমাল জানে যে, তার ভেতরে একটা আগ্নেয়গিরি

আছে। সেই আগ্নেয়গিরি অন্যান্য অনেক আগ্নেয়গিরির মতন বেশিরভাগ সময়েই ঘুমিয়ে থাকে। কদাচিৎ সেরকম কোনও কারণ ঘটলে তমালের ভেতরে ঘুমিয়ে থাকা সেই আগ্নেয়গিরি হঠাৎ জেগে ওঠে। ফুঁসে ওঠে সবেগে। তার জ্বালামুখ খুলে যায়। তখন তমাল থরথর করে কাঁপে। আগ্নেয়গিরির মুখ থেকে ঝলকে ঝলকে লাভা, পোড়া ছাই নির্গত হতে থাকে। তখন তমাল অনেককিছু করে ফেলতে পারে। অন্যায় করেছে এমন কোনও মানুষের ওপর সে রাগে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। তার কলার ধরে হিড়হিড় করে টেনে এনে তাকে উত্তম-মধ্যম দিতে পারে। এ সময় তমাল অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে না। বিপক্ষের থেকে সে কতটা শক্তিশালী সেটাও হিসেবের মধ্যে রাখে না। তার চোখের সামনে একটা অন্যায় ঘটেছে। সেই অন্যায়ের সে প্রতিবাদ করবেই। তার এই প্রতিবাদী স্বভাবের জন্যে অনেক বিপদের মধ্যেও পড়তে হয়েছে তাকে। এমনকী, বন্ধু-বিচ্ছেদও হয়েছে। সুজয় তমালের সঙ্গে একই কলেজে একই ক্লাসে পড়ত। পার্ট-টু পরীক্ষার আগে সুজয় হঠাৎ একদিন তমালের বাড়িতে এসেছিল। কলেজের কেরানি রথীন মণ্ডল নাকি সুজয়কে প্রস্তাব দিয়েছিল যে বেশ কিছু টাকা খরচ করলে পার্ট-টু পরীক্ষার প্রশ্নপত্র আগাম জানা যাবে। যে প্রেস থেকে প্রশ্নপত্র ছাপা হয় সেই প্রেসে নাকি রথীনের জানাশোনা আছে। সে অনেকদিন এই কম্ম করছে। সুজয় জানিয়েছিল যে, সে আরও চারজন বন্ধুর সঙ্গে কথা বলেছে। তারা সুজয়ের প্রস্তাবে রাজি হয়েছে। প্রত্যেককে দু-হাজার টাকা দিতে হবে। মোট দশহাজার টাকা রথীনের হাতে তুলে দিলে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পরীক্ষার ঠিক দুদিন আগে এসে যাবে তাদের হাতে। সুজয়ের কাছ থেকে এরকম প্রস্তাব পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তমালের ভেতরে সেই ঘুমিয়ে-থাকা আগ্নেয়গিরি ফুঁসে উঠেছিল সবেগে। থরথর করে কাঁপছিল তমাল। চোখ দুটো লাল হয়ে গিয়েছিল রাগে। সে ঘুঁসি পাকিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সুজয়ের ওপর। মাটিতে পড়ে গিয়েছিল সুজয়। সে ধারণাই করতে পারেনি যে রোগা, নরম-স্বভাবের তমাল এরকম ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে পারে। অনেকদিন দেখছে সুজয় তমালকে। এরকম ক্রোধে অন্ধ অবস্থায় দেখতে হয়নি কোনওদিন।

তমাল তার বন্ধুকে মাটিতে পেড়ে ফেলে বলে যাচ্ছিল—তোর জিভ ছিঁড়ে নেব হারামজাদা। তুই ঘুষ দিয়ে কোশ্চেন বের করবি। তোর এই কথা বলতে বাধল না? যদি ঠিকমতন প্রিপারেশান না হয় ড্রপ দেব, পরের বছর পরীক্ষায় বসা মেনে নেব। কিন্তু দু-নম্বরি করে পরীক্ষা পাস করা? রাস্কেল তোর মুখে এতটুকু বাধল না?

সে যাত্রা সুজয়কে তমালের হাতে বেশি মারধর খেতে হয়নি। কারণ তার আগেই তমালের মা এসে দুজনকে আলাদা করে দিয়েছিলেন। সুজয় সেই যে অপমানিত হয়ে তমালের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল, তার পর আর কোনওদিন সে বন্ধুর মুখোমুখি হয়নি। পার্ট-টু পরীক্ষায় তমাল যে খুব ভালো কিছু করতে পেরেছে তা নয়। ঠিক ফরটি পারসেন্ট মার্কস সে পেয়েছে। পার্টওয়ান পরীক্ষায় পেয়েছিল ফরটি

ওয়ান পারসেন্ট। পার্ট-ওয়ান আর পার্ট-টু পরীক্ষা মিলিয়ে সর্বসাকুল্যে ঐ ফরটি পারসেন্ট। খুব আহামরি রেজাল্ট কিছু নয়। এরকম রেজাল্ট নিয়ে খুব বেশিদূর যাওয়া যায় না। তবে অন্য বন্ধুর মুখে সে শুনেছিল যে সুজয় বেশ ভালোই রেজাল্ট করেছে পরীক্ষায়। সে নাকি ডিসটিংকশান নিয়ে পাস করেছে।

তমালের জীবনের আর একটা ঘটনার কথাও এখানে বলা যেতে পারে। একদিন সে বাসে যাচ্ছিল। সে বাসে উঠেছিল ধর্মতলায়। হাওড়ার শালকিয়ায় যাবে। তার সঙ্গেই আর একজন যাত্রী উঠেছিল। পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ বছরের প্রৌঢ়। পোশাক-পরিচ্ছদে খুব ফিটফাট। হাতে অ্যাটাচি। লম্বা এবং বলিষ্ঠ চেহারা। বাসটা ছিল মিনি। তমাল এবং সেই লোকটি পাশাপাশি একটা সীটে বসেছিল।

ক্রমশ বাসে ভিড় বাড়ছিল। একসময় যাত্রীবোঝাই হয়ে গেল বাস। তার পর চলতে আরম্ভ করেছিল। প্রত্যেক সিটের সামনেই যাত্রীরা দাঁড়িয়ে ছিল। ঠাসাঠাসি ভিড়। তার মধ্যেই বাসের কনডাকটর হাত বাড়িয়ে টিকিট কাটছিল যাত্রীদের। তমালের সামনে যখন টিকিট—এই শব্দ উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে কনডাকটরের রোগা, কালো হাত এগিয়ে এসেছিল, তখন সে সঙ্গে সঙ্গে কেটেছিল তার টিকিট। কিন্তু পাশের সেই সুবেশ যাত্রী গম্ভীরভাবে বলেছিল—দিচ্ছি। কনডাকটর সরিয়ে নিয়েছিল তার হাত। এরকম অনেক সময় হয়ে থাকে। কোনও কোনও যাত্রী টিকিট চাইলেই সঙ্গে সঙ্গে টিকিট কাটে না। নিজের সময় মতন কেটে থাকে। কিন্তু কোনও কোনও যাত্রী বাস থেকে নামার সময়েও টিকিট কাটতে ভুলে যায়। সেদিনও সে রকমই হয়েছিল। হাওড়ায় বাস পৌঁছনোর অনেক আগেই স্ট্র্যান্ড রোডে একটা স্টপে অ্যাটাচি হাতে লোকটি নেমে যাচ্ছিল। কনডাকটর দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল। সে আবার জিজ্ঞেস করেছিল—টিকিট ! সেই যাত্রী গম্ভীরভাবে বলেছিল—হয়ে গেছে। বলে নেমেই যাচ্ছিল। বাস তখন যানজটে আটকে ছিল। লোকটি প্রায় নেমেই গিয়েছিল। কনডাকটরের মনেও লোকটির চেহারা দেখেই হয়তো কোনও সন্দেহ হয়নি। কিন্তু তমাল উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। তার ভিতরে সেই ঘুমিয়ে থাকা আগ্নেয়গিরি আবার উঠেছিল ফুঁসে!

ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে গলদঘর্ম হতে থাকা যাত্রীদের অবাক করে, ঠেলেঠুলে তমাল বাসের ফুটবোর্ডের কাছে চলে এসেছিল। কনডাকটরকে বলেছিল ভাই এই লোকটিকে আপনি নামতে দেবেন না। ইনি কিন্তু মিথ্যে কথা বলেছেন। ইনি টিকিট করেননি। এরকম সাধারণত ঘটে না। তাই কনডাকটর ছোকরাটি ঘাবড়ে গিয়েছিল। সে কিছু বলার আগেই অবশ্য অ্যাটাচি হাতে লোকটা তমালকে বলেছিল

—কী যা তা বলছ ভাই? পাগল নাকি?

—আপনি আমাকে তুমি বলছেন কেন? ভদ্রতা জানেন না? আমি চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি আপনাকে। আপনি টিকিট করেননি। আপনি আমার পাশে বসেছিলেন। আমি সব লক্ষ্য করেছি। বাস ততক্ষণে স্টপে থেমে গেছে। অভিযুক্ত লোকটা রাস্তায় নেমে

পড়েছে।

তমাল চেঁচাচ্ছিল—টিকিট দেখান?

লোকটা আহত পশুর মতন গর্জে উঠেছিল—তোকে টিকিট দ্যাখাবো কেন রে বাঞ্চোৎ? তুই কে?

—তবে রে শালা! তুই আমাকে খিস্তি করছিস? শালা জোচ্চোর! মিথ্যেবাদী! —বলতে বলতে তমালও নেমে পড়েছিল বাস থেকে রাস্তায়। বাস কিছুক্ষণ থেমে ছিল। যেন চালক বুঝতে পারছিল না বাস ছাড়া উচিত হবে কি না। আশপাশ দিয়ে হু হু করে অন্যান্য গাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে। বাসের যাত্রীরা হইহই করে উঠেছিল। আশ্চর্য! কনডাকটর ছোকরা কিংবা অন্য কেউ সেদিন তমালের সমর্থনে এগিয়ে আসেনি। বাস সবেগে ছুটেছিল আবার সামনের দিকে। তমালের সেদিকে কোনও হুঁশ ছিল না। অ্যাটাচি হাতে লোকটা অপরাধও করেছে। আবার বিশ্রি একটা গালাগালও দিয়েছে। তার সঙ্গে আর ভদ্রতা করা যায় না। তমাল ছুটে গিয়ে লোকটার কলার চেপে ধরে বলেছিল—জামাকাপড় পরলেই ভদ্রলোক হওয়া যায় না। বুঝেছিস? বাসে উঠে টিকিট না কেটে কনডাকটরকে ঠকালি। আবার তার ওপর গালাগাল? আমার পা ধরে ক্ষমা চাইতে হবে! লিকপিকে একটা ছোকরার যে এত সাহস হবে তা ঠিক ধারণাতে ছিল না লোকটার। কয়েক মুহূর্ত সে যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। তারপরই অবশ্য স্ব-মূর্তি ধরেছিল লোকটা। প্রথমে সে তমালের নাকে সজোরে একটা ঘুঁসি ঝেড়েছিল। এত জোর ছিল সেই ঘুঁসির যে তমাল টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গিয়েছিল মাটিতে। তারপর লেকটা তমালের বেসামাল শরীরে পরপর লাথি ঝেড়েছিল। যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গিয়েছিল তমাল। পথচারীরা অনেকেই ছুটে এসেছিল। লোকটাকে চেপে ধরেছিল কয়েকজন। সে সব গ্রাহ্য না করে লোকটা নিজেকে কোনওমতে ছাড়িয়ে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। মিশে গিয়েছিল ভিড়ের মধ্যে। তমালের নাক দিয়ে ঝরঝর করে রক্ত পড়ছিল। সে কোনওমতে উঠে বসেছিল। পথচারীদের সাহায্যে একটু পরে দাঁড়িয়ে ছিল। দুজনের কাঁধে ভর দিয়ে সামনের টিউবওয়েল থেকে জল নিয়ে চোখেমুখে ঝাপটা দিয়েছিল। পথচারীরা তাকে জিজ্ঞেস করেছিল—লোকটা ওরকমভাবে আপনাকে মেরে পালালো কেন? কতদিনকার শত্রুতা?

তমাল শুকনো হেসে বলেছিল—লোকটা জোচ্চোর। মিথ্যেবাদী। বাসে উঠে টিকিট না কেটে পালাচ্ছিল। আমি ওকে গিয়ে ধরতেই গালাগাল দিল। তারপর মারামারি বেধে গেল আমাদের......। কীরকম অন্যায় বলুন তো?

বাসের টিকিট না কাটা বোধহয় গুরুতর অপরাধ বলে মনে হয়নি পথচারীদের। তারা একে একে কাটতে শুরু করেছিল। তমালের সারা শরীরে যন্ত্রণা। জামাকাপড় ধুলোয় ধূসরিত। ট্রাউজারের হাঁটুর কাছে ছিঁড়েও গিয়েছিল। সে সব নিয়ে তমালকে বাড়ি ফিবতে হয়েছিল। বাবা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের বড় অফিসার নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে

হয় তমালের বাবাকে। প্রায়ই রাত করে বাড়ি ফেরে। অনেকদিন আবার বাইরে যেতে হয়। রাতেও বাড়ি ফেরা হয় না। সেদিনও বাবাকে বাইরে থাকতে হয়েছিল গুরুত্বপূর্ণ কাজে। মা বাড়িতে একা ছিল। তমালের সেই বিধ্বস্থ চেহারা দেখে আঁতকে উঠেছিল মা। তমাল কী ভাবে সত্যি কথা বলবে? সে জানিয়েছিল যে বাস থেকে নামতে যাবার মুহূর্তে আচমকা বাস ছেড়ে দেওয়ায় সে পড়ে যায়। আর তাতেই এই অবস্থা।

সেদিন রাতে শরীরের যন্ত্রণার থেকে মনের বেদনা বেশি অনুভব করেছিল তমাল। রাত গভীর হয়ে এসেছিল। কিন্তু তবুও ঘুম আসেনি তমালের। অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে কাঁদছিল তমাল। নিঃশব্দে কাঁদছিল। অসৎ মানুষদের দেখলেই তমাল কীরকম বেসামাল হয়ে যায়। মিথ্যেবাদী মানুষদের দেখলেই তমালের মনে হয় তার বুকে কেউ ভোজালি বসিয়ে দিয়েছে আমূল। সেদিনও মানুষের খারাপ এবং নির্দয় রূপ দেখে তমাল খুব দুঃখ পেয়েছিল। এসব দুঃখের কথা কারোর কাছে ঠিক প্রকাশ করা যায় না। তাই রাতের অন্ধকারে একা একা শুয়ে অনেকক্ষণ কেঁদেছিল তমাল। তার চোখের জলে মাথার বালিশ ভিজে সপ্‌সপে হয়ে উঠেছিল।

স্যানিটারি ন্যাপকিন তৈরি করা হয় যে সংস্থায় সেখানে ইনটারভিউ দিতে গিয়েও রাগে তমালের মাথা জ্বলে উঠেছিল। যাঁরা ইনটারভিউ নিচ্ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন যখন জানালেন যে, আমরা মহিলা ক্যানডিডেটকেই প্রেফার করব। তখন তমাল উত্তেজিত গলায় বলেছিল—সেটা অ্যাড-এ আলাদাভাবে মেনশান করেননি কেন? এভাবে আমাদের ডেকে এনে হ্যারাস করার মানে কী? ইজ ইট আ ফার্স?

যাঁরা ইনটারভিউ নিচ্ছিলেন, তাদের চারজনের মধ্যে তিনজন পুরুষ এবং একজন মহিলা। সেই মহিলার ঠোঁটে হাসির রেখা দেখা দিয়েছিল। তিনি বেশ পুরুষালী স্বরে জানিয়েছিলেন—ওমেন ক্যানডিডেটদেরকে যে প্রেফার করা হবে সেটা আমাদের অ্যাডে বলা ছিল। আপনি খেয়াল করেননি।

তমালের ততক্ষণে মনে হচ্ছিল কোথাও কোনও ভুল হচ্ছে কি? সত্যিই কি বিজ্ঞাপনে সেটা বলা ছিল? সে ঠিক খেয়াল করেনি। নাকি এরা বাজে কথা বলছে? রীতিমতো ধাঁধায় পড়ে গিয়েছিল তমাল। তবুও তার মনে হয়েছিল এটা অযৌক্তিক। যে কোনও চাকরিতেই পুরুষ এবং নারীর সমান অধিকার। কিছু চাকরি পুরুষদের জন্যে। কিছু চাকরি মহিলাদের জন্যে। এরকম পৃথকীকরণ হওয়া ঠিক নয়।

টেবিলের ওপ্রান্ত থেকে একজন পুরুষ বলেছিলেন—আপনি কি আর কিছু বলবেন?

—হ্যাঁ। বলব বই কী। মহিলাদের এই চাকরিতে আপনারা প্রেফারেন্স দিচ্ছেন কেন? আপনারা কি মনে করেন এই সংস্থার উৎপাদিত পণ্য বিক্রির জন্যে পুরুষেরা ঠিক প্রচার করতে পারবে না?

তিনজন পুরুষই সেই পুরুষালী গলার মহিলার দিকে তাকিয়েছিলেন। তমাল ততক্ষণে লক্ষ্য করছিল মহিলার উগ্র ধাঁচের সাজগোজ। মধ্যবয়সিনী হওয়া সত্ত্বেও

তিনি ভীষণ পুরু লিপস্টিক লাগিয়েছেন ঠোঁটে। চোখের পাতায় মাসকারা টাইপের কিছু। বেশ পৃথুলা মহিলা। দু-হাতের দশটি আঙুলই ম্যানিকিওর করা। হাতের আঙুলের যে রং সেই রং মহিলার কানের পাথরে। পরনে শাড়ি নয়। সালোয়ার কামিজ। মহিলাদের এই ধরনের সাজগোজ এবং বেশভূষা দেখলেই তমালের মনে কিছু প্রশ্ন আসে। সেগুলো হল এরকম—এই ধরনের মহিলাদের প্রতিদিন সাজগোজ করার জন্যে কতটা সময় লাগে? ওদের কি বাড়িতে অন্য কাজ করতে হয় না? ওদের কত রকমের কানের দুল, কপালের টিপ এবং সাজসজ্জার আরও অন্যান্য উপাদান আছে? নিজেদের এরকমভাবে প্রতিদিন সাজাতে মাসে কত টাকা খরচ হয়?.......

তিনজন পুরুষ এমনভাবে মহিলার দিকে তাকিয়েছিলেন যেন তমালের প্রশ্নের উত্তর একমাত্র তাঁরই জানা আছে। একটু হেসে মহিলা বলেছিলেন—আসলে কী জানেন তো ভাই? স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যাপারটা এনটায়ারলি মহিলাদের ব্যাপার। কোনও বাড়িতে গিয়ে একজন পুরুষ সেলস-রিপ্রেজেন্টেটিভ সেই বাড়ির মহিলাকে যদি স্যানিটারি ন্যাপকিন বিষয়ে বলতে শুরু করে তাহলে সেই মহিলা অফেনডেড ফিল করতে পারেন। বিরক্ত হতে পারেন তিনি। লজ্জাও পেতে পারেন। ইন দ্যাট কেস আওয়ার পারপাস উইল নট বি সার্ভড। কিন্তু ব্যাপারটা অন্যরকম হবে যদি একজন মহিলা বাড়ির ফিমেল মেম্বারের কাছে আমাদের ন্যাপকিনের স্পেশ্যাল ফিচারগুলো এক্সপ্লেন করেন। আই থিংক আই হ্যাভ বিন এবল টু মেক দ্য ম্যাটার ক্লিয়ার টু ইউ।.... কিন্তু তমাল হাল ছাড়বার পাত্র নয়। তার মনে হয়েছিল, এঁরা মিথ্যে কথা বলছেন। ঐ বিজ্ঞাপনে মহিলাদের ব্যাপার আলাদাভাবে উল্লেখ করা ছিল না।

—ইউ আর মিসগাইডিং মি! তমাল বলেছিল। —আপনাদের বিজ্ঞাপনে ছিল না যে মহিলাদের প্রেফার করা হবে। ওরকম উল্লেখ থাকলে আমি নিজে আসতুম না।

—মি. তমাল রায়! আমরা আপনার সঙ্গে আর এ ব্যাপারে ইনটারঅ্যাকট করতে চাই না। আপনি বাড়ি ফিরে যান এবং আপনার নিউজপেপার খুলে আমাদের অ্যাডটা ভালোভাবে পড়ুন। ওকে। গুড ডে। বাই বাই।

এরপর কি আর বসে থাকা যায়। খুব অপমানিত লেগেছিল তমালের। হতাশও। ঐ অফিস থেকে রেগেমেগে বেরিয়ে আসার সময় তমাল দেখেছিল পাশের ঘরে বেশ কয়েকটা চেয়ার। আর সেই চেয়ারগুলো মহিলাদের দ্বারাই ভর্তি ছিল। তাহলে কি তারই ভুল? সে নিজেই এদের বিজ্ঞাপন খুঁটিয়ে পড়েনি? বাড়ি ফিরে তমাল তাকের যেখানে খবরের কাগজ ডাঁই করে রাখা থাকে সেখানে হাতড়ে পুরোনো কাগজ বের করেছিল। বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠা খুলেছিল। চোখে পড়ে গিয়েছিল তার। ঐ সংস্থার বিজ্ঞাপনটা সে নিজেই গাঢ়ভাবে কালি দিয়ে দাগ দিয়ে রেখেছিল। আসলে এই ধরনের বিজ্ঞাপনগুলো ছোট ছোট। এবং ভীষণ ঘেঁষাঘেঁষিভাবে ছাপা হয়। সংস্থার

প্রতিনিধিরাই ঠিক। একেবারে শেষ লাইনে ছোট করে উল্লেখ ছিল—মহিলা প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। সেই বিশেষ লাইনটা তমালের যে চোখে পড়েনি তার কারণ হল, অতি ক্ষুদ্র আয়তনের সেই বিজ্ঞাপনের সঙ্গে লাইনটা ঠিক ছাপা হয়নি। লাইনটা ভেঙে নীচের অন্য এক বিজ্ঞাপনের শুরুতে ঢুকে গেছে। এটা নিশ্চয়ই ঐ সংস্থার ত্রুটি নয়। সংবাদপত্রের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের ত্রুটি। তমাল সেজন্যেই লাইনটা খেয়াল করেনি। ফলে তাকে এক বিভ্রাটের মধ্যে পড়তে হয়েছিল। অপমানিতও হতে হয়েছিল তাকে।

২

এখন যে একটা চৌরাস্তার মোড়ে পৌঁছে তমাল রামগোপাল মল্লিক লেন নামে রাস্তা খোঁজায় ব্যস্ত তারও একটা আছে। গত পরশুদিন তমাল সংবাদপত্রে একটা খবর পড়েছিল। চমকে ওঠার মতন খবর। সেটা পড়ার পর তমালের মাথা যেন ঘুরে গিয়েছিল। একবার নয়। বারবার পড়েছিল খবরটা। তমালদের বাড়িতে একটাই বাংলা দৈনিক রাখা হয়। সেই দৈনিকের পাঁচ পৃষ্ঠায় মাঝের কলমে খবরটা ছাপা হয়েছিল। ঐ পৃষ্ঠায় শহর এবং শহরতলির নানা খবর ছাপা হয়। সেদিনকার খবরটা চোখে পড়েছিল তমালের তার কারণ বিশেষভাবে বক্সে ছাপা হয়েছিল সেটা। খবরের হেডলাইনস ছিল—একুশ বছর বয়সের এক যুবকের আত্মহনন। খবরটা পড়ে এতই আলোড়িত হয়ে পড়ে তমাল যে সেদিন সে সংবাদপত্রের অন্য খবরগুলোর দিকে আর মনোনিবেশ করতে পারেনি। খেলার পৃষ্ঠায় সেদিন ক্রিকেটের অনেক খবর ছিল। মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গলের ফুটবল ম্যাচের খবর ছিল। খেলার খবর অন্য অনেকের মতন তমালেরও খুব প্রিয়। প্রতিদিন সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খেলার পৃষ্ঠার সমস্ত খবর পড়ে। কিন্তু সেদিন সে আর অন্য খবরের দিকে তাকিয়েই দেখতে পারেনি। প্রথমে কিছুক্ষণ নিজের ঘরে চুপচাপ বসে ছিল। ভাবতে চেষ্টা করেছিল ঐ খবরের ভয়াবহতা। চোখের সামনে যেন সে দেখতে পাচ্ছিল সুহাস বন্দ্যোপাধ্যায় নামে তারই বয়সা এক যুবক রাতের অন্ধকারে নির্জন ছাতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিজের হাতে নিজের শরীরে ঢেলে দিচ্ছে কেরোসিন। তারপর একটা দেশলাই কাঠি জ্বেলে........। নিজের চোখে যেন দৃশ্যটা দেখতে পেয়েছিল তমাল। শিউরে উঠেছিল ভীষণ। ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল বাড়ি থেকে। গলির মোড়ে পত্র-পত্রিকা বিক্রির একটা গুমটি। সেই গুমটি থেকে সে, কিনেছিল সেদিনকার আরও তিনটে বাংলা দৈনিক। তার পর ছুটতে ছুটতে ফিরে এসেছিল বাড়িতে। তখন সকাল নটা। অফিস যাবার জন্যে তৈরি হওয়ার সময় বাবার। মা কিচেনে। কাজের মেয়ে পার্বতী মশলা বাটা থেকে কুটনো কোটা সবই করে। কিন্তু রান্নাবান্নার ব্যাপারে পার্বতীর ভূমিকা শুধুই সহায়কের। আসল রান্না নিজের হাতেই

রেখেছে মা—অনিতা। তমাল যখন একগোছা সংবাদপত্র কিনে বাড়িতে ঢুকছে তখন ঢাকা বারান্দায় দেয়ালে ঝোলানো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শৈবাল দাড়ি কামাতে ব্যস্ত। ছেলের হাতে সংবাদপত্রের গোছা দেখে তার ভুরু কুঁচকে যায়। থুতনির দাড়ি কাটার সময়েই সতর্ক হতে হয় বেশি। অসতর্ক হলেই খুচ করে কেটে যাবার সম্ভাবনা। তমাল উত্তেজিতভাবে দরজা ঠেলে বাড়িতে ঢুকেছিল। দরজা খোলাই ছিল। এ বাড়িতে দরজা সচরাচর খোলা থাকে না। অনিতা এ ব্যাপারে খুবই সতর্ক। পার্বতীকে সে সবসময়ে ব্যস্ত রাখে নানা কাজে। তার মধ্যে দরজা বন্ধ বাখা একটা অন্যতম কাজ। আজকাল চারদিকে যা ঘটছে! এই তো কিছুদিন আগে তমালদের পাড়ারই অন্য প্রান্তে এক বাড়ির দরজা খোলা পেয়ে দুপুরবেলা ঢুকে পড়েছিল তিনজন অচেনা লোক। তখন বাড়িতে তেমন কেউ ছিল না। অন্তত কোনও পুরুষ ছিল না। বাড়ির গৃহিণী ছিলেন। কাজের মেয়ে ছিল। আর গৃহিণীর বৃদ্ধা শাশুড়ি। তিনজন অচেনা লোক আসলে ছিল ডাকাত। ঐ বাড়ির দরজা যে দুপুরবেলা খোলা ছিল তারা কীভাবে খবর পেয়েছিল কে জানে। তিনজনের কাছেই অস্ত্র ছিল। রিভলবার, ভোজালি। অস্ত্র দেখিয়ে ওরা তিনজনের মুখ বেঁধে দিয়েছিল। তার পর তিনজনকেই একটা ঘরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দেয়। বাড়ির বড় স্টিল আলমারির চাবি তারা গৃহিণীর গলায় ভোজালি বসিয়ে কেড়ে নিয়েছিল। মুখ বাঁধা ছিল বলেই তিনজনের কেউ টুঁ শব্দটি করতে পারেনি। বেশ কিছু গয়না এবং টাকা-পয়সা নিয়ে ডাকাতদল পালিয়ে গিয়েছিল। এই ঘটনার পর থেকে অনিতা পার্বতীকে কড়া আদেশ দিয়ে রেখেছে। বাড়ির দরজা যেন কখনোই খোলা না থাকে।

তমাল এত উত্তেজিত ছিল যে, সে খবরের কাগজের গাদা হাতে নিয়ে দরজার ছিটকানি না লাগিয়েই সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে যাচ্ছিল। পার্বতী কিচেনে। কাজে ব্যস্ত ছিল। সুতরাং দরজা ভেজানো অবস্থাতেই হয়তো থেকে যেত। সেরকম থাকলেই সকালবেলাতেই ডাকাতদল এসে বাড়িতে চড়াও হবে অবস্থাটা হয়তো এরকম নয়। কিন্তু তবুও বাড়িতে ঢুকে তমাল দরজাটা বন্ধ করবে না কেন? এরকম অভ্যাস তো ভালো নয়। শৈবাল দাড়ি কামাতে ব্যস্ত থাকলেও পায়ের আওয়াজ পেয়ে সে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেছিল। তমাল তখন সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা রেখেছে। রেজর ধরা ডান হাত থেমে গিয়েছিল শৈবালের। সে ডেকেছিল—তমাল! তমালের পা থেমে গিয়েছিল। সে বাবার দিকে জিজ্ঞেস করেছিল—কিছু বলছো?

—বাইরে গিয়েছিলে?

—হ্যাঁ।

—কিছু কিনতে?

—খবরের কাগজ।—তমাল তার বগলের নীচে চেপে রাখা কাগজের দিকে ইঙ্গিত করেছিল।

—এত কাগজ?........শোনো—তুমি বাইরে থেকে এলে দরজা বন্ধ করলে না?

—স্যরি। ভুল হয়ে গেছে। তমাল উঠোনে নেমেছিল দ্রুত। দরজায় ছিটকিনি তুলে দিয়েছিল।

—অনেক কাগজ কিনেছো মনে হচ্ছে?—শৈবালের গালে সাবান শুকোচ্ছিল। তবুও রেজরসহ তার হাত থেমেছিল। তমালের চোখ মুখে কীরকম যেন উত্তেজনার আভাস। কী হয়েছে ওর?

—হ্যাঁ তিনটে বাংলা কাগজ।

—আমাদের কাগজ নিয়ে চারটে।........আজকে এত কাগজ কিনলে? বিশেষ কোনও খবর টবর বেরিয়েছে? ......ও গতকাল তো মোহন বাগান ইস্টবেঙ্গলের খেলা ছিল। মোহনবাগান হেরেছে যথারীতি। ও ব্যাটারা চিরকালই হারে ইস্টবেঙ্গলের কাছে।......তো সেই খবর পড়ার জন্যে আরও তিনটে কাগজ কিনতে হল?

—ঠিক তা নয়।—তমাল বলেছিল। কিচেন থেকে ভেসে এসেছিল ছ্যাঁক শব্দ। অনিতা হয় কড়াইয়ের গরম তেলে মাছ ছেড়েছিল, আর নয়তো ডাল সাঁতলাতে দেবার শব্দ ছিল সেটা।—আসলে মনে হল চাকরির খবর অন্য কাগজগুলোতেও কী বেরিয়েছে দেখি একটু।

—তা হলে সব বাংলা কাগজ কিনতে হল কেন? অন্তত একটা ইংরিজি কাগজ তো কেনা যেত! চাকরির খবর ইংলিশ নিউজপেপারেই তো বেশি থাকে.......।

—সেটা অবশ্য ঠিকই।—এরপর থেকে সেটা খেয়াল রাখব।—এই বলে তমাল আবার ফিরেছিল। সিঁড়ি দিয়ে উঠে যাচ্ছিল দোতলায়। শৈবাল আবার ডাকল। তার হঠাৎ মনে হয়েছিল চাকরির ব্যাপার নিয়ে ছেলের সঙ্গে ভালোভাবে কথা বলা হয় না। বস্তুত ছেলের সঙ্গে কোনও ব্যাপারেই বোধহয় আজকাল কথা বলা হয় না। সে আর বাড়িতে থাকে কতক্ষণ? তাই কিছুটা বাবাসুলভ ভঙ্গিতে সে তখনই জিজ্ঞেস করেছিল তমালকে—চাকরি বাকরির ব্যাপারে কী ভাবছ? এবার তো কিছু একটা পাওয়া দরকার।

—সে তো বটেই।

—ডব্লিউ বি. সি. এস.-এ বসবে বললে যে? প্রিপারেশান নিচ্ছো?

—প্রথমেই ডব্লিউ বি সি এস? ...ওটা তো খুব শক্ত পরীক্ষা।

—এই তো তোমার দোষ। প্রথম থেকেই নেগেটিভ অ্যাটিচিউড। ....আরে আদাজল খেয়ে লেগে পড় না। তারপর দেখা যাবে। বুঝেছ।

—হ্যাঁ।

—এবার তমাল আর দাঁড়ায়নি। উঠে গিয়েছিল সিঁড়ি ধরে দোতলায়। নিজের ঘরে ঢুকেছিল। আর ছেলেকে একটু উপদেশ বা পরামর্শ দিতে পেরে শৈবালের বেশ তৃপ্তি হয়েছিল মনে। সাময়িক তৃপ্তি। নিজের ব্যাপার স্যাপার নিয়ে এত ব্যস্ত থাকে শৈবাল যে ছেলের খোঁজ-খবর নেওয়াই হয় না। হয়তো কোনও সমাজবিদের ভাষায় ছেলের সঙ্গে শৈবালের এক নিঃশব্দ এবং ধারাবাহিক কমিউনিকেশন গ্যাপ

তৈরি হয়ে যাচ্ছে। কী আর করা যাবে। এ বোধহয় যুগেরই নিয়ম। গালে সাবান শুকিয়ে কড়কড়ে হয়ে গিয়েছিল। ব্রাশে সাবান লাগিয়ে আবার গালে ঘষল শৈবাল। আজ তো তার বিশেষভাবে, সতর্কতা নিয়ে দাড়ি কামানো প্রয়োজন। আজ সে সুধার কাছে যাবে। গালে দাড়ির বিন্দুমাত্র চিহ্ন সুধার একেবারেই পছন্দ নয়। অবশ্য গোঁফ সে পছন্দ করে। শৈবাল একবার ভেবেছিল গোঁফ একেবারে কামিয়ে ফেলবে। সেই কথা শুনে সুধার সে কী রাগ! সে বলেই ফেলেছিল শৈবালকে—গোঁফ যদি কামাতে চাও তা হলে আমার কাছে আসবে না। পুরুষেরা বৃহন্নলা সাজলে আমার যাচ্ছেতাই লাগে। পুরুষরা মেয়েদের মতন কেন হবে?

উত্তরে শৈবাল কী বলেছিল সেটা সেই মুহূর্তে মনে পড়েছিল। মনে মনে সে হেসেছিল এক চোট। শৈবাল গোবেচারা মুখ করে বলেছিল—পুরুষ কি শুধু গোঁফেই প্রমাণ হয়? আর কিছুতে প্রমাণ হয় না? আর কিছু পাও না বুঝি আমার কাছ থেকে।

ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে সুধার ফর্সা মুখ গোলাপি আভা নিয়েছিল। সে অস্ফুটে বলেছিল —যাহ! সবসময় শুধু অসভ্যতা না?.....সুধার বয়স কম নয়। চল্লিশোত্তীর্ণ নারী সে। তা হলেও সে আজও কুড়ি বাইশ বছরের যুবতীর থেকেও হয়তো আকর্ষণীয়া। আজ সুধার মুখে লজ্জাসহ— যাহ! সবসময় শুধু অসভ্যতা না?—এই কথাগুলো শোনার জন্যে শৈবাল কতরকম সুযোগ যে খোঁজে।

নিজের ঘরে ঢুকে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে নতুন কেনা তিনটি সংবাদপত্রই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছিল তমাল। সেই সংবাদপত্রগুলোতেও ছাপা হয়েছিল খবরটা। বারবার পড়েছিল তমাল। শুধু সেই খবরটাই। তারা নিয়মিত যে দৈনিক রাখে সেটাতেই বেশ বিশদভাবে ছাপা হয়েছিল খবরটা। সেটা এরকম—

একুশ বছরের যুবকের আত্মহনন

"ইঞ্জিনিয়ারিং-এ সদ্য ডিপ্লোমা পাওয়া যুবক সুহাস বন্দ্যোপাধ্যায় বরাবরই ছিলেন একটু বেশিরকম আবেগপ্রবণ। যে কোনও দুর্নীতির ঘটনায় তাঁর তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখে রীতিমতো বিস্মিত হতেন তাঁর বন্ধুরা। কয়েকদিন আগে সুহাসদের বাড়ির বিকল টেলিফোন ঠিক করতে গিয়ে লাইনম্যান যে পঞ্চাশ টাকা ঘুষ চেয়েছিলেন তাতে সুহাস সম্ভবত এক প্রবল মানসিক ধাক্কা পেয়েছিলেন। বস্তুত সমাজের সর্বস্তরে ব্যাপক দুর্নীতি এবং অবক্ষয় এই যুবককে ব্যথিত করত প্রায়ই। তাঁর বন্ধুরা অবশ্য সুহাসকে একটু অস্বাভাবিক বলেই ভাবতেন। কেউ কেউ সুহাসকে নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করতেন। আবার কোনও কোনও বন্ধু বলতেন যা দিনকাল পড়েছে, দুর্নীতি কিংবা অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে একা একা লড়াই করা সম্ভব নয়। বরাবর পড়াশোনায় মেধাবী ছাত্র

সুহাস কোনওদিনই একমত হননি বন্ধুদের সঙ্গে। সুহাস নাকি কোনও কোনও বন্ধুর কাছে বলেছিলেন, খিদে পেয়েছে বলে লাইনম্যান যদি কিছু টাকা চাইতেন সেটা হয়তো মেনে নেওয়া যেত। কিন্তু যে কাজ করার তিনি বেতন পাচ্ছেন, সেই একই কাজের জন্যে তিনি ঘুষ চাইবেন কেন? এই ঘটনার পর কিছুদিন ধরে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন সুহাস। গতকাল রাত নটা নাগাদ সুহাস একা একা নিজের বাড়ির ছাদে উঠে যান। একটা কেরোসিন টিন সম্পূর্ণ উপুড় করে দেন নিজের শরীরে। তারপর দেশলাই কাঠি জ্বেলে অগ্নিসংযোগ করেন। সুহাসের আর্ত চিৎকার শুনে ছাদে উঠে আসেন বাড়ির লোকজন। তাঁর শরীরের প্রায় সবটা পুড়ে গিয়েছিল আগুনে। হাসপাতালে নিয়ে যাবার পথে সুহাসের মৃত্যু হয়। পুলিশ মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্যে পাঠিয়েছে।"

তমালদের বাড়িতে প্রতিদিন যে দৈনিক রাখা হয় তাতে এই খবর হুবহু এই ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল। সেদিনকার অন্য যে তিনটি বাংলা দৈনিক কিনেছিল তমাল; সেগুলোতেও একই খবর ছাপা হয়েছিল। একটু অন্য ভাষায়। মোট চারটি বাংলা দৈনিক থেকে খবরটা ব্লেড দিয়ে নিখুঁতভাবে কেটে নিয়েছিল তমাল। তার পর সে ধাঁধায় পড়েছিল। খবরের কাটিংগুলো নিয়ে সে কী করবে। এগুলো কেটেই বা নিল কেন সে? ঝোঁকের মাথায় অনেকসময় তমাল অনেক কাজ করে যেসবের কোনও কার্যকারণ সূত্র পাওয়া যায় না। তমালের শুধু ক্ষীণভাবে মনে হয়েছিল যে, সুহাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে তার একবার যাওয়া দরকার। কারা আছে সুহাসের বাড়িতে?.... বাবা, মা, দাদা, দিদি, ভাই, বোন যেমন সকলের বাড়িতেথাকে। সুহাসের নিকটাত্মীয়দের সঙ্গে যদি কথা বলা যেত। ঠিক কী ঘটেছিল? কেন বন্ধুরা তাকে অস্বাভাবিক বলে ভাবত? সামান্য পঞ্চাশ টাকা ঘুষ চাওয়ার জন্যে সুহাস এতটাই ভেঙে পড়বে যে ভয়ঙ্করভাবে আত্মহননের রাস্তা বেছে নিতে হল তাকে? প্রকৃত সুহাসকে জানতে হবে। তাব সম্বন্ধে অনেক জিজ্ঞাস্য আছে তমালের। কিন্তু সুহাস কোথায় থাকত সেটা কীভাবে জানবে তমাল? খবরে তো তার বাড়ির হদিশ দেওয়া হয়নি। ভাবতে ভাবতে তমালের মনে হয়েছিল সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় যে সাংবাদিক সুহাসের খবরটা নিয়ে স্টোরি করেছে তার সঙ্গে দেখা করলে কেমন হয়? চারটে দৈনিকের চারজন সাংবাদিকের সঙ্গেই কি সে কথা বলবে? নাকি যে কোনও একজন সাংবাদিকের সঙ্গে?

ভাবতে ভাবতে তমালের মনে হয়েছিল, তাদের বাড়িতে প্রতিদিন যে দৈনিক রাখা হয়; সেই দৈনিকের অফিসে একদিন যাবে সে। সম্পাদকের সঙ্গে দ্যাখা করবে। সুহাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মহনন নিয়ে যে সাংবাদিক স্টোরি করেছিল তার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলতে চায় তমাল।

শুধুমাত্র একটা দৈনিককে বেছে নেবার কারণ হল, অন্য তিনটি দৈনিকের চেয়ে

সেই দৈনিকের প্রচারসংখ্যা অনেক বেশি। সেই দৈনিকের কর্তৃপক্ষ প্রায়ই রাস্তাঘাটে, বেতারে কিংবা দূরদর্শনে বিজ্ঞাপন দিতে পছন্দ করেন যে, তাঁদেরই প্রচারসংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশি। এই বিজ্ঞাপন কতটা সত্যি আর কতটা মিথ্যে সে ব্যাপারে তমালের অবশ্য কোনও ধারণা নেই। তবে সে নিজেও প্রত্যক্ষ করেছে যে, বেশিরভাগ মানুষ সেই দৈনিকই পছন্দ করেন অর্থাৎ পড়েন।

যেমন ভেবেছিল তমাল সেরকমই করেছিল সে। গতকাল দুপুরের দিকে সে ঐ বাংলা দৈনিকের অফিসে গিয়ে হাজির হয়েছিল।

এই শহরেও আজকাল উগ্রপন্থীদের নানা ধরনের হামলা এবং উৎপাতের কথা প্রায়ই শোনা যায়। বেশ কিছুদিন আগে এক বিদেশি দূতাবাস এবং গ্রন্থাগারের সামনে হঠাৎই উগ্রপন্থীরা উদয় হয়ে গোলাগুলি চালাতে থাকে। বেশ কিছু লোক মারাত্মকভাবে আহত হয়। একজন পথচারী স্টেনগানের বেমক্কা গুলিতে মারাও গিয়েছিল। সারা শহর জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল সন্ত্রাসের খবর। আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল সবাই। সে কারণেই আজকাল অফিস, বাণিজ্যিক সংস্থা, প্রেক্ষাগৃহ, রঙ্গালয় এসব জায়গাতে নিরাপত্তারক্ষীদের ব্যাপক কড়াকড়ি। যাঁরা এসব জায়গাতে কাজের জন্যে আসেন, নিরাপত্তারক্ষীরা তাঁদের নানাভাবে পরীক্ষা করেন। শারীরিক তল্লাশি, যাকে বডি-সার্চ বলে ক্ষেত্রবিশেষে এরকমও করে থাকেন তাঁরা। কোনও অফিসে বা ঐ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ছদ্মবেশী উগ্রপন্থীরা যাতে ঢুকে না পড়ে সে কারনেই এরকম ব্যবস্থা। সংবাদপত্রের অফিসগুলোতেও আজকাল নানা ধরনের বিধিনিষেধ। বিশেষত তমালদের বাড়ি নিয়মিত যে বাংলা দৈনিকটি রাখা হয় চারতলা অফিসবাড়ি তাদের। ঝকঝকে, ছিমছাম, পরিষ্কার। দেখলেই বোঝা যায় এই অফিসের ব্যবসা বেশ রমরমিয়ে চলছে। প্রাচুর্যের অভাব নেই।

ঐ দৈনিক সংবাদপত্রের অফিসে তমাল আগে কোনওদিনই যায়নি। যাবার প্রয়োজন হয়নি। ঠিকানাটা সে অবশ্য জানত। শহরের কোন্ জায়গায় অফিস সেটাও তার জানা ছিল। যাবার কোনও কারণ ঘটেনি বলে যায়নি। অফিসে ঢোকবার বড় লোহার গেট তালাবন্ধ। তার ঠিক পাশে একটা ছোট, একজন যেতে পারে এরকম চওড়া এবং বেশ নীচু গেট দিয়ে সবাই ঢুকছে এবং বের হচ্ছে। ধড়াচূড়ো পরনে দুজন নিরাপত্তারক্ষী নজর রাখছে সেদিকে। তমাল বেশ লম্বা। অন্তত পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি তো হবেই সুতরাং তাকে বেশ অনেকটা নীচু হয়ে ঢুকতে হল ভেতরে। সামনে বিল্ডিং-এর ভেতরে ঢোকার সিঁড়ি। কাচের দরজা ঠেলে রিসেপসনে চলে এল তমাল। সেখানে বেশ ভিড় ওপ্রান্তে 'এল' শেপ চকচকে টেবিলে রিসেপশনিস্ট। যে কোনও সংবাদপত্রের এবং বেসরকারি সংস্থার অফিসে ঢুকলে প্রথমেই দেখতে হবে রিসেপশনিস্টকে। এরা সাধারণত অত্যন্ত সুন্দরী হয়। একবার দেখলে বারবার দেখতে ইচ্ছা হয়। এদের চাকরির প্রথম শর্তই বোধহয় চেহারায় সুন্দরী হওয়া। সব মানুষই সুন্দরী মেয়েদের পছন্দ করে এই ধরনের অফিসের কর্তৃপক্ষরা প্রথমেই ভিজিটারদের মানসিকভাবে তৃপ্ত করতে

চায়। আগে মনের খুশ। তারপর তো কাজকর্মের কিংবা ব্যবসার কথা। মন ভালো থাকলে তবেই তো কোনও ব্যাপার নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করা যায়।

তমাল দেখল এই রিসেপশনিস্ট মেয়েটিও যথেষ্ট সুন্দরী। কত আর বয়স হবে? মেয়েদের বয়স অবশ্য স্বয়ং ঈশ্বরও বুঝতে পারেন না। তবুও দেখে কিছুটা তো বোঝা যায়। এই মেয়েটির বয়স বাইশ-তেইশ বছর হবে। বেশ লম্বা, ছিপছিপে। টকটকে ফর্সা। ফ্যাকফেকে ফর্সা অবশ্য নয়। সেই ফর্সায় কিছুটা গোলাপি আভা আছে যেন। স্টেপকাট চুল। পাতলা ঠোঁট। লিপস্টিক ব্যবহার করেছে মেয়েটি। তবে তা যেন বোঝা যাচ্ছে না। ডান হাতে সরু ঘড়ি। বাঁ-হাতে সরু শেকল-মার্কা চেন। অপরূপ মুখশ্রী। অনকটা যেন ঐশ্বর্য রাই। অন্তত চোখগুলো ওরকমই। পরনে সালোয়ার কামিজ। দোপাট্টা। সেই দোপাট্টা এমনভাবে কাঁধে ফেলে রেখেছে মেয়েটি যে কামিজের নীচে ডানদিকের স্তন দৃশ্যমান। যারা তার টেবিলের চারপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে তাদের সকলের দিকেই স্পষ্ট চোখে তাকাচ্ছে মেয়েটি এবং প্রত্যেককে তার প্রথম প্রশ্নটা হল— ইয়েস-হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ সার?

সামনে বেশ ভিড়। তাই একটা ছোট কিউ তৈরি হয়ে গেছে। তমাল আপাতত সেই কিউয়ের শেষ ব্যক্তি। সাক্ষাৎপ্রার্থীর সঙ্গে মেয়েটি প্রথমে কথা বলছে। তার পর প্রয়োজন মনে হলে তার ঠিক পাশে বসে থাকা একজন মাঝবয়সী লোকের দিকে নির্দেশ করছে। লোকটি সাক্ষাৎপ্রার্থীকে একটা ছোট্ট কাগজের স্লিপ এগিয়ে দিচ্ছে। সেই স্লিপ পূরণ করে গলায় ভিজিটর লেখা কার্ড ঝুলিয়ে অফিসের অন্দরমহলে প্রবেশাধিকার পাওয়া যাবে। এর মধ্যে অবশ্য আর একটা ব্যাপার আছে। সাক্ষাৎপ্রার্থী অন্দরমহলে যাবার ছাড়পত্র পাওয়ার সঙ্গে ঘরের কোণে বসে থাকা একজন নিরাপত্তারক্ষী উঠে এসে একটা যন্ত্র দিয়ে ব্যাগটি পরীক্ষা করছে। ঐ যন্ত্রটি মেটাল ডিটেকটব। পরীক্ষা করা হচ্ছে সাক্ষাৎপ্রার্থীর ব্যাগে আগ্নেয়াস্ত্র বা ঐ ধরনের আপত্তিকর কিছু আছে কি না। নিরাপত্তারক্ষীরা দুজন। একজন পুরুষ। আর একজন নারী। মেয়ে সাক্ষাৎপ্রার্থীদের ক্ষেত্রে মেটাল-ডিটেকটর দিয়ে পরীক্ষা করছে মেয়ে নিরাপত্তারক্ষী।

তমালের আগে ন-জন লোক ছিল। তাদের পর তমালের পালা। প্রায় দশ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকতে হল লাইনে। রিসেপশনিস্টের কাছে পৌঁছে তমাল বলল—আমি আপনাকে একটা বিশেষ কথা বলতে চাই।

— বিশেষ কথা?-সুন্দরী মেয়েটির দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।

— হোয়াট ডু ইউ মিন?

— কার কাছে যেতে হবে আমি ঠিক জানি না। একজন রিপোর্টারের সঙ্গে দেখা করব। এই অফিসেরই।

মেয়েটি তখনও তাকিয়ে ছিল তমালের মুখের দিকে। যেন বুঝে নিতে চাইছিল সাক্ষাৎপ্রার্থীটি প্রকৃতিস্থ কিনা। অথবা তার কোনও বদ মতলব আছে কিনা। কিন্তু

তমালের চেহারা বেশ লম্বা হলেও তার মুখে এক অমল সারল্য আছে। যা হয়তো তার বয়সী যুবকদের মুখে অনেকসময় থাকে না। মেয়েরা মানুষের মুখের খুব ভালো এবং দক্ষ পাঠক। তমালের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মেয়েটি বোধহয় বুঝল যে সে সেই মুহূর্তে প্রকৃতই আন্তরিক। ঠিক সেই সময়টায় তমাল ছাড়া অন্য কোনও সাক্ষাৎপ্রার্থীও ছিল না।

—কী কারণে আপনি রিপোর্টারের সঙ্গে দেখা করবেন সেটা যদি কাইন্ডলি ক্লিয়ার করেন। মেয়েটি বলল। সংক্ষেপে তমাল উল্লেখ করল আগের দিনের সংবাদ পত্রে প্রকাশিত নিউজটার কথা। ঐ নিউজটা যে সাংবাদিক করেছেন তাঁর সঙ্গে একবার কথা বলতে চায় তমাল। বোঝা গেল রিসেপশনিস্ট মেয়েটিও খবরটা পড়েছে এবং মনে রেখেছে।

—সেই বার্নিং কেস-এর ব্যাপারটা? সুইসাইড কমিটেড বাই এ্যা ইউথ?.... নিউজটা তো রাহুল করেছে।

—রাহুল?....উনি কী এখন?......

—রাহুল সরকার। দেখছি সিটে আছে কি না... ইনটারকমের বোতাম টিপল মেয়েটি। কানেকশান হল।

—রাহুল আর ইউ ইন দ্য সিট?...আ ভিজিটর হিয়ার ফর ইউ। ও প্রান্তে রাহুল সরকার কী বলল বোঝা গেল না। তবে মেয়েটির সুন্দর মুখ বেশ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। হেসে সে রাহুল কে বলল—ইয়েস আই উড লাইক ইট ভেরি মাচ। থ্যাঙ্ক ইউ......।

রিসিভার নামিয়ে রেখে মেয়েটি তমালকে সোফার দিকে নির্দেশ করে বলল —আপনি একটু ওয়েট করুন। রাহুল নীচে নামছে।

তমাল নরম সোফায় নিজেকে ছেড়ে দিল। আরামের অনুভূতি। সে ভাবছিল রাহুল ফোনে মেয়েটিকে কী এমন বলল যে সে খুশি হল? রাহুল কি মেয়েটিকে আজ সন্ধ্যায় ডিনারের আমন্ত্রণ জানাল? আরও সাক্ষাৎপ্রার্থীদের ভিড় জমে গেছে রিসেপশনিস্টের টেবিলের সামনে। কী দ্রুততা এবং সপ্রতিভতার সঙ্গে মেয়েটি প্রত্যেককে অ্যাটেন্ড করছিল। একজন রিসেপশনিস্টের কাজ কিন্তু বেশ কঠিন। তমালের মনে হল। সরাসরি পাবলিকের সঙ্গে যোগাযোগ। এইসব সংস্থায় এক একজন রিসেপশনিস্টের বেতন কত? আর কী কী সুযোগসুবিধে এরা পায়?

কাচের দরজা ঠেলে অন্দরমহল থেকে একজন যুবক বাইরে এল। মেয়েটির দিকে সে চোখের ইঙ্গিত করল। অর্থাৎ ভিজিটর কোথায়? মেয়েটি চোখের ইঙ্গিতেই সোফায় আসীন তমালকে দেখিয়ে দিল। এই যুবকের নামই তাহলে রাহুল। রাহুল সরকার। সে এসে তমালের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল—গুড আফটারনুন। আসুন!.....সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিল তমাল। রাহুল নামের এই রিপোর্টারের কত বয়স হবে? চব্বিশ কিংবা পঁচিশ? বেশ লম্বা ছেলেটা। তমালের থেকেও। জিনস ট্রাউজার আর টি-শার্ট।

মাথার চুল ব্যাকব্রাশ। ঘাড় এবং কানের আশপাশ নিখুঁত এবং পরিপাটিভাবে কামানো। খুব ফর্সা হওয়ার জন্যে এবং সুন্দরভাবে দাড়িও কামানো থাকার জন্যে রাহুলের চিবুকে, গালের চারপাশে কেমন এক নীলচে আভা। কিন্তু তমাল ওর সঙ্গে কয়েকটা মাত্র কথা বলবে। কীভাবে বলবে? রাহুল তো কাচের দরজা ঠেলে বেরিয়ে যাচ্ছে।

—শুনছেন? আপনার সঙ্গে এক মিনিটের কথা ছিল।

রাহুল ফিরে তাকাল। একটু হাসল। বলল—এক মিনিট কেন ভাই? দশ মিনিটের কথাও তো থাকতে পারে। আমি শুনব আপনার কথা। কিন্তু এখানে এখন চা পাওয়া যাবে না। আমার জন্যে পাওয়া গেলেও বাইরের ভিজিটরদের জন্যে কোম্পানি চা অ্যাফোর্ড করে না।....তাই বাইরে যাচ্ছি। সামনেই একটা ভালো চা-এর দোকান আছে।

সংবাদপত্র—অফিসের বাইরে এল রাহুল এবং তমালও। রাস্তা পেরিয়ে একটা চায়ের দোকান। ভেতরে সারি সারি বেঞ্চ। উনুনে হাঁড়িতে জল ফুটছে। অনেকেই চায়ের ভাঁড় হাতে। দেখে মনে হল চা-বিক্রেতা অবাঙালি।—ভেতরে বসবেন না বাইরে?—জিজ্ঞেস করল, রাহুল।—আপনার যেমন ইচ্ছে।

—চলুন ভেতরেই বসা যাক। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী কথা হয়?......পাঁড়েজী —ভাঁড়ে দুটো চা এদিকে....।

চায়ে চুমুক দিয়ে রাহুল সিগারেট ধরাল। অফার করল তমালকে। তমালের ধূমপানের নেশা নেই। সে সবিনয়ে ঘাড় নাড়ল।

—আপনার নামটাই জানা হয়নি....।

—তমাল দত্ত।

—কোন্‌দিকে থাকেন?

—যাদবপুর।

—বলুন কী জন্যে আমার কাছে এসেছেন?.....এই প্রশ্নটার জন্যেই এতক্ষণ অপেক্ষায় ছিল তমাল। ঠিক কীভাবে শুরু করবে সে যেন বুঝতে পারছিল না।

—সুহাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের খবরটা।.....আপনার নামেই তো ছাপা হয়েছে খবরটা।

—হ্যাঁ ঠিকই। আমিই কভার করেছিলুম খবরটা। কিন্তু......

—খবরটা পেলেন কীভাবে?—তমাল ফস্ করে প্রশ্ন ছুড়ে দিল। রাহুল থেমে গেল। সিগারেটটা শেষ হয়ে এসেছিল। ভাঁড়ের চা-এ চুমুক দিল আবার। এবার শেষ হয়ে গেল ভাঁড়। সেটা রাহুল বদলে নিল ছাইদানিতে। শূন্য ভাঁড়ে সে গুঁজে দিল সিগারেটের শেষ হয়ে যাওয়া টিপস্। তারপর প্যাকেট থেকে বের করে আবার একটা ধরাল। দেশলাই কাঠিটা মেঝেতে ফেলতে গিয়েও সংযত করে নিল নিজেকে। ভাঁড়ে গুঁজে দিল।

—আপনি একজন রিপোর্টারকে বেসিক প্রশ্ন করে ফেলেছেন। —হেসে বলল রাহুল।

—মানে? কোনও বেফাঁস প্রশ্ন করলুম কী?

—বেফাঁস নয়। তবে......। আসলে এটাই তো একজন সংবাদদিকের প্রফেশনাল সিক্রেট। খবরের সোর্স আমাদের জিজ্ঞেস করা ঠিক নয়।

—কিছু মনে করবেন না। আমি না জেনে......

—ইটস্ ও. কে.। আসলে এসবের কোনও ধরাবাঁধা নিয়ম নেই।

—কোন্ সবের?

—এইসব ছোটখাটো ডোমেস্টিক ঘটনার। এই শহরে বড় কিছু ঘটলে সহজেই জানা যায়। খুব দ্রুত রিপোর্টারদের ভিড় হয়ে যায় সেখানে। কিন্তু কোথাও কোনও পাড়ায় একটা বাড়িতে বা পরিবারে অস্বাভাবিক কিছু ঘটছে বা ঘটেছে। সেসব খবর চট করে যে সবাই পায় তা কি বলা যায়? কিন্তু সেগুলোই হল আসল খবর। তাই না?...তমাল ঠিক ঘাড় নাড়ল না। রাহুলের কথা সে মন দিয়ে শুনছে। রাহুলের চোখের দিকে তাকিয়ে আছে।

—আসলে আমি মনে করি রিপোর্টারদের পাবলিক রিলেশানটা ভালো থাকা দরকার। আমার নানা পরিচিত লোকজন, নানা ফিল্ডে আছেন তাঁরা, সবাই যে সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত তা ঠিক নয়, কেউ ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক কেউ আবার বিজনেসম্যান, লেখক কিংবা সো-কলড বুদ্ধিজীবী এরাও অনেকে আমার পরিচিত। তাদের সঙ্গে আমি নিয়মিত রিলেশনস মেনটেন করি। আমার যখন তাদের সঙ্গে কথাবার্তা হয় তখন কতরকম টুকরো-টাকরা খবর যে উঠে আসে। এভাবেই কোনও ইনটারেসটিং খবর আমার নোটিসে এলে আমি স্টোরি করে দিই আমার কাগজে।

তমাল তাকিয়ে আছে। শুনছে। কিন্তু মনে মনে সে একটু অধৈর্য যে হয়ে পড়ছে না তা নয়। রাহুল কথা বলতে ভালোবাসে। বকতে ভালোবাসে বললে বোধহয় ঠিক বলা হয়। কিন্তু তমাল যেটা জানতে এসেছে সেটা এখনো জানতে পারেনি।

—এই খবরটা আমি পেয়েছিলুম অদ্ভুতভাবে।—রাহুল থামল।

—কী রকম?

—যে অঞ্চলের খবর ওখানে আমার এক বান্ধবী আছে। সে কী করে জানেন?

তমাল তাকিয়ে ছিল। রাহুলের চোখের দিকে।

—ভাস্বতী লিটল ম্যাগ বের করে। একটা ছোট কাগজের এডিটর। তো ওর কাগজে ও আমাকে একটা লেখার কথা বলেছিল। অনেকদিন আগে বলেছিল। লেখাটার জন্যে তাগাদা দিতে ফোন করেছিল। সেটা বলার পর হঠাৎ বলল যে তাদের পাড়ায় একটা বাড়িতে ভয়ংকর ঘটনা ঘটে গেছে। সেটা হল ঐ ঘটনাটা। একুশ বছর বয়সের সুহাস বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের গায়ে কেরোসিন ঢেলে...

—আপনি নিশ্চয়ই ওদের বাড়ি গিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ গিয়েছিলুম। ঘটনাটা একদিকে যেমন ভয়ংকর, আবার তেমনই ইনটারেসস্টিং।

তাই না?....একজন ইয়ংম্যান এতটাই সেনসিটিভ যে টেলিফোনে। একজন কর্মচারী ঘুষ চেয়েছে বলে সে সমাজের প্রতি ধিক্কারে, জীবনের প্রতি অভিমানে ওরকম অ-ফুলি সুইসাইড করবে!.....

—এরকম ঘটনা আমাদের দেশে আগেও ঘটেছে। ঘটেনি কি?

—এরকম ঘটনা আগেও ঘটেছে?...আরও একটু স্পেসিফিকালি বলুন তো?

—কয়েক বছর আগে মনে আছে?

—কী?

—সেই যে যখন দিল্লি গভমেন্ট রির্জাভেশান নিয়ে আইনকে অ্যামেন্ড করেছিল; ....চাকরি-বাকরির ক্ষেত্রে তপশিলি জাতি আর উপজাতিদের কোটা আরও বাড়ানো হয়েছিল। তখন প্রতিবাদে অনেক যুবক নিজেদের গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। কলকাতা শহরে হয়তো নয়। কিন্তু অন্য প্রদেশে। অন্য শহরে।

—ইয়েস। ইউ আর কারেক্ট। খুব সঠিক রেফারেন্স দিয়েছেন। কিন্তু....। থামল রাহুল। দ্বিতীয় সিগারেটও শেষ। ভাঁড়ের ছাইদানিতে সেটা গুঁজে দিল।—যারা এরকমভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছিল সরকারি আইনের, তাদের বোধহয় এক ধরনের পোলিটিকাল কমিটমেন্ট ছিল। তাদের প্রত্যেকের পেছনে ছিল কোনও না কোনও রাজনৈতিক দল। যেসব দল তখনকার কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধী ছিল। মনে পড়ে আপনার?

মনে পড়ে। তমাল ঘাড় নাড়ল। এটা সে বেশ বুঝতে পারছে যে, কথায় কথা বেড়ে যাচ্ছে। সে যেটা জানতে এসেছে রাহুলের কাছে, সেটাই জানা হচ্ছে না। তাই সরাসরি প্রয়োজনীয় প্রশ্নটাতে চলে গেল তমাল।

—সুহাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িটা ঠিক কোথায়?

—বাড়িটা?...যাবেন?

—ইচ্ছে আছে।

—আপনার সঙ্গে কথা বলে আমার কী মনে হচ্ছে জানেন?

—কী?

—খবরটার ব্যাপারে রিপোর্টার হিসেবে আমি সফল। খবরটা আপনাকে এতটাই নাড়া দিয়েছে যে আপনি নিজে আমার কাছে চলে এসেছেন।

সব কাগজেই বোধহয় খবরটা এসেছিল।....আমি বাংলা কাগজগুলোর কথা বলছি। ইংরিজি কাগজ দেখা হয়নি।

—হ্যাঁ সব কাগজেই এসেছে। কিন্তু তবু আপনি তো আমার কাছেই এসেছেন।—রাহুল হাসল।

—তার কারণ আপনার কভারেজ আমার সবথেকে ভালো মনে হয়েছে।.... ঠিকানাটা একটু বলবেন?

—ঠিকানা?

—সুহাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। ওদের বাড়িটা হল.......।

রাহুল বুঝিয়ে দিয়েছিল বাড়ির অবস্থান। যে অঞ্চলে সুহাসের বাড়ি, সেখানে খুব বেশি যাতায়াত নেই তমালের তবুও চলে যেতে পারবে।

—ওদের বাড়িতে আর কে কে আছেন?

—আমি শুধু ওর মায়ের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। মনে হয়েছিল শি ইজ আ উইডো। বাড়িতে আর কে কে আছে বলতে পারব না।

—ঠিক আছে। আমি তাহলে আসি। ঠিকানাটা দেওয়ার জন্যে ধন্যবাদ।—তমাল উঠে দাঁড়িয়েছিল। পকেট থেকে বের করেছিল মানিব্যাগ।

—ওটা কী হচ্ছে? আমিই তো আপনাকে দোকানে আনলুম। আপনি পয়সা দেবেন?..রাহুল হাসল। চায়ের পয়সা মেটাল। তারপর পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে তমালের হাতে দিয়েছিল। তাতে রাহুলের নাম, ঠিকানা, পেশা এবং ফোন নম্বর লেখা ছিল।

৩

চৌরাস্তায় নেমেছিল ঠিকই তমাল। কিন্তু এক কিশোর, চলতি ভাষায় যাকে ছোঁড়া বলে, তাকে যে ভুল রাস্তা দেখিয়ে দেবে সেটা তার ধারণাতেও ছিল না। রামগোপাল মল্লিক লেন ঐদিকে বলে সে যেদিকে দেখিয়েছিল, বস্তুত তার ঠিক বিপরীত দিকে তমালের ঠিকানা। ফলে এলোমেলো একটু ঘুরতে হল তমালকে। যে গলিটার দিকে আঙুল দেখিয়েছিল সেই পাজি ছেলেটা, সেখানে গিয়ে তমাল দেখল গলির মুখে একটা সাইনবোর্ড আছে বটে। তবে তাতে রামগোপাল মল্লিক লেন লেখা নেই। লেখা আছে— নটবর পাল লেন। তমাল যখন অনিশ্চিতভাবে গলির মুখে দাঁড়িয়ে কোন্‌দিকে যাবে ভাবছে তখনই একজন জিজ্ঞেস করল—কোনও বাড়ি খুঁজছেন? তমাল ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক। পাজামা পাঞ্জাবি। ফর্সা। মাথায় টাক।—রামগোপাল মল্লিক লেন কোন্‌টা বলুন তো? একটা ছেলেকে জিজ্ঞেস করলুম। সে আমায় এদিকে দেখিয়ে দিল। —এটা তো রামগোপাল মল্লিক লেন নয়।...নটবর পাল লেন। আপনি যে রাস্তা খুঁজছেন সেটা তো ঐদিকে।....তমাল যেদিক থেকে হেঁটে এসেছিল সেদিকেই দেখাল ভদ্রলোক।—ছেলেটা তো মহা বদ। আমাকে মিসগাইড করল—আর কি বলবেন?—ভদ্রলোক অস্পষ্টভাবে হাসল। —আমাদের দেখেই তো আমাদের ছেলেরা মানুষ হচ্ছে। অনেক সময় আমরাও প্রকৃত মানুষের মতন ব্যবহার করি কি? আমি ঐদিকেই যাব। আপনি আমার সঙ্গে আসতে পারেন।—ধন্যবাদ। বলল তমাল। ভদ্রলোক আর সে পাশাপাশি হাঁটতে লাগল।

—কাদের বাড়ি যাবেন বলুন তো?—জিজ্ঞেস করল ভদ্রলোক। তমাল একটু ধন্দে পড়ে গেল। সত্যি এই প্রশ্নের উত্তর সে কী দেবে? যে বাড়িতে সে যেতে চাইছে সেই বাড়ির কাউকেই তো সে চেনে না। একমাত্র সুহাস বন্দ্যোপাধ্যায় নামটা ছাড়া। তা হলে? কী উত্তর দেওয়া যায়?

—কাদের বাড়ি যাবেন?—আবার জিজ্ঞেস করল ভদ্রলোক। তমাল বলল—ঐ গলিতে একজনদের বাড়ি যাব।

—কাদের বাড়ি?

—কয়েকদিন আগে যাদের বাড়িতে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে।

—দুর্ঘটনা?...ভদ্রলোক কপাল কুঁচকে ভাবতে লাগল। আশ্চর্য? তমালের মনে হল। লোকটাকে এতক্ষণ এমনি বেশ ভদ্রই মনে হচ্ছিল। কিন্তু, তাদের এলাকাতে এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল আর সেটা এক মুহূর্তে মনে করতে পারছে না? সুহাসের ওরকম ভয়ঙ্কর আত্মহত্যার ব্যাপারটা শুধুমাত্র একদিনের সংবাদপত্রে বক্সে একটা খবর হয়েই থেকে যাবে? তার পর সবাই ভুলে যাবে ঘটনাটা? আর কোনও দাগ কাটবে না কারোর মনে?

—একজন আমার বয়সী যুবক সুহাস বন্দ্যোপাধ্যায় তার নাম। কয়েকদিন আগে নিজের গায়ে কেরোসিন ঢেলে আত্মহত্যা করেছে ....

—ওহ। ঐ সুইসাইডের কেস্‌টা?.... কাগজে পড়ে জেনেছি। আমি ঐ সময় কলকাতায় ছিলুম না। দিল্লীতে যেতে হয়েছিল। একটা মিটিং-এ। ওদের বাড়িটা অবশ্য ঐ গলিতেই শুনেছি। সেখানে যাবেন কেন? ওরা আপনার আত্মীয় হয়?

—নাহ। আত্মীয় হয় না। আমি চিনিই না ওদের।

—তা হলে?...আপনি কি রিপোর্টার? কোন কাগজের?

—নাহ। আমি রিপোর্টারও নই।—তমাল শুকনো হাসল।

—তাহলে?—ভদ্রলোকের চোখে বিস্ময়।

—আপনার কৌতূহল হয় না?

—কী ব্যাপারে?

—সুহাস নামের ঐ যুবক কেন হঠাৎ নিজের গায়ে কেরোসিন ঢেলে দেশলাই কাঠি জ্বেলে নিজেকে এইভাবে পুড়িয়ে মারল?

—ঘটনাটা খুব অফুল! এটা ঠিক। তবে কী জানেন তো? গোটা ব্যাপারটাই কীরকম অবিশ্বাস্য।

—অবিশ্বাস্য? কোন্ ব্যাপারটা?

—শুধুমাত্র একজন কর্মচারী ঘুষ চাইল আর সেই দুঃখে ছেলেটা নিজেকে ওভাবে পুড়িয়ে মারল এটা বিশ্বাস করা যায় বলুন? আজকালকার ছেলে। সেন্টিমেন্টাল হতেই পারে। কিন্তু পঞ্চাশ হাজার কিংবা পাঁচ হাজার টাকা ঘুষ নয়। মাত্র পঞ্চাশ টাকা ঘুষ চেয়েছিল বলে নিজেকে পুড়িয়ে মারবে কেউ এটা সত্যিই বিশ্বাস করা

যায় না। ওটা—বুঝলেন ভাই, খবরের কাগজের স্টোরি। আসলে ব্যাপারটা হয়তো অন্যরকম।

—কীরকম?—ভীষণ কৌতূহল হচ্ছিল তমালের।

—ঘটনার পেছনে কোনও প্রেমঘটিত ব্যাপার থাকতে পারে। আপনি তো আজকালকারই ছেলে। আপনাকে আর খুলে কী বলব?—ভদ্রলোক হাসল।—হয়তো কোনও মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল ছেলেটার। সেখানে হাফসুল খেয়েছে। তাই.....। এরকম কত হচ্ছে আজকাল। হচ্ছে না কি?

—ঘুষ চাওয়ার ব্যাপারটা তা হলে সত্যি নয় বলছেন?

—তা কেন বলব? টেলিফোনের অফিস থেকে লাইন সারাতে এসে হয়তো সত্যিই টাকা-ফাকা চেয়েছিল। অনেকসময় ওরা চায়ও। ঠিক ঘুষ হিসেবে হয়তো নয়। মিষ্টি খেতে। আমাদের কাছেও অনেকসময় চায়।

—দিয়েছেন আপনি?

—হ্যাঁ দিয়েছি। কী আর করব? রিফিউজ করলে পরের বার টেলিফোনের লাইন বিগড়ে গেলে আর বাড়িতে সারাতে আসবে না। বারবার কমপ্লেন করলেও সারাতে আসবে না। আমাদের এই গরিব দেশে সিস্টেমই এরকম ভাই। আপনি কী করবেন? অতএব সামান্য পঞ্চাশ কিংবা একশো টাকা দিলে লোকে যদি খুশি থাকে....! —আপনি তো রামগোপাল মল্লিক লেনে যাবেন? ঐ যে গলি। আমি আসছি। সিগারেট কিনতে হবে।

চৌরাস্তার যেখানে বাস থেকে নেমেছিল তমাল তার ডানদিকে কিছুটা হাঁটলেই গলিটা। ফালতু তার একটু ঘোরা হল। যে ছেলেটা তাকে মিসগাইড করেছিল তাকে খুঁজছিল তমাল। ওর বয়সী অনেকেই ঘুরে বেড়াচ্ছে রাস্তায়। গলির মুখে একটা রকে কয়েকজন আড্ডাও দিচ্ছে। আজ তো ছুটির দিন। রাস্তায় যারা বেরিয়েছে তাদের শরীরের ভাষায় তেমন কোনও ব্যস্ততা নেই। সকলের মধ্যেই একটা কেমন ঢিলেঢালা ভাব। হাওয়া দিচ্ছে। আকাশে রোদের তীব্রতা কম। হাওয়ার ঝাপটে মাঝে মাঝে ধুলো উড়ছে। সিগারেটের ধোঁয়া আনমনা মানুষের কাছ থেকে উড়ে যাচ্ছে উঁচুতে মৃদু তামাকের সন্ধ ছড়িয়ে। রামগোপাল মল্লিক লেনের মুখে দাঁড়িয়ে তমাল খুঁজছিল সেই ছেলেটাকে। যে খানিক আগে তাকে ভুল ডিরেকশান দিয়েছিল। কিন্তু কোথাও দেখতে পেল না তাকে। দেখতে যে পাওয়া যাবে না সেটা সে মনে মনে জানতও। ছেলেটা জানে সে অপরাধ করেছে। সে কি আর তমালের সামনে আসবে? হয়তো এখানেই কোথাও আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটা। লক্ষ্য করছে তমালকে। সে যে তমালকে কিছুটা অসুবিধেয় ফেলতে পেরেছে তার জন্যে আনন্দ পাচ্ছে হয়তো। কিন্তু সে সব নিয়ে আর ভেবে কী হবে? রামগোপাল মল্লিক লেনে তো আসা গেল। এখন সুহাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি কোনটা? গলির মুখে একটা বাড়ির লাল রকে চার-পাঁচজন ছেলে বসে আড্ডা মারছিল। এরা প্রত্যেকে তমালের থেকে কমবয়সী।

ওদের জিজ্ঞেস করলে সুহাসের বাড়িটা জানা যেতে পারে।

—এই গলিতে সুহাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি কোনটা ভাই? তমাল প্রশ্নটা ছুড়ে দিল।

কথা থামিয়ে দিল ওরা। কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। ওপাশের রাস্তায় একটা গাড়ি আর একটা গাড়ির রাস্তা আটকে বোধহয় দাঁড়িয়ে আছে। বারবার হর্ন বাজছে। পিঁ পিঁ পিঁ পিঁ......। তমাল উত্তরের অপেক্ষায়। ওরা তমালের দিকে তাকিয়ে। মৃদু রাগ অনুভব করছিল তমাল। আবার প্রশ্নটা করতে যাবে তার আগেই একজন বলল—এই গলিতে ঢুকে ডানদিকের পাঁচটা বাড়ি ছেড়ে দোতলা বাড়ি। নং—৪২/২...।

—ধন্যবাদ।—তমাল হাঁটতে লাগল। গলিটা সরু এবং বেশ অপরিষ্কার। এখানে কি ময়লা-আবর্জনা ফেলার জন্যে কর্পোরেশনের হুইস্‌ল গাড়ি আসে না? যেমন আজকাল সব জায়গায় আসে। তমালদের পাড়াতেও আসে প্রতিদিন সকাল আটটা নাগাদ। তাদের পাড়ায় গাড়ি ঢুকিয়ে তীক্ষ্ণ হুইস্‌ল বাজাতে থাকে একটা লোক। সমস্ত বাড়ির দরজা ধীরে ধীরে খুলে যায়। ময়লার বালতি বা পলিথিন ব্যাগ নিয়ে নেমে আসে সবাই। প্রতিদিন সকালে বাঁশির ডাক শুনে বাইরে বের হয়ে ময়লা ফেলার দায়িত্ব এখন তমালের। সম্ভবত সে বেকার বলে। সে যদি চাকরি পেয়ে যায় এবং তাকে যদি সকাল নটার মধ্যে অফিসে বেরিয়ে যেতে হয় তখনও কি তার এই দায়িত্ব থাকবে?....তখন হয়তো বাড়ির কাজের মেয়েকে এই কাজ অতিরিক্ত দেওয়া হবে। তার জন্যে বাড়তি কুড়ি টাকা মাইনের সঙ্গে দিতে হবে হয়তো তাকে। গলির দু-পাশে ভাত ছড়িয়ে আছে, মাছের কাঁটা, তরিতরকারির খোসা, কুকুরের কিংবা বাচ্চার বিষ্ঠা। দুটো কুকুর কী কারণে যেন বিশ্রীভাবে দাঁত খিঁচিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছে। তমাল তাদের পাশ কাটিয়ে গেল। বিপরীত দিক থেকে একটা মেয়ে হেঁটে আসছে। তমাল তাকাল। মেয়েটির পোশাক খুব উগ্র। চাপা জিনস ট্রাউজার। হলুদ রং টপ। টপের দৈর্ঘ্য পরিকল্পিতভাবে ছোট। ফলে মেয়েটির ফর্সা নাভির খানিকটা দৃশ্যমান। টপের নীচে স্তনদুটি পরিপূর্ণ, লাবণ্যময়, তীক্ষ্ণ। তমাল আড়চোখে তাকাল একবার। ঠিক সেই মুহূর্তে মেয়েটির সঙ্গে তার দৃষ্টি বিনিময় হল। মেয়েটি চোখ নামাল না। তমাল চোখ নামিয়ে নিল।....এই তো দোতলা হলুদ বাড়ি। ৪২/২. রামগোপাল মল্লিক লেন। দরজার গায়ে কাঠের ফলকে নম্বর আটকানো। যেমন থাকে। তমাল বাড়ির সামনে থেমে গেল। কে কে আছে এই বাড়িতে? সুহাসের মা, বাবা, আরও ভাই কিংবা দাদা, দিদি কিংবা বোনও থাকতে পারে।....আচ্ছা তমালের এই হঠাৎ চলে আসাকে কীভাবে নেবে বাড়ির লোকজন? তমালের এখন মনে হচ্ছিল, সে এলই বা কেন এই বাড়িতে? যে আত্মহত্যা করেছে, সুহাস বন্দ্যোপাধ্যায়, তার সঙ্গে কোনও আলাপ ছিল না তমালের। বন্ধুত্ব তো দূরের কথা। সে খবরের কাগজ থেকে জেনেছে যে, সামান্য এক কারণে সুহাস আত্মহত্যা করেছে। খবরটা তাকে উত্তেজিত করেছে খুব। তার মনে তীক্ষ্ণ ভোজালির মতন বিঁধছে। তার মনে

হয়েছে.......। কী মনে হয়েছে?...মনে হয়েছে যে, চারপাশে যা চলছে, যাকে চালু ভাষায় সিস্টেম বলা হয়, তার বিরুদ্ধে সুহাস এক অভূতপূর্ব প্রতিবাদ জানিয়েছে। কত টাকার ঘুষ চেয়েছিল সেই টেলিফোন-কর্মী এটা বিবেচনার বিষয় নয়। হতে পারে সে বিকল টেলিফোন সারাইয়ের জন্যে পঞ্চাশ কিংবা একশো টাকা ঘুষ চেয়েছিল। কিন্তু চেয়েছিল তো? কেন চাইবে? বিকল টেলিফোন সারানোই তো ঐ কর্মচারীর কাজ। তার জন্যে সে মাসের শেষে মাইনে পায়। তা হলে ঘুষ চাইবে কেন? হয়তো এরকম সব প্রশ্নই ভিড় করে এসেছিল সুহাসের মনে। যেমন তমালেরও আসে। কাগজ খুললেই সে প্রায় প্রতিদিনই কত বিচিত্র এবং খারাপ খবরই না দেখতে পায়। যিনি পুলিশের বড়কর্তা, একটা মেট্রোপলিটান শহরের পুলিশ কমিশনার। তিনি তো অনেক মাইনে পান। মাইনে ছাড়াও আরও কত কী পান। বাবার মুখে শুনেছে তমাল। বাবার একজন পুলিশ বন্ধু আছে। তিনি নাকি অফিসার। অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার। কলকাতা পুলিশ বিভাগে সেই বন্ধুর কাছ থেকে বাবা জেনেছে, একজন পুলিশ কমিশনার হয়তো চল্লিশ হাজার টাকা বেতন পান মাসে। এ ছাড়া প্রাসাদের মতন একটা বাংলো। রান্নার বাবুর্চি, বাগান দেখাশোনা করার লোক, টেলিফোন ধরার লোক, ঘরবাড়ি পরিষ্কার রাখার লোক, বাড়ি পাহারা দেবার লোক। এ রকম সাত-আটজন কাজের লোক। আরও অনেক সুযোগসুবিধা। বাড়িতে অতিথি এলে তার আপ্যায়নের খরচও নাকি সরকারের তহবিল থেকেই দেওয়া হয়। তবু......। তবুও কোটি কোটি টাকার স্ট্যাম্প-কারচুপিতে একজন পুলিশ কমিশনার জড়িয়ে পড়েন। এই ভারতবর্ষেরই কোনও এক প্রদেশে কোনও একজন লোক অনেক রকম চাকরির পরীক্ষার, প্রশ্নপত্র আগাম জেনে যেতে পারে। সেই প্রশ্নপত্র সে নানাজনের কাছে হাজার হাজার টাকায় বিক্রি করতে পারে। এবং এ ভাবে কোটিপতি হয়ে যেতে পারে। এসব খবর পড়লেই গা চিড়বিড় করে তমালের। তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে বাসে সেই সহযাত্রীর মুখ। অভিজাত চেহারার, ধোপদুরস্ত পোশাকের, ভদ্রতার, বিনয়ের, সৌজন্যের লোকটা বাসের সামান্য ভাড়া ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যায়। সুহাসের কথা পড়ে তার প্রতি শ্রদ্ধায় অবনত হতে ইচ্ছে হয়েছিল তমালের। আর কেউ না বুঝুক তমাল বুঝেছে। আর কাউকে খবরটা তেমন উত্তেজিত না করুক, তমালকে করেছে। এত সব অবিচার, অন্যায়, দুর্নীতি, প্রতারণা, আত্মপ্রতারণা,—এসবের বিরুদ্ধে কীভাবে প্রতিবাদ জানাবে একা একজন যুবক? কে শুনবে তার কথা? যারা শুনবে তারা নিজেরাও হয়তো ঐ দুর্নীতিগ্রস্ত পুলিশ কমিশনারের মতন। কিংবা পরীক্ষার প্রশ্ন আগাম জেনে তার পর সেই প্রশ্নপত্র পরীক্ষার্থীদের কাছে বিক্রি করে কোটিপতি বনে যাওয়া ঐ লোকটির মতন। সুতরাং কেউ প্রতিবাদ করলে তারা শুনবে না। তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবে। উপহাস করবে। বোকা ভাববে। তাই হয়তো অভিমানে, ধিক্কারে, অনুশোচনায়, ক্রোধে সুহাস একা একা নির্জন ছাদে রাতের অন্ধকারে উঠে গিয়ে শরীরে উপুড় করে দিয়েছিল কেরোসিনের টিন। তার পর একটা জ্বলন্ত দেশলাইকাঠি........।

ক্রিং ক্রিং ক্রিং...সাইকেল আসছে। তমাল ৪২/২ বাড়ির বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। ভাবছিল। একটু সরে দাঁড়িয়ে পাশ দিল। বেরিয়ে গেল সাইকেলটা। তমালকে ওভাবে এই বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সাইকেল আরোহী কি সন্দেহ করছে? সামনে এগিয়েও একবার মুখ ঘুরিয়ে দেখল তমালকে। এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা কি উচিত? কড়া নাড়তে হবে। কড়া তো নয়। কলিং বেল। ঐ তো দরজার ওপরের দিকে, কোনে। ওটাকে আঙুল দিয়ে টিপে দিলেই তো হয়। কিন্তু দরজা খুলে যাওয়ার পর, যে দরজা খুলবে তার প্রশ্নের উত্তরে কী বলবে তমাল? সে কী চায়? কেন এসেছে? কার সঙ্গে কথা বলতে চায়?....এসব প্রশ্নের কী উত্তর দেবে তমাল? সে তো একটা ঝোঁকের বশে চলে এসেছে এই বাড়িটার সামনে। এত সব ভাবেনি। এখন একসঙ্গে অনেক ভাবনা তার মাথায় ভীমরুলের চাকের মতন.....। রাস্তার দিক থেকে কারা নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে আসছে। তমাল ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। এরা তো সেই ছেলেগুলো। যারা কিছুক্ষণ আগে গলির মোড়ে একটা রকে বসে গল্প করছিল। যাদের তমাল জিজ্ঞেস করেছিল এই বাড়ির ঠিকানা। কিন্তু সে প্রায় পাঁচ-সাত মিনিট কেটে গেছে। বাড়ি খুঁজে পেয়েও এখনও তমাল সেই বাড়ির ভেতরে ঢোকেনি কেন? কী মতলব তার? এরকম যদি ভাবে ঐ ছেলেগুলো? মুহূর্তে তমালের বুক ভয়ে কেঁপে উঠল। এই বাড়ির সামনে অনিশ্চিতভাবে আর দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক হবে না। তমাল ঈষৎ এগিয়ে, হাত বাড়িয়ে ডোর বেলে চাপ দিল। বাড়ির ভেতরে ডোরবেল বেজে যাচ্ছে। সে শুনতে পাচ্ছে। বাড়িতে কে আছে? দরজা খুলবে তো? তাকে পাশ কাটিয়ে ছেলেগুলো চলে গেল। তাকে লক্ষ্য করল বলে মনে হল না। দরজা খুলছে না। আবার ডোরবেল চাপ দিল। অপেক্ষা। এখনও দরজা খুলছে না কেন? আবার কী ডোরবেল চাপ দিতে হবে?....

দরজা খুলে গেল!

দরজার ওপারে দাঁড়িয়ে আছে একজন মেয়ে। কত বয়স হবে? পনেরো কিংবা ষোলো। রোগা। কালো। মুখশ্রীও ভালো নয়। পরনে মলিন, রং চটা ম্যাক্সি। তমালের মনে হল এই মেয়েটি সম্ভবত এ বাড়ির কাজের মেয়ে।

—কাকে চান?—প্রশ্ন এল মেয়েটার পক্ষ থেকে।

—সুহাস......বন্দ্যোপাধ্যায়ের...মা কিংবা বাবা কেউ আছেন?

মেয়েটি তমালের এই প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়ে মুখটা বাড়ির ভেতরের দিকে ঘুরিয়ে ঈষৎ উঁচু গলায় জিজ্ঞেস করল—কাকিমা কে একজন এয়েচে।.....দাদার বন্ধু...। বাড়ির অন্দর থেকে কোনও উত্তর আসছে না। কিংবা কেউ বেরিয়েও আসছে না। মেয়েটি বাড়ির ভেতরের দিকে তাকিয়ে অনিশ্চিতভাবে দাঁড়িয়ে আছে। তমাল অস্বস্তি বোধ করছে। মেয়েটি আবার ডাকল—কাকিমা কাকিমা! কোনও উত্তর নেই।—কী হল রে বাবা!....... মেয়েটি বলল তারপর তমালের দিকে তাকিয়ে—আপনি একটু দাঁড়ান। কাকিমাকে ডেকে আনছি।......ও চলে গেল বাড়ির ভেতর।

এখানে, দরজার এপারে দাঁড়িয়ে তমাল বাড়ির ভেতরটা মোটামুটি আঁচ করে নিতে পারছে। পুরনো দিনের বাড়ি। দরজা খুলেই উঠোন। একটা টিউবওয়েল উঠোনের এক পাশে। টিউবওয়েলের ঠিক নীচে কিছু বাসন পড়ে আছে। বাসনগুলো মাজা হচ্ছিল। মেয়েটা মাজছিল। ঠিকই বুঝেছে তমাল। মেয়েটা এ বাড়ির কাজের লোক। ঐ বাসন ও মাজছিল। কাকীমা বলে কাকে ডাক দিল মেয়েটা? তিনি কি সুহাসের মা? সুহাসের বাবা কি বাড়িতে আছেন? আজ তো ছুটির দিন। এ বাড়িতে আর কে কে থাকে? সুহাসের আর কোনও ভাই-বোন আছে কি? উঠোনে ও প্রান্তে একটা সিঁড়ি। ঐ সিঁড়ি ধরেই মেয়েটা দোতলায় উঠে গেল। তার কাকিমাকে ডাকতে। এখনও তমাল দাঁড়িয়ে আছে। একইভাবে। বাড়ির বাইরে। কেউ আসছে না।......নাহ, ঐ তো আসছে! এক ভদ্রমহিলা। তমাল একনজর দেখেই বুঝল ভদ্রমহিলা বেশ ঠিক সাদা শাড়ি নয়। ঘি-রং, কালো পাড় শাড়ি পরনে। ফর্সা। রোগা মাথায় বেশ লম্বা। তমালের কানের কাছে তো হবেনই। ব্লাউজ। শাড়ির রং-এর। স্লিভলেস। মাথার চুলে অনেক রুপোলি রেখা। বেশ ভালোই পাক ধরেছে ভদ্রমহিলার চুলে। তবে চুল খুব লম্বা নয়। ছোট। কাঁধ অব্দি। চোখে চশমা। ম্যাক্সি পরনে সেই মেয়েটার পেছনে ভদ্রমহিলা আসছেন। চৌকাঠের কাছে দাঁড়ালেন। তাকালেন তমালের দিকে। কীরকম যেন ধূসর চোখে তাকালেন। মেয়েটি বলল—এই যে ইনি। দাদার নাম করতেচে......।

ভদ্রমহিলা তাকিয়ে আছেন তমালের দিকে। যেন চিনতে চেষ্টা করছেন। তমাল হাত জোড় করল। —নমস্কার।

ভদ্রমহিলাও হাত জোড় করলেন। ধীরে। ওঁর শরীরী ভাষায় কোনও চাঞ্চল্য নেই। তমাল ভাবছিল। এখন কী বলবে সে?

কীভাবে এগোবে কথা?........

—আপনি কোথা থেকে আসছেন? —প্রশ্নটা ভদ্রমহিলার কাছ থেকেই এল।

—আমি বরানগরের দিকে থাকি।

—বরানগর?........ সে তো এখান থেকে অনেক দূর! .....তমাল চুপ করে ছিল ভদ্রমহিলার কণ্ঠস্বরে বেশ আভিজাত্য আছে। এই গলা শুনলেই কোনও একজন সঙ্গীতশিল্পীর গলা শুনছি বলে মনে হয়। কার গলা বেশ?.....

—আপনি কি সুহাসের বন্ধু ছিলেন?—আবার প্রশ্ন ভেসে এল।......ছিলেন...... ব্যাপারটা অতীত হয়ে গেছে। হ্যাঁ। সেটাই তো স্বাভাবিক। যে মানুষটা পৃথিবীতেই আর নেই। এখনও তার বন্ধু থাকা যায় কীভাবে?....

—নাহ। আমি সুহাসের বন্ধু ছিলাম না।—তমাল জানাল। ভদ্রমহিলা তাকিয়ে আছেন। বেশ প্রখরভাবেই তাকিয়ে আছেন। যেন বুঝতে চেষ্টা করছেন আগন্তুককে। ওঁর স্বরের সঙ্গে কোন্ সঙ্গীতশিল্পীর স্বরের মিল আছে সেটা এখন মনে পড়েছে তমালের। সুচিত্রা মিত্র। ভদ্রমহিলার চেহারায়, পরিচ্ছদে এবং মুখশ্রীতেও যেন কোথাও সুচিত্রা মিত্রের সঙ্গে মিল আছে। তবে তাঁর মতন ইনি অতটা বয়স্কা নন। এই সেদিনও

তো রবীন্দ্রসদনে, কোনও এক রবিবার সকালে একটা অনুষ্ঠানে গিয়েছিল তমাল। এ ধরনের অনুষ্ঠানে সে প্রায়ই যায়। সে কবিতা লেখে। গান সে ভালোবাসে। বিশেষত রবীন্দ্রসঙ্গীত। রবিবার সকালের ঐ অনুষ্ঠানটি ছিল এক শোকসভা। আর এক সঙ্গীতশিল্পী সুবিনয় রায়-এর মৃত্যুর পর তাঁর স্মরণে এক অনুষ্ঠান। সেখানে সুচিত্রা মিত্রও এসেছিলেন। অনেক বেশি বৃদ্ধা লাগে তাঁকে আজকাল। হাঁটাচলায় সাবধানী এবং শ্লথ ভঙ্গি। প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে গানও তেমন গান না। শুধু সামান্য স্মৃতিচারণ করে চলে গেলেন। এই ভদ্রমহিলা, সুহাসের মা হবেন সম্ভবত, চেহারায় কিছুটা মিল পেয়েছেন সুচিত্রা মিত্র-র সঙ্গে। কিন্তু তাঁর বয়স অত নয়। তবে ইনি তার, তমালের মা-এর থেকে বেশ বড়ই হবেন। আমার মায়ের বয়স কত? তমালের চকিতে মনে হয়েছিল সে জানে না। তবে বয়সের তুলনায় নিজের মাকে যে বেশ বয়স্কা মনে হয় এটা তমালের নিজস্ব অনুভূতি। বরং তার বাবা অনেক যুবক রেখেছে নিজেকে। এখনও।

—সুহাসের বন্ধু নয়?—ভদ্রমহিলার স্বরে যেন হতাশা। —আমি ভেবেছিলুম সুহাসেরই বন্ধু।......তা হলে? কী দরকার একটু বলবেন ভাই?—ভদ্রমহিলা প্রখরভাবেই তাকিয়ে আছেন।

.........কী রকম এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতি। দরজার এপারে তমাল, ওপারে সামনেই ভদ্রমহিলা। আর সেই কাজের মেয়েটি ভদ্রমহিলার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। সেও বেশ ড্যাবডেবে চোখে তাকিয়ে আছে তমালের দিকে।

—আমি সুহাসের বন্ধু নয়।......তাকে দেখি নি কখনো। আসলে.......তমাল থামল। ভদ্রমহিলা তাকিয়ে আছেন। মেয়েটা তাকিয়ে আছে। তমালের ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছিল। কিন্তু কথাটা তো তাকে বলতেই হবে।

—সুহাসের ব্যাপারটা খবরের কাগজে পড়ে আমি চলে এলাম। —তমাল জানাল। —আমি জানতে চাই........।—থামল তমাল।

—কী জানতে চান?

—ঠিক কী ঘটেছিল?....মানে.....

—আপনি কি কোনও কাগজের সাংবাদিক?

—নাহ—আমি সাংবাদিক নই।

—তা হলে? সুহাসের ব্যাপারে আপনার কৌতূহল কেন?

—কিছু মনে করবেন না।......একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

—করুন।

—আপনি কি সুহাসের মা?

তমালের এই প্রশ্নের সরাসরি উত্তর ভদ্রমহিলা দিলেন না। এবার তিনি ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন মেয়েটির দিকে।—সুমি তুই যা। বাসনগুলো মেজে ফেল মা। বেলা হয়ে গেছে। আমাকে আবার রান্না বসাতে হবে......।

মেয়েটি বেশ বাধ্য। সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল। তমাল দেখতে পাচ্ছে। টিউবওয়েলের সামনে বালতি। বাসন। মেয়েটি উবু হয়ে বসেছে। কাজ শুরু করেছে।

—হ্যাঁ। আমি সুহাসের মা।

—দেখুন আমি সাংবাদিক নই। কিন্তু সুহাসের খবরটা পড়ে আমার খুব জানতে ইচ্ছে করল। আমি খুব ডিসটার্বড হয়ে আছি।......খবরটা খুব শকিং! তাই....

—আপনি কি বাড়ির ভেতরে আসবেন? বাইরে দাঁড়িয়ে এভাবে কথা হয় না।

—ভেতরে? হ্যাঁ যাব। তমাল পা বাড়াল। ভদ্রমহিলা সরে দাঁড়ালেন। তমাল উঠোনের দিকে ঢুকে এল। ভদ্রমহিলা দরজা বন্ধ করলেন। খিল তুলে দিলেন।.......তমাল তাকিয়ে দেখছিল বাড়ির ভেতরটা। একতলাতে উঠোন। ওপাশে দুটো ঘর। দেখে মনে হল দুটো ঘরই বন্ধ। টিউবওয়েলের পাশ দিয়ে উঠে গেছে সিঁড়ি। দোতলায়। একতলাতে কি কেউ থাকে না? এই বাড়িতে ঠিক কতজন লোক থাকে? সুহাসের বাবা কি বাড়িতে নেই? নাকি ভদ্রমহিলা বিধবা? ওঁর পরনের শাড়ি দেখলে অবশ্য সেটাও ধরে নেওয়া যেতে পারে। আবার শাড়ির কালো পাড় শোকের কারণেও হতে পারে। মেয়েটা বালতির জলে বাসন ডুবিয়ে ধুচ্ছে।

—চলুন দোতলাতে বসি।—ভদ্রমহিলা ডাকলেন। দোতলার সিঁড়ি দিয়ে উঠছেন। তমাল ওঁকে অনুসরণ করল। দোতলায় উঠে সিঁড়ি, ঢাকা দালান। সামনেই ঘর। ওপাশেও মনে হয় আরও দুটো ঘর আছে। বাড়িটা পুরনো। এখনকার মতন ফ্ল্যাট নয়। ঘরের সিলিং দেখলেই বোঝা যায় পুরনো বাড়ি। কড়ি বরগা ছাদ। জানলা বড় বড়। লোহার শিক। গ্রিল নয়। দেওয়াল পুরু। আজকাল ফ্ল্যাটের দেওয়াল এত পুরু হয় না। সামনে সোফা। সেটাও পুরনো। অন্যান্য আসবাবপত্রও নতুন নয়। তবে সবকিছুই বেশ পরিচ্ছন্ন।

—আপনি বসুন। —ভদ্রমহিলা সোফার দিকে ইঙ্গিত করলেন। বসল তমাল। ঘরের ফ্যান চালিয়ে দিয়েছেন উনি। ফ্যানের হাওয়া গায়ে লাগছে। আরামের অনুভব হল তমালের। এবার সে কীভাবে কথা শুরু করবে?

—অনেক দূর থেকে আসছেন। এই দুপুরবেলা। একটু শরবত খান।

—নাহ। আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমি আসলে বাড়ি থেকে খাওয়া দাওয়া করেই—

—আপনি বসুন। আমি শরবত করে আনি। সুমি শরবত বানাতে পারবে না। আমি করে আনছি......

—দেখুন আপনি শুধু শুধু ব্যস্ত হচ্ছেন.....

—বসুন। পাঁচ মিনিটের ব্যাপার।—ভদ্রমহিলা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। সিঁড়ি ধরে একতলাতে। তার মানে কিচেন বা রান্নাঘর একতলাতে। সেখানে তো দুটো ঘর দেখল তমাল। তার মধ্যে একটা হয়তো। কিংবা ঐ ঘরদুটোর পাশে রান্নাঘরের অবস্থান। তমালের নজরে পড়েনি। পকেট থেকে রুমাল বের করে তমাল কপাল

মুছল। গলা মুছল। ঘাড় মুছল। তারপর ডান পাশের দেয়ালের দিকে তাকাতেই চমকে উঠল। একটা ফোটো। খুব ছোট ফ্রেমের নয়। মাঝারি আকারের। একজন পুরুষের ছবি। বেশ সুপুরুষ। ঘন, ব্যাকব্রাশ চুল। চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল এবং গভীর। ওটা কার ফোটোগ্রাফ? ফ্রেমের নীচের দিকে কী যেন লেখা। কালো ফ্রেমে সাদা রং-এ লেখা আছে কিছু। ছবিটা দেয়ালের একটু উঁচুতে আটকানো থাকায় ঠিক পড়তে পারছে না। তমাল সোফা ছেড়ে সে উঠে গেল। পড়তে চেষ্টা করল কী লেখা আছে ফ্রেমে। এবার বেশ পড়তে পারছে।.......জন্ম ২২ আগস্ট, ১৯৪৫ঃ .....এই ফোটো কার? সুহাসের তো আর হতে পারে না। তাহলে কার? সুহাসের বাবার? ভদ্রমহিলা তা হলে বিধবা? বেশি বয়স তো ছিল না সুহাসের বাবার? পঞ্চান্ন বছরের কাছাকাছি বয়স তো আর মৃত্যুর বয়স নয়? কীভাবে মৃত্যু হল ওঁর? অসুখে নিশ্চয়? কী অসুখ?

—শরবতটা খেয়ে নাও বাবা। —সুহাসের মা যে কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর হাতে কাচের প্লেট। তার ওপর কাচের গ্লাস। শরবত। একটু ঘোলাটে। তার মানে লেবুর শরবত। চিনিও দেওয়া আছে নিশ্চয়ই। শুধু শরবত তো নয়? প্লেটে দুটো মিষ্টিও আছে। সন্দেশ।

—দেখুন আপনি শুধু শুধু ব্যস্ত হলেন।....এসবের দরকার ছিল না। আপনার মনের অবস্থা আমি জানি। এখন বাইরের কেউ বাড়িতে আসা মানে আপনাকে ডিসটার্ব করা। কিন্তু খবরটা গতকাল পড়েই কীরকম যেন মনে হল আমার। মনে হল আমি জানব..... সুহাসের সম্বন্ধে আরও কিছু জানার আছে। সুহাস অনেকের মতন নয়। তার বিষয়ে আমার কিছু জানা দরকার। খবরের কাগজ পড়ে আর কতটুকু জানা যায় বলুন? তাই—

—আমি সব বুঝেছি বাবা। তোমাকে আর বুঝিয়ে বলতে হবে না। আমি বুঝেছি তুমি কেন এসেছো। আমি তো মা। আমি বুঝব না? তুমি তো আমার ছেলেরই বয়সী। আমার সুহাসের বয়সী। তুমি এসেছ বলে আমি মোটেও বিরক্ত হইনি। বরং ভালো লাগছে। এভাবে কেউ আসেনি। তুমি যেভাবে এসেছ। প্রত্যেকেই এসেছে কোনও না কোনও পারপাস্ নিয়ে। রিপোর্টাররা এসেছে। পুলিশ এসেছে। পাড়ার ছেলেরা এসেছে। আত্মীয়স্বজনরা এসেছে। তাদের প্রত্যেকের একটাই প্রশ্ন—সুহাস কেন ওরকম করল? এর পেছনে আসল কারণটা কী? এটাই আমার ভালো লাগে নি। এই আসল কারণটা জানতে চাওয়া। খবরের কাগজে যা লেখা হয়েছে তা অনেকেই বিশ্বাস করছে না আমি জানি। অনেকেই ভাবছে সুহাসের আত্মহত্যার কারণ অন্য কিছু। এক প্রশ্ন শুনে শুনে আমি ক্লান্ত। ভদ্রমহিলার স্বর ক্ষীণ হয়ে এল। তমাল বুঝতে পারল উনি কান্না সামলে নেবার চেষ্টা করছেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভদ্রমহিলা নিজেকে সংযত করে নিলেন। তমালকে তিনি বললেন—তুমি বোসো। শরবতটা খেয়ে

নাও। —আপনি থেকে কিছুক্ষণ আগেই তুমিতে চলে এসেছেন ভদ্রমহিলা। তমাল আর আপত্তি করল না। খেয়ে নিল শরবত। মিষ্টি দুটোও খেতে হল তাকে। ভদ্রমহিলা এমনভাবে অনুরোধ করছিলেন তমাল তাঁকে অমান্য করতে পারল না। সোফার পাশেই একটা বেতের মোড়া। ভদ্রমহিলা মোড়াটাকে টেনে আনলেন। বসলেন তমালের প্রায় মুখোমুখি। শরবতের গ্লাস শেষ করে চামচ দিয়ে ভেঙে মিষ্টি দুটো খেয়ে তমাল প্লেট, কাচের গ্লাস এবং চামচ সোফার একপাশে মেঝেতে নামিয়ে রেখেছিল। ভদ্রমহিলা ডাকলেন—সুমি—এই সুমি—একবার ওপরে আয় মা। বেশ বাধ্য মেয়ে সুমি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দোতলার এই ঘরে উঠে এল। সরঞ্জামগুলো নিয়ে গেল। ভদ্রমহিলা জিজ্ঞেস করলেন—তোমার নাম কী? তমাল নাম বলল। ভদ্রমহিলা জিজ্ঞেস করলেন বাড়িতে কে কে আছে। তমাল জানাল। ভদ্রমহিলা এবার চুপ করলেন। কী যেন ভাবছিলেন। হয়তো ভাবছিলেন যে, আর কী কী প্রশ্ন করা যায়। তমাল এবার কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই ভদ্রমহিলা বললেন—তোমার নাম জিজ্ঞেস করলাম যখন আমার নামটা জানানোও ভদ্রতা। আমার নাম ইন্দ্রাণী বন্দ্যোপাধ্যায়। তমাল দেয়ালের ফোটোগ্রাফের দিকে আঙুল দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল—উনি নিশ্চয়ই সুহাসের বাবা?

—হ্যাঁ। ঠিকই ধরেছ। ইন্দ্রাণী তমালের দিকে তাকিয়ে বললেন।

৪

এরপর তমাল কী ভাবে কথা শুরু করবে বুঝতে পারছিল না। ইন্দ্রাণী দেয়ালে সুহাসের বাবার ফোটোগ্রাফের দিকে তাকিয়ে আছেন। স্বামীর কথা কি ওঁর মনে পড়ছে? আবাব ফোটোর দিকে তাকাল তমাল। জন্ম এবং মৃত্যুর তারিখ সেখানে লেখা আছে। প্রায় পঞ্চান্ন বছর বয়সে মারা গেছেন সুহাসের বাবা। মারা যাবার পক্ষে এমন কিছু বয়স নয়। আজকাল মানুষের গড় আয়ু হল ষাট থেকে সত্তরবছর। সুহাসের বাবার মৃত্যু অসময়ের এটা বোঝা যায়। কীভাবে মারা গেলেন উনি? অসুস্থতার কারণে? নাকি.....?

সুহাসের এবার সত্যিই অস্বস্তি হচ্ছিল। ইন্দ্রাণী এক দৃষ্টে সুহাসের বাবার দিকে তাকিয়ে আছেন। গভীরভাবে কিছু ভাবছেন। কী ভাবছেন? ভদ্রলোকের মৃত্যুর কারণ কি তমালের জিজ্ঞেস করা উচিত? সুমি নামের কাজের মেয়েটা ঘরে ঢুকল। —কাকিমা? —সুমি ডাকল। ইন্দ্রাণী যেন মৃদু চমক খেলেন। তাকালেন সুমির দিকে।—কিছু বলবি?—জিজ্ঞেস করলেন।

—খুকু জল খাবে।—সুমি জানাল।

—বোতল ভরা জল আছে টিপয়ে। ওর মাথার কাছে। গ্লাস ধুয়ে নিয়ে তাতে জল ঢেলে ওকে আস্তে আস্তে তুলে ধর। ও নিজেই জল চুমুক দিয়ে খেয়ে নেবে।

—সেরকমভাবেই তো ওর মুখে জলের গেলাস ধরেছিলুম। কিছুতেই খেল না। শুধু মাথা দুপাশে নাড়াচ্ছে। ও আসলে এখন তোমাকে চায়।

—আমাকে চায়?—ইন্দ্রাণীর কপাল কুঁচকে গেল। তিনি ফোটো থেকে চোখ সরিয়ে নিয়েছেন। কিছু ভেবে নিলেন। তারপর তমালের দিকে তাকিয়ে বললেন—একটু বোসো। আমি আসছি।

তমাল ভাবছিল খুকু কে? ইন্দ্রাণীর সন্তানের সংখ্যা কি দুটি? সুহাস তাঁর ছেলে। তাহলে খুকু কি মেয়ে? কত বড় মেয়ে? সেই মেয়ে কি অসুস্থ?

প্রায় পাঁচ-ছ মিনিট কেটে গেল। হাতঘড়ি দেখল তমাল। বেলা সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে। এবার তার উঠে পড়া উচিত। এই গলি থেকে বেরিয়ে মোড় অব্দি যেতে হবে। তারপর বাস ধরতে হবে। বাসে তমালদের বাড়ির কাছাকাছি যেতে প্রায় চল্লিশ মিনিট সময় লাগবে। তারপর বাস স্ট্যান্ড থেকে অটোতে মিনিট সাত। তার মানে কিছুক্ষণ বাদেই উঠে পড়া উচিত। কিন্তু যে জন্যে এই বাড়ি খুঁজে এতদূর আসা সেই দরকার তো মিটল না তমালের। সে সুহাসের বিষয়ে অনেক কিছু জানতে এসেছিল। কী এমন ঘটেছিল যে, সুহাস অত ভয়ংকর মৃত্যুকে বেছে নিল? রাতের অন্ধকারে একা একা এই বাড়ির ছাদে উঠে গিয়েছিল সুহাস। তার হাতে ছিল এক টিন কেরোসিন। সেই কেরোসিনের টিন নিজের শরীরে উপুড় করে দিয়েছিল সে। তারপর পৃথিবীর প্রতি অভিমানে, জীবনের প্রতি প্রবল বিতৃষ্ণায় সুহাস একটা জ্বলন্ত দেশলাইকাঠি ছুড়ে দিয়েছিল নিজের শরীরে! কী বীভৎস কান্ড! তমাল দৃশ্যটা এক মুহূর্ত কল্পনা করেই কেঁপে উঠল!

ইন্দ্রাণী ঘরে ঢুকলেন। তাঁর কপালে ঘাম। নিজের শাড়ির আঁচল দিয়ে ঘাম মুছলেন কপালের। বিধবাদের মতো যে সাদা থান পরেন ইন্দ্রাণী তা নয়। তিনি একটা তাঁতের ঘি-রং শাড়ি পড়ে আছেন। খুব সরু জরির কালো পাড় সেই শাড়ির।

—একা বসে থাকতে খারাপ লাগছে। তাই না?

—নাহ.....মানে.....বাড়ি ফিরতে হবে।

ইন্দ্রাণী বললেন—। তোমার বাড়ি একটু দূর বটে। কিন্তু তুমি যা জানতে এসেছিলে তাই তো জানা হল না?

—সেটা অবশ্য ঠিক। কিন্তু.......

—তোমার বাড়িতে ফোন আছে? ইন্দ্রাণী জিজ্ঞেস করলেন।

—আছে।

—তাহলে আমি একটা কথা বলব?

—কী?

—বাড়িতে ফোন করে দাও। বলে দাও আমার এখানে এসেছ। একেবারে দুপুরে দুটি ভাত ডাল খেয়ে ধীরে সুস্থে বাড়ি ফিরবে।

—তা হয় না মাসিমা। —তমাল বলল।

—কেন হয় না?

—মা তো আপনাকে চেনে না। আমি কেন এসেছি ব্যাপারটা বুঝতেই পারবে না মা.....।

—আমি কি ফোনে কথা বলব তোমার মায়ের সঙ্গে?

ইন্দ্রাণীর এই প্রস্তাবে তমাল কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করল। তারপর সে বলল—নাহ থাক। আধ ঘন্টার মধ্যে আমি যা জানতে এসেছি জানা হয়ে যাবে। আপনি যদি আমাকে বলেন—

—কী বলব? কী জানতে চাও?—ইন্দ্রাণী এখন বিপরীত দিকের সোফায় বসেছেন। মুখোমুখি দুটো সোফা এই ঘরে। তমাল সোফাতেই বসে আছে।

—কী জানতে চাও? তুমি যখন নিজে থেকে আমার বাড়িতে এসেছ জানতে, আমি বলতেই চাই।

—খবরের কাগজে যা লিখেছে ব্যাপারটা কি সেরকমই?

—নাহ, সে রকম নয়। খবরের কাগজে যা বেরিয়েছে তা ছাড়াও আরও কিছু ঘটেছিল।

—কী ঘটেছিল?

ইন্দ্রাণী কিছুক্ষণ ভাবলেন। যেন কী বলবেন তা গুছিয়ে নিচ্ছিলেন মনে মনে। একবার গলা খাঁকারি দিলেন। তারপর বলতে শুরু করলেন।

—বেশ কিছুদিন আমাদের ফোন খারাপ হয়ে পড়ে ছিল। টেলিফোন অফিসে অনেকবার কমপ্লেন করা হয়েছিল। কোনও লাভ হয়নি। তখন একদিন সুহাস নিজেই ওদের অফিসে গিয়েছিল।

—তার পর?

—আমি জিজ্ঞেস করেছিলুম কী রে কী বলল? সুহাস জানিয়েছিল যে সে বেশ চেঁচামেচি করেছে টেলিফোন অফিসে। সে অফিসারের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল। কিন্তু অফিসারের সঙ্গে ওকে প্রথমে দেখা করতে দেওয়া হয়নি। অফিসার ব্যস্ত আছেন এই অজুহাতে। তখন সুহাসের খুব রাগ হয়ে যায়।......সুহাস কিন্তু একটু রগচটা ছেলে ছিল বাবা......।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। ওর পছন্দ মতন কোনও কিছু না হলেই রেগে যেত। তবে খুব যে বায়না করত, জ্বালাতন করত আমাকে তা কিন্তু নয়। খুবই বুঝদার ছেলে ছিল। ওর বাবা সরকারি চাকরি করত। আমি একটা প্রাইমারি ইস্কুলে পড়াই। এখান থেকে কিছুটা দূরে। মফস্বলের দিকে। ট্রেনে যেতে হয়। সরকারি চাকরিতে একটা নিয়ম আছে। জানো তো?

—কী নিয়ম কাকিমা?

—চাকরি করতে করতে যদি কোনও কর্মচারী মারা যায়, তাহলে সংসারটাকে দারিদ্রের হাত থেকে বাঁচাতে সেই কর্মচারীর স্ত্রীকে চাকরি দেওয়া হয়। যদি স্ত্রী চাকরি করতে কোনও কারণে না চান, তাহলে তাঁর সমর্থ ছেলে বা মেয়েকে সেই চাকরি দেওয়া হয়।

—তা হলে আপনি সরকারি চাকরি করেন না কেন?

—আমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্যরকম দাঁড়িয়েছিল। যেহেতু আমি স্কুলে চাকরি করি, তাই সরকারের পক্ষ থেকে বলা হল যে, আমার সংসারে তেমন অভাব নেই। কারণ আমি নিজে চাকরি করি, আমার স্বামীর নামে ফ্যামিলি পেনশন পাওয়া যাবে প্রতি মাসে। সেটা আমাদের তিনজনের পক্ষে যথেষ্ট।

—আপনারা তিনজন ছিলেন?

—হ্যাঁ। আমি, সুহাস আর আমার মেয়ে খুকু। সে প্রতিবন্ধী। আজ পনেরো বছর একই আছে। পাশের ঘরটাই ওর থাকার জন্যে। যাবার সময় একবার দেখে যেও।

সুহাস বলল—হ্যাঁ কাকিমা, ওকে দেখে যাব।

ইন্দ্রাণী আবার বলতে শুরু করলেন।

—সরকারি চাকরিটা ন্যায্য কারণেই হয়তো আর হল না। সত্যিই তো আমার সংসারে আর্থিক অভাব তখনও ছিল না। এখনও নেই। তার ওপর আমার ছেলে পড়াশোনাতে যথেষ্ট ভালো ছিল।

—ইঞ্জিনীয়ারিং-এ ডিপ্লোমা ছিল।

—হ্যাঁ। ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমা ছিল। কী করে জানলে?

—কাগজে যে খবর বের হয়েছিল, তাতেই লেখা ছিল।

—ওহ......আচ্ছা। খুব চাকরির চেষ্টা করছিল সুহাস। আমি জানতুম মোটামুটি একটা ভদ্রস্থ চাকরি ও জোগাড় করে নেবেই। কিন্তু তার পর সব কিছু অন্যরকম ঘটে গেল।

তমাল বুঝল ইন্দ্রাণী বেশ শক্ত মহিলা। জীবনে বহু ঝড়-ঝাপটা সামলেছেন। চট করে ভেঙে পড়েন না। হয়ত ছেলের কথা বলতে গিয়ে বুকের মধ্যে একটা কান্না উথলে উঠেছিল। মুহূর্তে তা সামলে নিলেন। একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন।

—আসলে সুহাসের গন্ডগোলটা কোথায় ছিল জানো? ও খুব সেন্টিমেন্টাল ছিল। অন্যায় সহ্য করতে পারত না একেবারে। মানুষের দুঃখ-কষ্ট দেখলে অস্থির হয়ে উঠত।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ।........তুমি বললে বিশ্বাস করবে? একবার তখন ও একটু ছোট। ক্লাস নাইনে পড়ে। খুব শীত পড়েছিল সেবার। একটা ভিখিরি ভিক্ষে করতে এসেছিল আমাদের

দরজায়। শীতে খুব কাঁপছিল ভিখিরিটা। কারণ তার গায়ে কোনও গরম জামা ছিল না। শুধু একটা ময়লা, ছেঁড়া, হাফ-হাতা শার্ট ছিল। লোকটাকে শীতে ওরকম কাঁপতে দেখে সুহাস তার একটা পুল-ওভার ওর হাতে তুলে দিয়েছিল! এরকমই দয়ালু ছিল ওর মনটা। একটু বড় হতে ও শুধু আমাকে বলত—মা দেশটা কোথায় যাচ্ছে বলো তো? আমি জিজ্ঞেস করতুম কেন রে কী হল? সুহাস বলত—সকালবেলা খবরের কাগজ খুললেই শুধু খারাপ খবর চোখে পড়ে!

......আমি বুঝতুম সব। তবুও মজা করার জন্যে বলতুম—কেন রে? কী খারাপ খবর দেখলি? সুহাস বলত—চারপাশে কী হচ্ছে না? পুলিশ কমিশনার কোটি কোটি টাকার স্ট্যাম্প কেলেঙ্কারিতে যুক্ত, হাসপাতালে রাতের অন্ধকারে ওষুধ পাচার হয়ে যাচ্ছে, সরকারি অফিসে ঘুষ না দিলে কিংবা পলিটিক্যাল রেফারেন্স না থাকলে তুমি কোনও কাজ পাবে না, বিচারক হাজার হাজার টাকার মিথ্যে চশমার বিল জমা দিচ্ছেন, রাজনৈতিক নেতারা দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত। শিক্ষক ছাত্রীকে একা পেয়ে তার শ্লীলতাহানি করছেন।......এসব কী হচ্ছে মা? এসব খবর কাগজের পাতায় দেখলেই রাগে আমার গা রি-রি করে!

তমাল জিজ্ঞেস করল—আপনি তাকে কী বলতেন?

—আমি বলতুম তুই ওসব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাস কেন? তুই নিজের কাজকর্ম নিয়ে থাক। তুই একা রাগ করে তো আর দুর্নীতি কমাতে পারবি না? সুহাস বলত—তা হয়তো ঠিক। কিন্তু তবুও আমি স্বস্তি পাই না মা। যে দেশে এতসব নোংরা ঘটনা ঘটছে; আমি তো সেই দেশেরই নাগরিক। ইন্দ্রাণী থামলেন।

তমাল জিজ্ঞেস করল—তারপর টেলিফোন অফিসের ব্যাপারটা কী ঘটেছিল বলুন।

—হ্যাঁ বলছি। —ইন্দ্রাণী বসার মুদ্রা পালটালেন। এক পা আর এক পায়ের ওপর তুলে সোফাতে হেলে বসেছিলেন। এখন দু পা একটু ছড়িয়ে বসলেন। সোফা থেকে পিঠ তুলে সোজা হলেন। তমাল ভাবছিল, কত বয়স হবে ইন্দ্রাণী কাকিমার? পঞ্চান্ন-র কাছাকাছি? কিন্তু ওঁকে দেখলে মনে হয় না। জীবনে অনেক ঝড়-ঝাপটা সামলেছেন। এখনও সামলাচ্ছেন। ওঁর এক প্রতিবন্ধী মেয়ে আছে। খুকু। পাশের ঘরেই সে শুয়ে আছে। যাবার সময় তাকে একবার দেখে যাবে তমাল। কী জীবন এই মহিলার! স্বামীকে হারিয়েছেন। ছেলেকে হারালেন। পনেরো বছরের মেয়ে প্রতিবন্ধী। তবুও তো তিনি বেঁচে আছেন! একেবারে ভেঙে পড়েননি। তমালের মনে হল, ইন্দ্রাণী বেশ সুন্দর দেখতে। কম বয়সে আরও ভালো দেখতে ছিলেন বোঝা যায়। অতীতের রূপের বিভা এখনও কিছুটা রয়ে গেছে ইন্দ্রাণীর মুখশ্রীতে। তাঁর দিকে তাকিয়েই ছিল তমাল। মাথার সামনের দিকের চুলের বেশ কিছুটা রুপোলি! ওঁকে দেখতে দেখতে আবার সেই কথাটা মনে হল, তমালের। ইন্দ্রাণীকে দেখতে অবিকল যেন গায়িকা সুচিত্রা মিত্রের মতন।

—বয়স হয়েছে তো বাবা। বেশিক্ষণ একভাবে বসে থাকলে পা দুটো দেখি ধরে যায়। —হেসে বললেন ইন্দ্রাণী।

—তারপর কী হল কাকিমা? টেলিফোন অফিসে সুহাস গিয়েছিল। অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু তাকে দেখা করতে দেওয়া হল না। —তমাল কথার সূত্র ধরিয়ে দিতে চাইল।

—হ্যাঁ। সুহাস আমাকে যা বলেছিল তাই আমি রিপিট করছি তোমাকে। .....অফিসারের ঘরের সামনে একজন লোক বসে ছিল। আজকাল যেমন সিকিউরিটির লোকজন থাকে আর কি অফিস-কাছারিতে। ঠিক পুলিশের লোক নয় ওরা। তবে পুলিসের মতনই। সেই লোকটা সুহাসকে বলেছিল, দেখা হবে না। অফিসার ব্যস্ত আছেন। তার সঙ্গে বেশ তর্কাতর্কি হয়েছিল সুহাসের। তারপর হঠাৎ সুহাস সিকিউরিটিকে পাত্তা না দিয়ে ঠেলে অফিসারের ঘরে ঢুকে পড়েছিল। সিকিউরিটি লোকটাও নাকি অফিসারের ঘরে ঢুকে সুহাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল। কিন্তু অফিসার লোকটা ভালো ছিলেন। সবাই তো আর খারাপ নয়। অনেক মানুষই এখনও ভালো আছেন। আর সে কারণেই বোধহয় পৃথিবীটা এখনও চলছে।

ইন্দ্রাণীকে থামতে হল। কারণ ঘরে ঢুকল কাজের মেয়ে সুমি। ইন্দ্রাণী জিজ্ঞেস করলেন—কিছু বলবি? সুমি জিজ্ঞেস করল—তাহলে ওবেলার জন্যে আলু-পটল কুটে দিই? তরকারি হবে? —তাই দে। আর জিনিসপত্র ঢাকা দিয়ে রাখবি। খাবার দাবারে, একেবারে মাছি বসতে দিবি না।—আচ্ছা। —সুমি চলে গেল। তমাল তার কবজি ঘড়ির দিকে তাকাল। বারোটা বেজে কাঁটা পনেরোর ঘরে। বেলা একটাব মধ্যে তাকে উঠতেই হবে। না হলে বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে যাবে। সে বাড়ি না ফিরলে মা খাবে না। আর সেটাই স্বাভাবিক। ইন্দ্রাণী বুঝলেন তমালের উদ্বেগ।

তিনি বললেন—তুমি যখন শুনতে চাইছ সুহাসের কথা তখন না বলে আমি পারব না। বলতে আমাকে হবেই। অনেকেই খবরের কাগজে পড়েছে ঘটনাটা। কিন্তু তারা তো কেউ কৌতূহলি হয়নি? তুমি হয়েছ। আমার বাড়ি খুঁজে জানতে এসেছ কেন ছেলেটা ওরকমভাবে আত্মহত্যা করল। আমি সত্যিই অবাক হয়েছি। তোমাকে সব বলব আমি। কিন্তু সব কথা শুনতে গেলে তো তোমার দেরি হয়ে যাবে। তোমার মা ভাববেন।

—কাকিমা আপনি বলে যান। সবটা না শুনে আমি যাব না।

ঠিক আছে। আমি সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করছি। তোমার সত্যিই দেরি হয়ে যাবে।.....অফিসার সুহাসের অভিযোগ শুনেছিলেন। তারপর ডেকে পাঠিয়েছিলেন একজন কর্মচারীকে। তাকে বলেছিলেন যে, পনেরোদিন আগে কমপ্লেন করা সত্ত্বেও টেলিফোন সারানো হয়নি কেন? বেশ ধমকেছিলেন কর্মচারীটিকে। তারপর সুহাসকে অফিসার বলেছিলেন—আপনি চলে যান ভাই। আজ দুপুরের দিকে আপনার বাড়িতে

মেকানিক যাবে। অফিসারের কথামতোই একজন মেকানিক এসেছিল আমাদের বাড়িতে সেদিন দুপুরেই। একজন তো নয়।.....দুজন। হ্যাঁ দুজন এসেছিল টেলিফোন সারাতে। আমি দুপুরবেলা একটু বিশ্রাম নিয়ে থাকি। সেদিনও শুয়েছিলুম বিছানায়। পাশের ঘরে। খুকুর পাশে। তন্দ্রামতন এসেছিল আমার। এ-ঘরে মেকানিকরা ছিল। সুহাস ছিল। লাইন চেক্ করবার জন্যে বোধহয় বাড়ির বাইরেও গিয়েছিল মেকানিকরা। সুহাসই সব তদারক করছিল। তন্দ্রার মাঝে ওদের কথাবার্তা আমার কানে আসছিল। তারপর কখন যেন চোখ দুটো জড়িয়ে এসেছিল। সুহাসের ডাকে তন্দ্রা কেটে গিয়েছিল।

—টেলিফোন সারিয়ে মেকানিকরা তখন চলে গিয়েছিল? তমাল জিজ্ঞেস করেছিল।

—টেলিফোন সারানো হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু মেকানিকরা তখনও যায়নি। তারা কিছু টাকা ডিমান্ড করেছিল।

—টাকা ডিমান্ড করেছিল?

—হ্যাঁ। বলেছিল ফোন একচান্সে সারিয়ে দিলুম। কিছু টিপস্ লাগবে।

—সুহাস ওদের কী বলেছিল?

—সুহাস যে রগচটা ছেলে ছিল তা তোমাকে আগেই বলেছি। সে রেগেমেগে আমার কাছে চলে এসেছিল। ডেকেছিল আমাকে। আমি চোখ খুলে ওকে দেখে উঠে বসেছিলুম বিছানায়। বলেছিলুম—কী হয়েছে রে? সুহাস আমাকে জানিয়েছিল ওদের বখশিস্ চাওয়ার কথা। বেশ রেগে গিয়েছিল সে!

—আপনি কী বলেছিলেন?

—আমি বলেছিলুম পঞ্চাশ টাকা বড্ড বেশি। দুজনকে দশ টাকা করে কুড়ি টাকা দিয়ে দে।

—তখন সুহাস কী বলেছিল?

—সুহাস আরও রেগে গিয়েছিল। বলেছিল—কেন ওদের টাকা দেব মা? ওরা তো মেকানিক। ওদের কাজই হল টেলিফোন সারানো। সেই কাজের জন্যে তারা মাইনে পাচ্ছে প্রতিমাসে। একজন সরকারি কর্মচারীকে কাজ করার জন্যে ঘুষ দিতে হবে কেন?— ইন্দ্রানী থামলেন। যেন একটানা কথা বলার পর একটু হাঁফ ছাড়তে চাইলেন।

তমাল জিজ্ঞেস করল—তারপর কী হল কাকিমা? লোকদুজন টাকা না নিয়েই কী চলে গেল?

—হ্যাঁ। চলে ওরা গিয়েছিল ঠিকই। তবে বেশ তর্কবিতর্ক হয়েছিল ওদের সঙ্গে সুহাসের। ওরা বলেছিল সুহাসকে —আপনি শুধু শুধু রাগছেন ভাই। সব বাড়িতেই ফোন সারাতে গেলে আমরা এরকম টিপস্ চেয়ে থাকি। পেয়েও থাকি। কেউ আপনার মতো সিন-ক্রিয়েট করে না। আমার ঘুম ছুটে গিয়েছিল। আমিও সুহাসের পাশে এসে দাঁড়িয়ে ছিলুম। খুবই রেগে গিয়েছিল সুহাস। আমি তাকে শান্ত হতে বলছিলুম

বারবার। এমনকী দুটো দশ টাকার নোট দিতেও চেয়েছিলুম ওদের। লোকগুলো খুশি হয়ে হয়তো চলেও যেত। কিন্তু সুহাস কিছুতেই আমাকে ওদের টাকা দিতে দিল না। সে চেঁচিয়ে বলছিল—ঘুষ দেবে না মা। কিছুতেই ঘুষ দেবে না। কেন ঘুষ দেব আমরা? ঘুষ দেওয়াও তো একটা ক্রাইম। ওরা যে ঘুষ চেয়েছে তার জন্যে আমি ওদের অফিসারের কাছে কমপ্লেন করব....!

—এই কথা শোনার পর লোকগুলো কি চলে গেল?

—হ্যাঁ। চলে গিয়েছিল ঠিকই। কিন্তু যাবার আগে সুহাসের দিকে তাকিয়ে বলে গিয়েছিল—আপনি সামান্য ব্যাপার নিয়ে খুব বাড়াবাড়ি করলেন। সুহাস তাতে আরও রেগে গিয়েছিল। বলেছিল—আমাকে বলছেন আমি বাড়াবাড়ি করছি! কাজের বদলে বাড়িতে এসে ঘুষ চাইতে লজ্জা করল না? আমি ছাড়ব না আপনাদের।.....আমি চেষ্টা করছিলুম সুহাসকে শান্ত করতে। কিন্তু সে অত্যন্ত রেগে গিয়েছিল। চোখ-মুখের চেহারাই পালটে গিয়েছিল। ওরকম রাগতে আমি তাকে কোনও দিন দেখিনি। রাগে মুখটা ওর কীরকম বেঁকে গিয়েছিল। চোখ দুটো যেন জ্বলছিল। সে বারবার বলছিল লোকগুলোকে—আপনারা মানুষ না কী ? মাইনে পান প্রতি মাসে। সেটা কী জন্যে দেওয়া হয়? আপনাদের লজ্জা করে না? আপনাদের বাড়িতে ছেলেমেয়ে নেই? তাদের আপনারা কী শেখান?—ইন্দ্রানী আবার থামলেন। তমাল জিজ্ঞেস করল—ঐ দুজন লোক কি চুপচাপ শুনছিল সুহাস যা বলছিল?

—নাহ। চুপচাপ যে শুনছিল তা ঠিক বলা যাবে না। একজন বেঁটে মতন বারবার বলছিল—দেখুন ভাই! আপনি কিন্তু ফালতু উত্তেজিত হচ্ছেন। শুধুশুধু কিছু বাজে কথা বলছেন। এটা কিন্তু রীতি। ফোন সারিয়ে দেওয়ার পর সব বাড়ি থেকেই আমরা এরকম বখশিস পেয়ে থাকি। এটা ঠিক ঘুষ নয়।...তাতে সুহাস বলেছিল, ঘুষ নয়তো কী? আপনারা ঠিক বলছেন না। সরকারি কর্মচারী মাইনে ছাড়া উপরি টাকা নিলেই তাকে ঘুষ বলে। আপনারা হলেন ঘুষখোর! আপনাদের অফিসার বরং ভালো লোক। ওঁর কাছে আমি আপনাদের নামে কমপ্লেন জানাব।....বলেছিল সুহাস।

—তখন সেই লোক দুজন কী বলেছিল?

—ওরা দুজন ছিল। একজন বেঁটে মতন। রোগা। খেঁকুরে মার্কা চেহারা। আর একজনের মাঝারি হাইট। গাঁট্টাগোট্টা চেহারা। সেই লোকটা তেমন কিছু কথা বলছিল না। শুধু কীরকম ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে ছিল আমার ছেলের দিকে। আমাকে একবার বলেছিল লোকটা—আপনার ছেলে এ ভাবে আমাদের অপমান করে কাজটা ভালো করল না। আমরা সার্ভিস দিলুম। আবার ইনসাল্টেড হলুম। কীরকম ঠাণ্ডা চোখে লোকটা তাকিয়ে ছিল সুহাসের দিকে। তার পর ওরা একসময় চলে গিয়েছিল।

তমাল জিজ্ঞেস করল—সেদিন রাতেই কি সুহাস একা একা ছাতে উঠে নিজের গায়ে কেরোসিন ঢেলে.....

—ব্যাপারটা ঠিক সেরকম নয়। আরও একটা সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটেছিল।

—সাংঘাতিক ব্যাপার?

—সাংঘাতিক ব্যাপার।......সেই ঘটনার কথা আমি সাংবাদিকদের বলিনি। সেটা শুধু আমি জানি। আর আমার কাজের মেয়ে জানে। আজ তোমাকে বলছি। কিন্তু তোমার বোধহয় সত্যিই দেরি হয়ে যাবে বাড়ি ফিরতে। আমি আবার বলছি। যদিও আজকেরই আলাপ তাও বলছি।

—কী বলবেন?

—বাবা তুমি আমার ছেলের মতনই। তুমি লজ্জা কোরো না। আমার বাড়িতে দুটি ডালভাত খেয়ে নাও। তোমার বাড়িতে একটা ফোন করে দাও।

তমাল বলল—মাসিমা-প্লিজ—আপনি এ ব্যাপারে আর আমাকে অনুরোধ করবেন না। দেরি করে বাড়ি ফিরলে মা হয়তো তেমন রাগবেন না। কিন্তু একেবারেই বলা নেই বাড়িতে। তা সত্ত্বেও আমি যদি বাইরে থেকে খেয়ে আসি তাহলে মা খুব রাগ করবেন। আজকের দিনটা আমাকে এক্সিউজ করুন। আমি আপনার বাড়িতে এর পরও আসব। তখন না হয় একদিন....।

—ঠিক আছে। তাই হবে। পরে যখন তুমি আসবে আমার বাড়িতে খেয়ে যেতে হবে কিন্তু.....।

—কথা দিলাম মাসিমা। .....এখন আপনি সেই সাংঘাতিক ঘটনার কথা বলুন।

—হ্যাঁ বলছি।.....লোকগুলো চলে যাবার পর দুদিন কেটে গেল। কিছু ঘটেনি। আমি ব্যাপারটা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলুম। তিনদিনের দিন সুহাস সকালে খেয়ে দেয়ে বেরিয়েছিল। সকালে আমি স্কুলে থাকি। সকাল সাতটা থেকে আমার স্কুল। রান্নাবান্না সুমি করে। সুহাস প্রায়ই নানা লাইব্রেরিতে যেত। পড়াশোনা করত। ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমা থাকা সত্ত্বেও চাকরিবাকরি পায়নি। সে জন্যে ওর মনে ক্ষোভ ছিল। দুশ্চিন্তাও ছিল। ও ভেবেছিল কমপিটিটিভ পরীক্ষায় বসবে। ডব্লিউ. বি. সি. এস. পরীক্ষায় বসবে বলে ফর্ম ফিল-আপ করে জমা দিয়েছিল। পরীক্ষায় প্রিপ্যারেসনের জন্যেই নানা লাইব্রেরিতে ঘুরে নোটস্ জোগাড় করত। আমি ভেবেছিলাম সেদিনও সেরকমই বেরিয়েছিল। বিকেলের দিকে ঠিক ফিরে আসবে। কিন্তু সন্ধের পরও যখন ফিরল না তখন একটু চিন্তা হচ্ছিল অবশ্য। কিন্তু আমি ভেবেছিলুম হয়তো কোথাও গেছে।

—সিনেমা?

—সিনেমা ঠিক পছন্দ করত না ও। তবে অ্যাকাডেমি হলে বা রবীন্দ্রসদনে প্রায়ই গ্রুপ থিয়েটার দেখতে যেত। আমি ভেবেছিলুম সেরকমই হয়ত কিছু... কিন্তু রাত আটটা নাগাদ একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়িয়েছিল আমাদের বাড়ির দরজায়।

—সুহাস সেদিন ট্যাক্সিতে ফিরেছিল?

—হ্যাঁ।...ফিরতে বাধ্য হয়েছিল।

—বাধ্য হয়েছিল?

—হ্যাঁ। ও একা ছিল না। তিনজন লোক ওকে ধরাধরি করে নামিয়েছিল...।

—কোনও অ্যাকসিডেন্ট?—উদগ্রীব হয়ে তমাল জিজ্ঞেস করল।

—অ্যাকসিডেন্ট?...নাহ অ্যাকসিডেন্ট ঠিক নয়। তবে বেশ ইনজিওরড্ হয়েছিল সুহাস।

—ইনজিওরড্?—তমাল ঝুঁকে বসল। কৌতূহলে।

—আমি ডোর-বেল বাজলে প্রথমে বুঝতে পারিনি। ভেবেছিলুম ছেলেই ফিরে এসেছে। দরজা খুলেছিল সুমি। সুহাসকে দেখেই সে হাউমাউ করে দোতলায় আমার কাছে উঠে এসেছিল। সুমি বলেছিল—কাকিমা, দেখে এসো তোমার ছেলের কী হয়েছে!... কী হয়েছে? ধড়ফড় করতে করতে আমিও নেমে এসেছিলুম নীচে। দেখেছিলুম সুহাসকে ধরে ট্যাক্সি থেকে নামিয়ে আনছে তিনজন অচেনা লোক! সুহাসের ডান হাতে ব্যান্ডেজ। কপালে প্লাস্টার। চোখ মুখ ফোলা। আর তার গায়ে জামা ছিল না। ট্রাউজারও ছিল না। শুধু আন্ডার উইয়ার...।

—জামা-প্যান্ট ছিল না? শুধু আন্ডারউইয়ার? কী হয়েছিল সুহাসের?

—সেই তিনজনের মুখে শুনেছিলুম, সুহাস ঐ অবস্থায় রাস্তায় ধারে শুয়ে কাতরাচ্ছিল। সেখানে থেকে ওরা ওকে ট্যাক্সিতে হাসপাতাল নিয়ে যায়। হাসপাতালে ফার্স্ট এড দেওয়ার পর ওকে ওরা বাড়িতে নিয়ে এসেছিল।

—কিন্তু কী হয়েছিল সুহাসের?

—আমিও প্রথমে বুঝতে পারিনি ওর কী হয়েছিল। সেই তিনজন সত্যিই ভদ্রলোক। আজকালকার দিনে কে এতটা করে? আমি ওঁদের ধন্যবাদ দিয়েছিলুম। ট্যাক্সিভাড়া মিটিয়ে দিয়েছিলুম। তার পর সুহাসের শুশ্রুষায় লেগে গিয়েছিলুম। যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল সুহাস। কাতরাতে কাতরাতেই আমাকে বলেছিল—

—কী বলেছিল মাসিমা?

—সুহাস বলেছিল আমি খুব অপমানিত হলুম মা। খুব বে-ইজ্জত হলুম। ওরা আমাকে রাস্তায় সকলের সামনে নাঙা করে পিটিয়েছে...। ইন্দ্রানী থামলেন। তমালের মনে হল, ইন্দ্রানী যেন কান্না চাপতে চাইছেন। এতক্ষণ কথা বলার পর এই প্রথম তমাল লক্ষ্য করল ইন্দ্রাণীর কথা বুজে এসেছে। তিনি থেমে গেলেন। কপালে হাত দিয়ে মুখ নামালেন। তমালের অস্বস্তি হচ্ছিল। সে অন্যদিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। দেয়ালের ক্যালেন্ডারের দিকে তাকিয়ে রইল। কোনও বিদেশি জায়গার ছবি। গাছপালা, রাস্তাঘাট সবকিছু ঢেকে আছে তুষারে। নির্জন, জনমানবশূন্য, তুষার–ঢাকা রাস্তা দিয়ে চলমান শুধু এক শিশু। গরম পোশাক আর টুপিতে তাকে ঠিক একজন এস্কিমোর মতন দেখাচ্ছে। সুমি রান্নাঘরে বোধহয় কিছু একটা সেদ্ধ করছে। প্রেশার কুকারের শিস কানে আসছে। তমাল তাকাল ইন্দ্রানীর দিকে। নিজেকে তিনি সংযত করতে

পেরেছেন। তমালের দিকে তাকিয়ে ম্লান হাসলেন। বললেন—কিছু মনে কোরো না বাবা। ছেলের যন্ত্রণাকাতর মুখটা এক মুহূর্তে চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল...।

—বুঝতে পারছি মাসিমা। আপনার কষ্ট।...কিন্তু কারা সুহাসকে...?

—বলছি। সেটাই বলছি। সুহাসের মুখ থেকে যা শুনেছিলাম সেটাই বলছি।...যে লাইব্রেরিতে পড়তে যেত সুহাস সেটা বড় রাস্তা থেকে একটু ভেতরে। একটা গলির মধ্যে। পড়া শেষ করে লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে গলি দিয়ে সে যখন আসছিল, তখন চারজন লোক তাকে ঘিরে ধরে!

—চারজন লোক?

—হ্যাঁ। চারজন। তাদের মধ্যে দুজনকে সে চিনত। টেলিফোন অফিসের কর্মচারী। যারা আমাদের বাড়িতে টেলিফোন সারাতে এসেছিল। বাকি দুজনকে সে চিনত না। সুহাস কিছু বুঝতে পারার আগেই ওরা তাকে মারতে শুরু করে। খুব খারাপ গালাগালি দিচ্ছিল আর মারছিল। মার খেতে খেতে সুহাস রাস্তায় পড়ে যায়। তার পরও ওকে ওরা মারছিল। যন্ত্রণায় চিৎকার করছিল সুহাস। সেই চিৎকারে লোকজন জড়ো হয়েছিল। গলির দুধারে একতলা, দোতলা, তিনতলা বাড়ি। সেইসব বাড়ির জানলায় এবং বারান্দায় লোক দাঁড়িয়ে দেখছিল সুহাসের মার খাওয়া। কিন্তু আশ্চর্য তাদের মধ্যে একজনও এগিয়ে আসেনি সেই গুণ্ডাদের হাত থেকে আমার ছেলেকে বাঁচাতে। অথচ প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছে ব্যাপারটা সত্যিই কি খুব কঠিন ছিল? মাত্র চারজন গুণ্ডা। আর গলির কতজন বাসিন্দা। সকলে দলবেঁধে একবার তেড়ে এলেই ওরা ভয়ে পালিয়ে যেত। কিন্তু সেরকম কিছু ঘটে নি। আমার ছেলে সকলের চোখের সামনে রাস্তায় পড়ে অসহায়ভাবে মার খাচ্ছিল। মারাত্মকভাবে জখমও হয়েছিল সে। তার পর—

—তার পর সুহাসকে রাস্তায় ফেলে রেখে ওরা পালিয়েছিল?—কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে তমাল বলে ফেলল।

—নাহ তা ওরা করেনি।—ইন্দ্রাণী আবার ম্লান হাসলেন।—ওভাবে অসহায় আর নিরীহ ছেলেটাকে মারার পরও ওরা ক্লান্ত হয়নি।—তমালের দিকে তাকিয়ে ইন্দ্রানী বললেন।

—তা হলে?

—তার পর ওরা যা করেছিল তা সত্যিই খুব লজ্জার।—ইন্দ্রানী আবার একটু থামলেন। বোধহয় আবার নিজেকে সামলে নিলেন। তমাল চুপচাপ ছিল। ইন্দ্রানী কী বলেন তা শোনার জন্যে অপেক্ষা করছিল।

—সুহাস রাস্তায় পড়ে কাতরাচ্ছিল। সকলের চোখের সামনে সেই চারজন গুণ্ডা সুহাসের ট্রাউজার আর শার্ট খুলে নিয়েছিল। শুধু আন্ডার উইয়ার পরে রাস্তায় পড়েছিল ছেলেটা। ওর ট্রাউজার আর শার্ট ওরা রাগে ফালাফালা করে ছিঁড়েছিল। সেগুলো আবার পরার উপায় ছিল না সুহাসের। ওভাবে প্রায় নাঙ্গা অবস্থাতে সুহাস পড়েছিল

রাস্তায়। জল—জল করে কাতরাচ্ছিল। কিন্তু তার জ্ঞান পুরোপুরি ছিল। গুণ্ডারা কী বলছিল সে শুনতে পেয়েছিল। গুণ্ডারা বলছিল শালা বেশি আদর্শ দেখিয়েছিল তাই ওর এই অবস্থা করলুম।

—প্রত্যক্ষদর্শীরা অতজনের মধ্যে কেউ এগিয়ে আসেনি?—জিজ্ঞেস করল তমাল।

—কেউ আসেনি। তবে গুণ্ডারা চলে যাওয়ার পর পথচারীরা এবং আশেপাশের লোকেরা এগিয়ে এসেছিল, জল দিয়েছিল সুহাসকে। কয়েকজন মিলে ধরাধরি করে সুহাসকে তুলে দাঁড় করিয়েছিল রাস্তায়। তার পর ট্যাক্সি করে আমার এখানে নিয়ে এসেছিল।

—টেলিফোন অফিসের ঐ দুজন কর্মচারী তো সাংঘাতিক! ওদের শাস্তি পাওয়া উচিত। আপনি ওদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করলেন না কেন? টেলিফোন অফিসে গেলেই তো ওদের চিনতে পারতেন আপনি?...

—তা হয়ত পারতুম ঠিকই। কিন্তু সুহাস যেদিন ওভাবে অপমানিত হল লোকগুলোর হাতে সেদিন রাতেই তো আমার ছেলে নিজের হাতে নিজের শরীরে কেরোসিন ঢেলে...

—সেদিন রাতেই সুহাস ওভাবে সুইসাইড করেছিল?

—সেদিন রাতেই। কী ঘটেছিল তোমাকে বলছি।...সুহাসকে বাড়ি দিয়ে যাবার পর সেই সহৃদয় লোকগুলো চলে গেল। আমি আর সুমি ধরাধরি করে ওকে দোতলার এই ঘরে আনলুম। এই বিছানাতেই শোয়ালুম। একটু বাদেই ধুম জ্বর এসেছিল ছেলের। হাসপাতাল থেকেই কিছু ওষুধপত্তর দেওয়া হয়েছিল ওকে। সে সব খেয়ে গায়ের যন্ত্রণা একটু কমেছিল। কিন্তু জ্বর এসেছিল ওর। আমার মনে আছে ১০১ ডিগ্রি জ্বর। ক্যালপোল সিরাপ খাওয়াতে জ্বরও নেমে গেল। কিছুক্ষণ ঘুমিয়েছিল সুহাস। তারপর ঘুমটা ভেঙে গেল। একটু গরম দুধ খেয়েছিল। তার পর কী হয়েছিল জিজ্ঞেস করাতে কেঁদে ফেলেছিল সুহাস। কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল সব। বার বার বলেছিল, মা! অত লোকের চোখের সামনে আমাকে ওরা অপমান করল এভাবে। আমার জামা-প্যান্ট খুলে নিল ওরা। কেউ ওদের কিছু বলল না। সকলে দেখল। আমি ওই রাস্তা দিয়ে আর কোনও দিনই লাইব্রেরি যেতে পারব না। আমি তাকে অনেক সান্ত্বনা দিলুম। সুহাস অঝোরে কাঁদছিল শুয়ে শুয়ে। ককিয়ে ককিয়ে কাঁদছিল। বলছিল মানুষ ঘুষ নেবে। তাও কিছু বলা যাবে না। বললে মার খেতে হবে। এ কী দিনকাল পড়ল মা? আমরা কীভাবে এই সমাজে বাঁচব? আমি তাকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করছিলুম। মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলুম। কপালে জলপটি দিয়েদিলুম অনেকক্ষণ। সুহাস শুয়ে শুয়ে কাঁদছিল। আর বারবার বলছিল—ওদের ঘুষ না দিয়ে আমরা কী ভুল করেছি মা? আমি বলেছিলুম—নাহ ভুল করনি। কিন্তু তবুও সুহাস কাঁদছিল। বলছিল আমার আর বাঁচার ইচ্ছে নেই মা! আমাকে ওরা ওভাবে মারল!...ইন্দ্রানী

থামলেন। ঘড়িতে বেলা একটা বেজে গেছে। ইন্দ্রানীর বোধহয় মনে পড়ল, তমালের দেরি হয়ে যাচ্ছে। তাই তিনি আবার বলতে লাগলেন—তখনও আমার মনে ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ হয়নি যে, সুহাস ওভাবে সুইসাইড করবে। খুব নরম মনের ছেলে ছিল ও। একবার তখন খুব ছোট। দশ-এগারো বছর বয়স। খুব বায়না ধরেছিল, খরগোশ পুষবে। আমি দুটো খরগোশ এনে দিয়েছিলুম। প্রায় দেড়বছর ছিল খরগোশদুটো। তারপর একটা মারা গিয়েছিল। সুহাসের সে কি কান্না। পুরো একদিন কিছু মুখে দিতে পারিনি ওর। তারপর অন্য খরগোশটাকেও ছেড়ে দিয়ে এল বাড়ির পেছনের ঝোপে। একা একা ঐ খরগোশটাকে নাকি বন্দি থাকতে খুব অসুবিধে হবে।

—কখন সুহাস ঐ কাণ্ডটা করল? আপনারা কিছু জানতে পারেননি?

—কিছুই জানতে পারিনি। সেদিন রাতে এই ঘরে সুহাস একা শুয়েছিল। আমি ছিলুম পাশের ঘরে। খুকুর পাশে। এই মেয়ের পাশেই আমাকে শুতে হয়। অত বড় মেয়ে হলে কী হয়। ও তো কিছু বলতে পারে না। মাঝে মাঝে রাতে ওর কাঁথা পালটে দিতে হয় আমাকে। আর সুমি একা শোয় একতলার ঘরে। মাঝরাতে কখন সুহাস জ্বর গায়ে উঠেছিল। কিচেন থেকে কেরোসিনের টিন নিয়েছিল। দেশলাই নিয়েছিল...

—আপনারা তো গ্যাসে রান্না করেন কাকিমা। তা হলে কেরোসিন...

—একটিন কেরোসিন, এক লিটারের মতন— আমার সবসময়েই কেনা থাকে বাড়িতে। কারণ গত কয়েক মাস ধরে আমাদের পাড়ার যে গ্যাসের ডিলার সে গ্যাস সিলিন্ডারের সাপ্লাই দিতে দেরি করছিল। গ্যাসের খরচ কিছু কমাতে মাঝে মাঝে ছোটখাটো রান্নাবান্নার জন্যে কেরোসিন-স্টোভও ব্যবহার করা হয়।

—সুহাস যখন ছাদে উঠে নিজের গায়ে আগুন দেয় তখন আপনারা কিছু জানতে পারেননি?

—প্রথমে কিছুই জানতে পারিনি। কখন সে বিছানা থেকে নেমে কিচেনে ঢুকেছিল কেরোসিনের টিন নিয়েছিল। তারপর একা একা ছাতে উঠে.....আমার ঘুম ভেঙে যায় সুহাসের চিৎকারে! নিজের গায়ে আগুন দিয়েছিল নিঃশব্দে। কিন্তু যন্ত্রণা চুপচাপ সহ্য করতে পারেনি। হয়তো মুখ বুজেই যন্ত্রণা সহ্য করতে চেয়েছিল। কিন্তু পারেনি। যখন পুরোপুরি পুড়ছিল আগুনে তখন চিৎকার করে উঠেছিল! জ্বলে গেলুম! পুড়ে গেলুম! বাঁচাও! ওহ সে কী বীভৎস চিৎকার! এখনও যেন আমি শুনতে পাই। আমি রাতে আজকাল ঘুমোতে পারি না বাবা। দু-চোখের পাতা এক করতে গেলেই কানে ভেসে আসে ছেলেটার আর্ত চিৎকার! শরীরের কোনও জায়গায় সামান্য ফোস্কা পড়লে আমরা কত কষ্ট পাই আর ওভাবে ছেলেটা আমার পুড়ে গেল! পুড়িয়ে দিল নিজেকে। খুব অভিমানী ছেলে ছিল!...

ইন্দ্রানী চুপ করলেন। তাঁর দুচোখে অশ্রু। নিজের কান্না তিনি এবার আর গোপন

করার কোনও চেষ্টাই করেননি।

সেদিন তমালের আর বেশিক্ষণ থাকা হয়নি। সে একসময় উঠে পড়েছিল। ইন্দ্রানীদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার আগে সে খুকুকে দেখেছিল একবার। বিচিত্র লেগেছিল তার। প্রকৃতির কী খেয়াল! মানুষের কী দুর্ভাগ্য! মেয়েটার শরীরটাই শুধু বেড়েছে। একজন পনেরো বছরের মেয়ের শরীরে যৌবনের যেসব চিহ্ন পরিস্ফুট থাকে সবই খুকুর শরীরেও আছে। কিন্তু শরীরটাই শুধু বেড়েছে তার। খুকু কথা বলতে পারে না। নিজের মনের ভাব ঠিকমতন প্রকাশ করতে পারে না। শুধু তার খিদে পেলে কিংবা প্রাকৃতিক প্রয়োজন হলে ইন্দ্রানী তা বুঝতে পারেন। অনেকদিন এ বাড়িতে থাকার ফলে সুমিও বুঝতে পারে। সারাদিন বিছানায় শুয়ে থাকে মেয়েটা। তার মুখ দিয়ে লালা ঝরে। যখন সে কিছু বলতে চায় তখন তার মুখ থেকে শব্দ ওঠে—অঁ অঁ অঁ অঁ...। কী কষ্ট। অসহ্য একটা জীবন! তমাল দেখেছিল। বেশ সুশ্রী একটা মেয়ে শুয়ে আছে বিছানায়। তার মাথার চুলগুলো খুব ছোট ছোট ছাঁটা। সে কারণেই কীরকম যেন বালকের মতন লাগছিল খুকুকে। তার বেশ উন্নত বুক-দুটোর দিকে না তাকালে বোঝা যেত না সে মেয়ে। তমাল চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখল খুকুকে। কখন যেন মৃদু দীর্ঘশ্বাস পড়ল তার। সে ভাবল ইন্দ্রানীর দুঃখময় জীবনের কথা। মহিলা স্বামীকে হারিয়েছেন। নিজের ছেলেকে হারালেন। আর মেয়ে প্রতিবন্ধী। কোমর থেকে তার শরীর নড়ে না। কথা বলতে পারে না। এত রকম বিপর্যয়ের পরও ইন্দ্রানীর স্নেহমিশ্রিত ব্যবহারে বিস্মিত না হয়ে পারেনি তমাল। বাড়ি থেকে বেরোবার সময় ইন্দ্রানী তাকে বললেন—বাবা তোমাকে বেশ লাগল আমার। আমি একা থাকি। তুমি আবার আমার কাছে আসবে তো? উত্তরে তমাল বলেছিল—হ্যাঁ মাসিমা নিশ্চয়ই আসব। আপনার বাড়ির টেলিফোন নাম্বার দিন। ইন্দ্রানী দিয়েছিলেন। তমালকে বলেছিলেন ইন্দ্রানী—ফোন করে জানিও কবে আসবে। সেদিন আমার এখানে দুটি খেয়ে যেতে হবে। মাকে বলে আসবে আমার এখানে খাবে। তমাল হেসে ঘাড় নেড়েছিল। তার পর রাস্তায় নেমেছিল।

যখন বাড়ি ঢুকল বেলা আড়াইটে বাজে। ভেবেছিল প্রচন্ড বকুনি খাবে মায়ের কাছে। কিন্তু বাড়িতে ঢুকে দেখল মা অন্য ব্যাপারে কিছুটা দিশাহারা। হঠাৎ তাঁর গুরুদেব চলে এসেছেন। এই গুরুদেব দেওঘরে থাকেন। বাঙালি। বাবা, মা আর তমাল দু-বছর আগে দেওঘর বেড়াতে গিয়েছিল। এই গুরুদেবের কাছে দীক্ষা নিয়েছিল মা। বাবার ওসব বিষয়ে মন নেই। ব্যাঙ্কের অফিসার তমালের বাবা নিজের চাকরি নিয়েই যেন সর্বদা ব্যস্ত। দীক্ষা নেবার পর থেকে বছরে একবার ভক্তবৃন্দের বাড়িতে হাজির হন গুরুদেব। গতবছর এসেছিলেন। এ বছর আজকেই হাজির। বাড়িতে ঢুকে তমাল দেখল, হুলুস্থুল কাণ্ড বেধে গেছে। দোতলার তিনটে ঘরের একটিতে গুরুদেবের

থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। কাজের লোককে মা উত্তেজিতভাবে নানা ফাই-ফরমাশ করছে। তমালকে দেখে নীচু গলায় মা বলল—কোথায় যে টো টো করে ঘুরে বেড়াও! যদি চান না হয়ে থাকে চান করে নাও। আমি তোমাকে খেতে দিয়ে আবার বাথরুমে যাব। সকাল থেকে কিচেনে আছি। মাছের ঝোল রেঁধেছি। সব আঁশ। চান করে আমাকে শুদ্ধ হতে হবে। এখনই গুরুদেবের ভোগ রাঁধতে হবে। একবেলা আমার এখানে থেকে, বিশ্রাম নিয়ে উনি বিকেল বেলা চলে যাবেন বৈদ্যবাটি। আর এক শিষ্যের বাড়ি।

কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে তমাল চানঘরে ঢুকল।...

পাখির ডাকে শৈবালের ঘুম ভেঙে গেল। সত্যিকারের পাখি নয়। ডোর-বেল। সুধার বন্ধ দরজায় ডোর-বেল-এ চাপ দিলেই কিঁচ...কিঁচ মিচ মিচ...অনেক পাখি ডেকে ওঠে অন্যসময় হলে ব্যাপারটাকে তত গুরুত্ব দেয় না শৈবাল। এখন দিল। কারণ বেমক্কা পাখির ডাকে তার ঘুমটা ভেঙে গেল। বিছানায় শুয়েই শৈবাল বুঝতে পারল সুধা দরজা খুলেছে। কেউ একজন এসেছে। তার সঙ্গে দু-একটা বাক্য বিনিময় করল সুধা। তারপর আবার দরজা বন্ধ করে দিল। কেউ তো এল না।

তবে এ-ঘরে সুধা যখন ঢুকল তখনই শৈবাল বুঝেছে ডোর-বেল বাজবার কারণ। সুধার এক হাতে খবরের কাগজ। আর একহাতে পলিথিন-প্যাকেটে দুধ। হাতের খবরের কাগজ সেন্টার-টেবিলে রাখল সুধা। বিছানায় শায়িত শৈবালের দিকে তাকিয়ে সুধা জিজ্ঞেস করল—কী? বাবুর ঘুম ভাঙল?

—আরও একটু ঘুমোতে চেয়েছিলুম। কিন্তু হঠাৎ ডোর বেল বাজল এমন যে ঘুমটা চটে গেল।

—আর ঘুমোতে হবে না। অনেক ঘুমিয়েছ। এখন উঠে বস। চা-এর জল চাপিয়েছি।

—আর একটু ঘুমের দরকার ছিল।—হাই তুলে বলল শৈবাল।—কাল অনেক রাত অব্দি ঘুম আসেনি। বিছানায় চুপচাপ শুয়ে ছিলুম।

—আমি তা মনে করি না।—সুধা বলল।—তোমার তো ভালোই নাক ডাকছিল।

এই উজ্জ্বল সকালে বিছানায় শুয়ে আধো ঘুম চোখে শৈবাল সুধার দিকে তাকিয়েছিল। হালকা-গোলাপি ম্যাক্সি এখন সুধার পরনে। এক নজর তাকিয়েই শৈবাল বেশ বুঝতে পারছে যে, শুধু ম্যাক্সিটাই পরে আছে সুধা। আর কোনও অন্তর্বাস নেই। ফলে সুধার সুগঠিত স্তনদ্বয়, বলিষ্ঠ জঙ্ঘা, নিতম্ব ইত্যাদির আউটলাইন বেশ বুঝতে পারছে শৈবাল। সুধার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সে নিজের ভেতরে

যৌন-উত্তেজনা বোধ করল।

—*কাছে এসো একবার।—শৈবাল ডাকল।*

—কেন? এখন আবার কী? —ভ্রু-ভঙ্গি করে সুধা তাকাল।

—এসো না একবার। প্লিজ....।

—সাত সকালে কিন্তু কোনও অসভ্যতা বরদাস্ত করব না আমি।—কপট রাগের সুরে সুধা বলল।—ওদিকে চায়ের জল ফুটছে।

—প্লিজ...ঠোঁটটা সরু করে শৈবাল বলল।

—হাতে দুধের প্যাকেট। সেটা কিচেনে রেখে আসতে দেবে তো?

—ও ভাবেই এসো!—বলে শৈবাল আর অপেক্ষা করল না। শায়িত অবস্থা থেকে উঠে ঈষৎ হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গিয়ে সুধার হাত ধরে টান দিল। হাতে দুধের প্যাকেট কোনওরকমে সেন্টার টেবিলে নামাতে পারল সুধা। শৈবালের হেঁচকা টানে সুধা হাঁটু ভেঙে বসে পড়তে বাধ্য হল বিছানায়। আর শৈবাল নিজের ঠোঁট ছোঁয়াল সুধার ঘাড়ে। সুধা ছটফট করছিল। যা শৈবালের উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে দেয়। সে সুধার একটি স্তন হাতের মুঠোয় ধরল। তারপর সুধার ছটফটানি ও আপত্তিকে গ্রাহ্য না করে জোর করে নিজের ঠোঁট গুঁজে দিল সুধার ঠোঁটে। আহ! কী অপূর্ব আস্বাদ! সুধার ঠোঁটে কী যে আছে। সেখানে একবার নিজের ঠোঁট ছোঁয়াতে পারলে শৈবালের সব তৃষ্ণা যেন দূর হয়ে যায়। সুধা বলল—কী হচ্ছে কী? ডাকাত তুমি একটা? দস্যু? আর পারি না তোমাকে নিয়ে!

—কেন তোমার বুঝি ভালো লাগছে না?—হাসে শৈবাল।

—এখন কী এসবের সময়? কাল রাতে তো ছিঁড়ে ফেলেছ আমাকে। তছনছ করেছ! আশ মিটল না? আবার এখুনি চাই?

—তোমার কাছাকাছি এলেই আমি পাগল হয়ে যাই। কী যে আছে তোমার শরীরে!—শৈবাল ফিসফিস করে বলল।

—অ্যাই এখন কিন্তু আর বাড়াবাড়ি নয়। প্লিজ। আমাকে চা খেয়ে বাথরুমে যেতে হবে। তা না হলে মাথা ধরে যাবে। আর একবার মাথা ধরলে চট করে ছাড়তে চায় না।

এবার জোর করে সুধা নিজেকে ছাড়িয়ে নিল শৈবালের কবল থেকে। হাতের তালু দিয়ে মুখটা মুছল একবার। হেসে বলল—দিনকে দিন তুমি একটা ক্ষুধার্ত বাঘ হয়ে উঠছ। আসলে আমি বুঝতে পারি। তোমার স্ত্রী যত রিলিজিয়াস মাইন্ডেড হয়ে উঠছে, তোমার ইনহিবিসন তত বাড়ছে। আর তার কোপটা এসে পড়ছে আমার ওপর

—তা যা বলেছ।—শৈবাল বিছানা থেকে নেমে সোফায় বসেছে। তার পরনে ডোরাকাটা পাজামা। আদুল গা। মেদহীন, পুরুষালি চেহারা শৈবালের। বুকে গিজগিজ

করছে ঘন, কালো রোমরাজি। পাউচের প্যাকেট টেনে নিয়ে হাতের চেটোয় কিছুটা তামাক তুলে নিয়েছে শৈবাল। সিগারেট পাকাবে। এটা তার নতুন অভ্যাস। সে চেন স্মোকার ছিল। সম্প্রতি তার বোধোদয় হয়েছে যে, অতিরিক্ত সিগারেট সত্যিই স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। তাই আজকাল সিগারেটের প্যাকেট না কিনে সে তামাকের পাউচ কেনে। এতে নাকি ধূমমানের মাত্রা কমানো যায়।

—ও কী? দাঁত মাজলে না। মুখ ধুলে না। ঘুম থেকে উঠেই প্রথমে আমাকে খেলে। তারপরই সিগারেট?

—বাসি মুখে বেড-টি নেব। তারপর সিগারেট। তুমি তো বললে চায়ের জল চাপিয়েছ?

—হ্যাঁ। দাঁড়াও। চা নিয়ে আসি। একটু আগেই যা দস্যিপনা শুরু করেছিলে। সব কী রকম গুলিয়ে গেল আমার। শৈবাল হাসল।—আমার কিন্তু লিকার।...ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার মুখে সুধা হাসল। বলল—তোমার বিয়ে করা বউ না হতে পারি কিন্তু তোমার সবকিছুই আমার জানা। শৈবাল দমবার পাত্র নয়। হেসে বলল—হয়ত বউ-এর থেকে তুমি আমাকে বেশি জানো—।

সিগারেট পাকানো শেষ। শৈবাল চা-এর জন্যে অপেক্ষা করছিল। আজ আর অফিস যাবার তাড়া নেই। সেই সন্ধের সময় বাড়িতে ফিরবে। গতকাল বাড়ি থেকে বেরোবার সময় সে অনিতাকে বলেছিল ব্যাঙ্কের কাজে তাকে আসানসোলে যেতে হবে। সেখানে তাদের ব্যাঙ্কের রিজিওন্যাল কনফারেন্স আছে। এটা ছিল নির্জলা মিথ্যে যদিও তার সরলমতি স্ত্রী অনিতা সেটাই বিশ্বাস করেছিল। গতকাল বাড়ি থেকে বেরিয়ে ব্যাঙ্কে গিয়েছিল শৈবাল। সেখানে বিকেল তিনটে অব্দি ছিল। তারপর সে বেরিয়ে পড়েছিল। সেখান থেকে গিয়েছিল সুধার অফিস। সুধাকে নিয়ে ঢুকেছিল একটা বার-কাম-রেঁস্তোরায়। তারপর চলে এসেছিল সুধার ফ্ল্যাটে। রাত কাটিয়েছিল সেখানে।

মিথ্যে যে সে এত নিখুঁতভাবে বলতে পারে তা শৈবাল নিজেই আগে বোঝেনি। অনিতাকে মিথ্যে বলে, তার নিপাট সারল্যের সুযোগ নিয়ে তাকে ভুল বুঝিয়ে এই কলকাতা শহরেই সুধার ফ্ল্যাটে রাত কাটাচ্ছে শৈবাল। এই মিথ্যাচারের আজ হল দ্বিতীয় দিন। মাসখানেক আগে শৈবাল অনিতাকে জানিয়েছিল উত্তরবঙ্গের মালদায় একটা সেমিনার আছে। এক রাত সে বাড়িতে থাকবে না। অনিতা বিন্দুমাত্র অবিশ্বাস করেনি। কারণ শৈবাল ব্যাঙ্কের একজন রিজিওন্যাল অফিসার। তার নানা জায়গায় সেমিনার কিংবা কনফারেন্স থাকতেই পারে। অনিতা নিজের পুজো-আর্চা নিয়ে থাকে। স্বামীকে সন্দেহ করবার কোনও ফুরসত তার নেই। আর তার দিক থেকে স্বামীকে সন্দেহ করার কোনও কারণও ঘটেনি। সেবার মালদাতে আদৌ যায়নি শৈবাল। সুধার বাড়িতে রাত কাটিয়েছিল। সেবারই প্রথম। এবারও তাই। আসানসোলের অজুহাত দিয়ে শৈবাল রাত কাটিয়েছে সুধার বাড়ি। আজ যখন অনিতা ধরে নেবে যে

আসানসোলে গুরুত্বপূর্ণ মিটিং-এ ব্যস্ত; তখন আসলে শৈবাল ছুটির আমেজ উপভোগ করবে সুধার সঙ্গে, সুধার ফ্ল্যাটে।

একটা ট্রেতে চায়ের কাপ-প্লেট নিয়ে সুধা ঢোকে। আর একটা প্লেটে বিস্কুটও আছে। শৈবাল চুমুক দেয়। নিজের হাতে তৈরি সিগারেট শৈবাল লাইটার জ্বালিয়ে ধরায়। লাইটারে টুং ট্যাং শব্দ। সুধা শৈবালের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল—কী যেন বলতে চাইছিলে তুমি? আমি চা আনতে বেরিয়ে গেলাম।

—গতকাল বিকেলের দিকে নিজের মোবাইল থেকে একবার অনিতাকে ফোন করেছিলুম। ও কী বলল জানো?

—কী?

—দুপুরবেলা ওর গুরুদেব এসে হাজির হয়েছে। ও ভোগ রাঁধতে ব্যস্ত।.....হরিবল!

—কেন? হরিবল কেন? সকলেই কি তোমার মতন নাস্তিক আর পাপী মশাই?

—আমার এখন ফর্টি-ফাইভ চলছে। অনিতার বোধহয় ফর্টি-টু। এত কম বয়সেই পিসিমাদের মতো ঠাকুর-দেবতা, গুরুদেব.........কী যে আরম্ভ করেছে না?

—তুমি যা দস্যু! সবসময় খাই-খাই। তোমাকে সামলাতে পারেন না উনি। তাই বীতশ্রদ্ধ হয়ে ঠাকুর-দেবতার দিকে ঝুঁকেছেন।

—সত্যি। অনিতার মতন শুচিবাইগ্রস্ত মহিলার সঙ্গে জীবন কাটানো যেন একটা বিভীষিকা হয়ে উঠেছিল আমার কাছে। তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর, আলাপ হওয়ার পর আমি যেন আবার নতুন জীবন পেলুম।

—এই পুরুষদের ঢং শুরু হল!—হেসে বলল সুধা।—কোনও মেয়েকে পেলেই তোমরা এই যে মিথ্যে রোমান্টিকতা শুরু করো না? এসবে মেয়েরা কিন্তু ভোলে না।

—বিশ্বাস করো সুধা!—ইউ আর আ নিউ লিশ অব লাইফ টু মি......।—গাঢ় স্বরে শৈবাল বলল।

—আচ্ছা বাবা হয়েছে।—সুধা হাসল।—চা পান করে আর সিগারেট ফুঁকে এবার একটু ধাতস্থ হয়েছো তো? এখন তোমাকে আমি কবিতা শোনাব। শুনবে তো?

— এই সাত সকালে কবিতা?........বিশ্বাস করো কবিতা-টবিতা আমি একেবারে বুঝি-না।

—তবুও তোমাকে শুনতে হবে। আমার আব্দার।

—তা হলে তো শুনতেই হবে। কার কবিতা? তোমার প্রিয় কবি তো দুজন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। আর জয় গোস্বামী।

—ঐ দুজন আমার প্রিয় কবি ঠিকই। তবে অন্য একজন কবিকে আমি ডিসকভার করেছি।

—ডিসকভার করেছ? একেবারে কলম্বাসের ভূমিকা?

—হ্যাঁ মশাই তাই। মিডিয়ার দৌলতে জয় গোস্বামীর নামই শুধু পাবলিসিটি পায়। কিন্তু ওরই কনটেমপোরারি আরও অনেক কবি আছে যারা কিন্তু জয়ের থেকে খারাপ লেখে না। সে রকমই একজন কবিকে আমি ডিসকভার করেছি। জয়ের মতন তাকেও বলা যায় সত্তর দশকের কবি। শুনবে তার কবিতা?

—এখনও মুখ ধুইনি। ফ্রেশ হইনি। বাসি মুখে কবিতা? এ তো শাস্তি?

—গত রাতে বিছানায় তুমি যা অসভ্যতা করেছ, তার জন্যে এ শাস্তি তোমার প্রাপ্য। দাঁড়াও বইটা নিয়ে আসি।

সুধা একটা কৃশ বই নিয়ে ঘরে ঢোকে। শৈবাল জিজ্ঞেস করে কবির নাম। সুধা বলে, তুমি তো কবিতার পাঠক নও। তাই কবির নাম শুনে আর কী হবে? আমি কবিতাটা পড়ছি। তুমি শোনো। সুধা পড়তে থাকে—কবিতার নাম প্রেম...প্রেম

কানে যে অবিরত বিপ বিপ শব্দ পাচ্ছেন
এটাই ডায়াল টোন।

সতর্ক আঙুলে সঠিক নম্বর ডায়াল করুন।

অপরপক্ষ 'হ্যালো' বললে তবেই
অন্ধকার ফুটোর ভেতর ধাতব টাকা ফেলুন।

কথা বলা তিন মিনিটের মধ্যে শেষ করুন।

কথা শেষ হলে রিসিভারটি যথাস্থানে রাখুন।

পড়া শেষ করে সুধা থামল। হেসে জিজ্ঞেস করল—কেমন লাগল?

—সত্যিই বেশ অন্য ধরনের। সহজ ভাষায় আধুনিক জীবনের বর্ণনা। আমি ভাবছিলাম ঐ লাইনটা।—শৈবাল গম্ভীরভাবে বলল। তার মুখ দেখলেই বোঝা যায় এটা তার কপট গাম্ভীর্য।

—কোন্ লাইনটা গো?

—ঐ যে পড়লে কী যেন?.....অন্ধকার ফুটোর ভেতর ধাতব টাকা ফেলুন।....তোমার প্রিয় কবি তো বেশ বাচাল হে?

—কেন?

—অন্ধকার ফুটো....শৈবাল হাসল।

সুধা বুঝেছে। তার ফর্সা মুখ লজ্জায় রক্তিম হয়ে উঠল। সে অস্ফুটে বলল—যাহ? তুমি না....ভীষণ অসভ্য! কী কথা থেকে কী কথায় চলে এলে....।

—আর ঐ ছবিটাও বেশ জম্পেশ।

—কোন ছবিটা আবার?

—কথা শেষ হলে রিসিভারটি যথাস্থানে ঝুলিয়ে রাখুন। তোমার কবি কিন্তু সত্যিই বেশ রসিক সুধা। সব শেষ হয়ে গেলে ঠিক ঝোলানো রিসিভারের মতোই কিন্তু লাগে....।

ইঙ্গিতটা ধরতে অসুবিধে হল না সুধার। সে এবার বলল—তোমার মতন অসভ্য লোকের সঙ্গে সত্যিই কথা বলা যায় না। সবসময় শুধু এক দিকে ইঙ্গিত। এত সেক্স তোমার?

—সেক্স মানুষকে বুড়ো হতে দেয় না এটা কি জানো? আমরা বাঙালিরা পঞ্চাশেই কীরকম চুপসে যাই। আর সাহেবদের দেখো। সত্তর বছর বয়সে আবার পঁচিশ বছরের কোনও ছুঁড়িকে বিয়ে করে বসছে। ওরা এসব পারে। আমরা পারি না।—সুধা হাই তুলে বলল—আমি এবার টয়লেটে ঢুকব। তুমিও দাঁত মেজে নাও। ব্রেকফাস্ট করবে তো?

—হ্যাঁ। ব্রেকফাস্ট করব। তার পর তোমার হাতের রান্না দিয়ে লানচ্ সারব। আমি বিদেয় হব সেই বিকেলবেলা। আমি তো এখন আসানসোলে আছি। সেখানকার কনফারেন্স সেরে সেই সন্ধের সময় বাড়ি ফিরব।

—সে তো বুঝতেই পারছি। তুমিও চলে যাবে আর আমিও দার্জিলিঙ মেলে উঠব।

—ওহ। তুমি তো ছেলেকে দেখতে যাবে।

—হ্যাঁ। আমিও অফিসে তিনদিনের ছুটি নিয়েছি। বুবাইয়ের স্কুলে ফোনে কথা বলেছি। প্রিন্সিপ্যাল জানালেন, বুবাই ভালো আছে। মন দিয়ে পড়াশোনা করছে।

—তোমার বুবাইয়ের কোন্ ক্লাস বেশ?

—এই তো সেদিন বললুম। ভুলে গেলে? ক্লাস সিক্স।

—হ্যাঁ। হ্যাঁ। ক্লাস সিক্স। দার্জিলিং-এ থাকবে কোথায়?

—আমার চেনা লজ আছে। এলিগ্যান্ট লজ। বুবাইকে দেখতে গেলে আমি ওখানেই উঠি। স্কুল থেকে কাছেই।

—গত মাসেও তো ছেলেকে দেখতে দার্জিলিং গিয়েছিলে?

—হ্যাঁ। প্রতি মাসেই একবার করে যাই। আমার জীবনে আর কী আছে বল? সব গেছে। শুধু বুবাইকে মানুষ করা আমার একটা কাজ। বুবাই নিজের পায়ে দাঁড়ালে আমিও এ দেশ ছাড়ব।

—এ দেশ ছাড়বে? মানে?

—এ দেশ ছাড়বো মানে এ দেশ ছাড়ব। মানে খুবই সিম্পল।

—কোথায় যাবে?

—নিউ ইয়র্কে। আমার এক বন্ধু আছে। ঋতু। সেও আমার মতন উইডো। ওর মেয়ের যখন দশ বছর বয়স তখন ওর হাজব্যান্ড মারা যায়। ব্রেন ক্যানসার। ঋতু অবশ্য আমার মতন অর্ডিনারি স্টুডেন্ট ছিল না। ও ছিল ডাক্তার। এম. ডি.। মেডিসিনের ডাক্তার। প্র্যাকটিস করত। খুব ভালো পসার ছিল ওর। ওর হাজব্যান্ড ছিল কলেজের প্রফেসর। হাজব্যান্ড মারা যাওয়ার পর নিউজপেপারে বিজ্ঞাপন দেখে অ্যাপ্লাই করে দেয় ঋতু। নিউ ইয়র্কের একটা প্রাইভেট হাসপাতাল থেকে কল পেয়েছিল। ওরাই প্যাসেজ মানি দিয়েছিল। ঐ হাসপাতালে বাঙালি ডাক্তার নাকি আরও আছে। কল পেয়ে ঋতু অগ্রপশ্চাৎ কিছু ভাবেনি। মেয়েকে নিয়ে সোজা পাড়ি দিয়েছিল নিউ ইয়র্কে। প্রায় পাঁচ বছর হয়ে গেল। মেয়েকে নিয়ে খুব ভাল আছে ও বিদেশে। নিজে বাড়ি করেছে। গাড়ি কিনেছে। মেয়ে কমপিউটর নিয়ে পড়াশোনা করছে। স্কুল থেকে ঋতু আমার খুব বন্ধু।' সেই বন্ধুত্ব এখনও আছে আমাদের। ও চিঠি লিখি। আমি চিঠি লিখি। ওর সঙ্গে আমার কথা হয়েই আছে। আমার ছেলেটা মানুষ হলেই, নিজের পায়ে দাঁড়ালেই আমি ঋতুর কাছে চলে যাব। ও আমার জন্যে একটা চাকরি জোগাড় করে রাখবে। আমার যা পেশা—ইনটিরিয়র ডেকরেশন;—ঐ পেশায় কাজের অভাব নেই ওদেশে। ঋতু রিসেন্টলি একটা চিঠিতে লিখেছে, ওদেশে সবাই স্বাধীনচেতা। ওর মেয়ে বড় হয়ে নিশ্চয়ই নিজের মতো করে বাঁচতে চাইবে। ঋতুরও বয়স বেড়ে যাবে তখন। সে আমাকে ডেকে নিয়ে যাবে নিউইয়র্কে। আমার দুই পুরনো বান্ধবী নিজেদের মতন কাটাব ওখানে।'

—কেন তোমার বন্ধু নিউইয়র্কে কোনও পুরুষের সঙ্গে নতুন করে সংসার পাতে নি? ওদেশে সঙ্গী খুঁজতে হয় না। রাস্তাঘাটে মেয়েদের দেখলেই, বিশেষত ইন্ডিয়ান মেয়েদের দেখলেই নাকি সাহেবরা গায়ে পড়ে প্রেম নিবেদন করে।

—কথাটা তুমি ঠিকই বলেছ শৈবাল। কিন্তু আমার মতো ঋতুও আর কারো সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক শুরু করতে রাজি নয়। তার একাধিক বয়-ফ্রেন্ড আছে। সে ইচ্ছেমতো তাদের কারো কারো সঙ্গে লিভ-টুগেদার করে। সংসার আর চায় না ঋতু। যেমন আমিও চাই না। আমি যদি আবার সংসার চাইতুম তাহলে কী তা পেতুম না? কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে লীভ-টুগেদার করি। এটাই আমার ভালো লাগে। সংসারের বেড়াজাল আমার পছন্দ নয় তাই।—একটানা কথা বলে সুধা থামে। চানঘরে ঢোকে। শৈবাল আবার পাউচ থেকে থেকে তামাক বের করে হাতের চেটোতে রাখে। সিগারেট বানায়। ধরায়। ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ায়। চারপাশে তাকিয়ে দেখে। নীচে আবাসনের গেটের কাছে একটা স্কুলবাস এসে দাঁড়াল। বেশ সুন্দর দেখতে বাসটা। নীল আর সাদা রং মেশানো। ঝকঝকে বাস। আবাসনের গেট থেকে কয়েকজন ছেলে-মেয়ে উঠল। তারা বাসে উঠে জানলা দিয়ে হাত নাড়ছে। তাদের মায়েরা, যারা আবাসনের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে, তারা হাত নাড়ছে। শৈবালের সিগারেটের

ধোঁয়া উঠে যাচ্ছে শূন্যে, পালিশ করা নীল আকাশের দিকে। মাঝে মাঝে ঘুম থেকে উঠে বাইরে তাকালে মনে হয় দিনটা কী সুন্দর। আজ সেরকম একটা দিন। সুধা এখনও টয়লেট থেকে বেরোয়নি। বোধহয় একেবারে স্নান সেরে বের হবে। সুধার হলে শৈবাল টয়লেটে ঢুকবে। সকালের চায়ের পর দুটো সিগারেট শেষ করলেই সে মোশন অনুভব করে। স্কুলবাসটা ক্রমশ চোখের বাইরে চলে যাচ্ছে। ডানদিকে বেঁকে বড়রাস্তায় পড়ল। চোখের আড়াল হয়ে গেল। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে শৈবালের মনে স্মৃতি ভেসে এল। শৈশবের স্মৃতি। স্মৃতির যাতায়াত, অভিজ্ঞতা সে দেখেছে, এমনই। কোনও একটা দৃশ্য বা সংলাপের অনুষঙ্গ থেকে স্মৃতিরা হঠাৎ ভুস্ করে ভেসে ওঠে। যেমন এখন শৈবালের মনে পড়ল, সে কোনও দিন স্কুলবাসে ইস্কুল যায় নি। মেদিনীপুরের এক প্রত্যন্ত গ্রামে তাদের আদি বাড়ি ছিল। জায়গাটার নাম পটাশপুর। ইস্কুল যেতে হলে শৈবালকে প্রায় তিন-চার মাইল সাইকেল ঠ্যাঙাতে হত। সেই ছোটবেলা থেকে, যখন ক্লাশ ফাইভ, তখন থেকেই সে সাইকেলে নানান জায়গায় যেতে অভ্যস্ত। গ্রামের দিকে তো তাই হয়। প্রত্যেক বাড়িতেই প্রায় সাইকেল থাকবেই। একটু অবস্থাপন্ন যারা তাদের বাড়িতে স্কুটার। শৈবালদের অবস্থা যে খুব একটা ভাল তা বলা যাবে না। তার বাবা ছিলেন অল্প মাইনের মাস্টার। প্রাইমারি স্কুলের। জমিজমা কিছু ছিল। তাতে সারা বছরের ধানটা হয়ে যেত। শৈবালরা তিন ভাই। দু-বোন। বাবা সামান্য মাস্টারি করেই মেয়েদের মোটামুটি ভালো বিয়ে দিয়েছিলেন। তিন-ভাই-এর মধ্যে শৈবাল বড়। সে পড়াশোনায় বরাবরই ভালো। গ্রামের উচ্চ-মাধ্যমিক ইস্কুল থেকে পাস করার পর সে কলকাতার কলেজে ভর্তি হয়। মেসে থাকত। সেই মেসে মেদিনীপুর থেকে পড়তে আসা অনেক ছেলেই থাকত। পড়াশোনার খরচ বাবা দিতেন। আর হাতখরচের টাকা শৈবাল জোগাড় করত টিউশনি করে। এ ভাবে বেশ কষ্ট করে বড় হতে হয়েছে তাকে। বাণিজ্যে স্নাতক। তারপর এম. কম. পাস। প্রথমে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে সরকারি অফিসে কেরানির চাকরি জুটিয়েছিল শৈবাল। তারপর পরীক্ষা দিয়ে ব্যাঙ্কে চাকরি পায়। অফিসারের চাকরি। সেই চাকরিতেই আজ এত পদোন্নতি। রিজিওন্যাল ম্যানেজার। অনেক ক্ষমতা শৈবালের। সেই ক্ষমতা সে কিছুটা প্রয়োগ করেছে সুধাকে পেতে। সুধাকে পেতে বলা ভুল। সুধার শরীরকে পেতে। হ্যাঁ, ঠিকই তো। শারীরিক সম্পর্ক ছাড়া শৈবাল আর সুধার মধ্যে কী আছে? সুধা ভালোবাসতে জানে না। অন্তত শৈবালকে সে ভালোবাসে না। এটা শৈবাল বেশ বোঝে। দু-একবার সুধা তাকে বলেওছে তা।....ভালোবাসায় আমি বিশ্বাস করি না শৈবাল। ওসব প্যানপ্যানানি ভালোবাসার কথা আমাকে তুমি বলবে না। আমি কবিতা পড়তে ভালোবাসি। খেতে ভালোবাসি। এখানে ওখানে বেড়াতে ভালোবাসি। কিন্তু পুরুষকে ভালোবাসতে পারিনি কোনওদিন।

সিগারেট শেষ। শৈবাল তবুও দাঁড়িয়ে রইল ব্যালকনিতে। দেখতে দেখতে বেলা

হয়ে যাচ্ছে। রোদের তীব্রতা বাড়ছে। রাস্তা ভরে উঠছে মানুষজনে। পরপর রিকশা যাচ্ছে। মারুতি, অ্যামবাসাডার। এই গলিতে ট্রাক কিংবা বাস ঢোকে না।

নিজের অতীতের কথা ভাবতে ভাবতে শৈবালের মনে এল সেই দুর্ঘটনার কথা। সে নিজে পড়েছিল একটা দুর্ঘটনাতে। বেশ বড়সড় দুর্ঘটনা। ভাগ্য সহায় না হলে সে বোধহয় মরেই যেত সেদিন। নেড়িকুত্তার একটা বাচ্চাকে সে বাঁচাতে গিয়েছিল সেদিন। কোনও কারণ ছিল না হঠাৎ ওরকম দরদী হয়ে ওঠার। নিজের জীবনকে বিপন্ন করে সামান্য একটা কুকুর বাচ্চা বাঁচানোর মধ্যে এমন কী বাহাদুরি ছিল? ওটা না হয় চলন্ত সেই ট্রাকের তলায় চাপাই পড়ত। রাস্তার একটা কুকুর কমত। কিন্তু নিজের কথা না চিন্তা করে কেন যে শৈবাল হঠাৎ সেই হঠকারিতার কাজটা করেছিল?

তখন শৈবালের ক্লাস টেন। সাইকেলে সে যাচ্ছিল ইস্কুল। গ্রামের রাস্তা থেকে পডতে হত হাইওয়েতে। বেশ কিছুটা হাইওয়ে ধরে যাবার পর ইস্কুল। একা যেত না সে। সঙ্গে গ্রামেরই অন্য ছেলেরা থাকত। তারাও পড়ত ঐ ইস্কুলে। একদিন ইস্কুল যাবার সময়েই ঘটেছিল ব্যাপারটা। উলটোদিক থেকে বেগে ছুটে আসছিল একটা ট্রাক। অনেক মালপত্র নিয়ে গতর-ভারী সেই ট্রাক বেশ গতিতে আসছিল। শৈবালের সঙ্গীরা, যারা প্রত্যেকে ছিল সাইকেল-আরোহী, নিজেদের সাইকেল নামিয়ে নিয়েছিল হাইওয়ের ধারে—ঘাস আর আগাছায় ভরে থাকা সরু মাটির রাস্তায়। কিন্তু শৈবালের হঠাৎ নজরে পড়েছিল নেড়ি কুত্তার একটা বাচ্চা রাস্তার ঠিক মধ্যিখানে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাফেরা করছে! সেই সময় শৈবালের মনে হয়েছিল বাচ্চাটাকে বাঁচানো দরকার। ওকে না সরালে নির্ঘাৎ দৈত্যের মতো ঐ ট্রাকের নীচে যাবে প্রাণীটা। যেমন ভেবেছিল তেমনই কাজ করেছিল শৈবাল। নিজের প্রাণের কথা ভাবেনি। সেই মুহূর্তে তার একটাই কথা মনে হয়েছিল। কুকুর ছানাটাকে বাঁচাতে হবে। ট্রাকটা এগিয়ে আসছিল। সাইকেল থামিয়েছিল শৈবাল। ঠেলে দিয়েছিল সাইকেল রাস্তার ধারে। তারপর ছুটে গিয়েছিল রাস্তার মধ্যিখানে! প্রাণীটাকে এক হাতে ছোঁ মেরে তুলে নিয়েছিল রাস্তা থেকে। ট্রাকটা প্রায় গায়ের ওপর এসে পড়েছিল। সঙ্গীরা চিৎকার করে উঠেছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে প্রাণপণে ব্রেক কষেছিল চালক। ঘ্যাঁ-শ্-শ্-শ্ শব্দ তুলে থেমে গিয়েছিল ট্রাক। একেবারে শৈবালের গায়ের কাছে। কুকুরছানাকে দু-হাতে ধরে শৈবাল বোকার মতন দাঁড়িয়েছিল রাস্তার মধ্যিখানে কয়েক মুহূর্ত। তার পর সরে এসেছিল। বিশ্রি একটা খিস্তি করে চালক আবার স্টার্ট দিয়েছিল। ছুটে এসেছিল সঙ্গীরা। শৈবাল কাঁপছিল। সঙ্গীরা নানা মন্তব্য করছিল। কিন্তু কিছুই ঢুকছিল না শৈবালের কানে। কীরকম কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল সে।

এ রকম নয় যে, সেই কুকুরছানাটাকে সে পরে পুষেছিল। সে রকম কোনও ব্যাপারই নয়। তুচ্ছ সেই প্রাণীটাকে সে ছেড়ে দিয়েছিল তখনই। রাস্তায়। প্রাণ ফিরে পেয়ে লেজ নাড়তে নাড়তে সে চলে গিয়েছিল নিজের গন্তব্যে। ট্রাকচালক ঠিক সময়ে

ব্রেক না কষলে শৈবালকে মরতে হত। পরে অনেক ভেবেও শৈবাল বুঝতে পারেনি মুহূর্তের বিমূঢ়তায় কেন সে নিজের প্রাণসংশয় করেছিল ওভাবে। খুব সাধারণ মানুষ সে; বিবেকানন্দ কিংবা বিদ্যাসাগর হবার কোনও লক্ষণই তার মধ্যে ছিল না। তা হলে? কোনও কোনও মুহূর্তে খুব সাধারণ মানুষও কী ভীষণ মানবিক হয়ে উঠতে পারে! সুধার সঙ্গে যে আজকের এই সম্পর্ক, তার সূচনাতেও তো সেই মানবিকতাবোধ। প্রথমে মধ্যবয়স্কা এই মহিলাকে দেখে তার মানবিকতাবোধই উথলে উঠেছিল। তাই নয় কি? রিন. ...বিন......রিন.....রিন ফোন বাজছে। মোবাইল ফোন। শৈবাল ছুটে গেল। স্ক্রিন দেখল। তারই বাড়ির নম্বর ফুটে উঠেছে। ল্যান্ড ফোন থেকে অনিতা তাকে কল্ করছে। বোতাম টিপল শৈবাল। বলল—হ্যালো?

—কী গো? সব খবর ভালো তো?—অনিতারই গলা।

—হ্যাঁ ভালো।

—গতকাল আসানসোলে ঠিকমতন পৌঁছেছিলে? কোনও অসুবিধে হয়নি তো?

—নাহ। অসুবিধে হয়নি।..... তোমাদেব খবব কী? তমাল কী করছে?

—খোকা তো এখনও বিছানায়। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকে ও। পডাশোনা করে। জানো তো।.....কথা বলবে? ডেকে দেব?

—নাহ থাক। শৈবাল ভাবতে থাকে। আর কী বলা যায়...

—তুমি তা হলে আজ সন্ধের সময় ফিরছ তো?

—হ্যাঁ। অফিস থেকে যেমন ফিরি। ....মানে, আসানসোলে আমাদেব মিটিং শেষ হলেই দুপুরের দিকে ট্রেনে উঠব। তার পর হাওড়া পৌঁছতে যতক্ষণ লাগে....। —জলজ্যান্ত মিথ্যে বলতে শৈবালের আজকাল গলা এতটুকু কাঁপে না। সরলমতি অনিতাকে ধোঁকা দেওয়া কী আর এমন কঠিন কাজ!.....

—তোমার গুরুদেব কাল এসেছিলেন?—শৈবাল এতক্ষণ বাদে একটা জুতসই প্রশ্ন খুঁজে পায়।

—হ্যাঁ। গুরুদেব এসেছিলেন। একবেলা ছিলেন। অন্ন গ্রহণ করলেন আমার হাতে। তারপর বিরাটি চলে গেলেন। আর এক শিষ্যের বাড়ি।......এই জানো তো?

—কী?

—সামনের ডিসেম্বরে গুরুদেব আবার আসবেন বলেছেন আমার বাড়িতে। কয়েকদিন থাকবেন।

—খুব ভালো কথা।—শৈবাল বলে। সুধা চানঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছে। তোয়ালে দিয়ে মুছছে মাথার বালকসুলভ কেশরাশি। এঘরে ঢুকল। তাকিয়ে আছে শৈবালের দিকে। চোখে প্রশ্ন—কার ফোন? শৈবাল সুধার সামনে নিজের স্ত্রীব সঙ্গে রগরগে মিথ্যে কথাগুলো বলে যেতে কীরকম অস্বস্তি বোধ করে। সে মৃদুভাবে অনিতাকে বলে—ঠিক আছে তা হলে! সন্ধেয় ফিরছি!

—হ্যাঁ। সাবধানে থেকো।—অনিতা বলে। শৈবাল মোবাইল বন্ধ করে দেয়। সুধা তাকিয়ে আছে। তার ঠোঁটের রেখায় কি বিদ্রূপের হাসি?

—কার কল গো? —সুধা জিজ্ঞেস করে।

—অনিতার।

—কীরকম সতী-সাধ্বী বউ দেখেছ? সাতসকালে স্বামীর খোঁজ নিচ্ছে!.....আচ্ছা উনি তো জানেন তুমি আসানসোলে। তাই না?

—হ্যাঁ। তাই।

—আচ্ছা শৈবাল বউকে ঠকাতে তুমি বিবেকের দংশন বোধ করো না?

—বিবেকের দংশন? ......শৈবাল হাসে।—কীরকম নাটক-নাটক লাগছে না? নাটকও নয় ঠিক। যাত্রা। বিবেক-টিবেক তো যাত্রাতেই বেশি চলে।—শৈবাল ছোট্ট মোবাইল ফোন বিছানায় ছুড়ে দেয়। তলপেটে চাপ অনুভব করছে সে। এবার টয়লেটে যাওয়া উচিত। তার আগে আর একটা সিগারেট। সিগারেট ঠোঁটে কমোডে না বসলে তার ঠিক পায়খানা হয় না। ডান হাতের চেটোয় পাউচ থেকে এক খাব্‌লা তামাক নিয়ে সে সিগারেট বানাতে থাকে। সুধার দিকে তাকায়। সে এখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে রূপটান দিচ্ছে। স্নান সেরে সালোয়ার কামিজ পরেছে সুধা। শরীরের দিকে রীতিমতো যত্ন নেয় সুধা। সেটা তার ফিগারের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। এক মুহূর্ত শৈবালের মনে হয়। অনিতা আর সুধার একই বয়স। কিন্তু সুধার পাশে অনিতাকে দেখলে কেউ বলবে সেটা? ইতিমধ্যেই অনিতাকে কীরকম গিন্নি-গিন্নি লাগে। একেবারেই শরীর-সচেতন নয় অনিতা। এমনকী শৈবালের শারীরিক চাহিদা বিষয়েও সে সচেতন নয়। নিজের স্ত্রীর সঙ্গে শরীরের সম্পর্ক নিয়ে শৈবাল অত্যন্ত হতাশ। ভাগ্যিস সুধার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তা না হলে তার গোপন এবং অব্যক্ত যৌবনবেদনা নিয়ে তাকে নিঃশব্দে দগ্ধে মরতে হত।

—বিবেককে তুমি একেবারেই পাত্তা দাও না—তাই তো? সুধা ছুড়ে দিল প্রশ্নটা। ফিনফিনে, পাতলা ঠোঁটে গোলাপি লিপস্টিক বুলিয়ে নিচ্ছে সুধা। শৈবালের চোখের সামনে ঘুরবে-ফিরবে। একটু মোহময়ী করে নেবে না নিজেকে? মেয়েদের এই ছলনাটাই আসল। পুরুষদের তো এটাই ভালো লাগে।

—মনে পড়ে ছোটবেলায় আমাদের গ্রামে যাত্রার আসর বসত। শৈবাল সুধার দিকে তাকিয়ে বলল।—কতরকম যাত্রা যে দেখেছি তখন। নামগুলো এখনও মনে আছে।..... সোনাই দীঘি, রক্তে রাঙা সিঁদুর, এর নাম প্রেম, মা মাটি মানুষ..... এরকম নাম সব যাত্রার। তো সেই যাত্রাগুলোর প্রত্যেকটাতেই কার রোল কমন ছিল বল তো?

—আমি জানি না। আমি কোনওদিন যাত্রা দেখিনি মশাই।

—বিবেকের রোল। একজন বিবেক সেজে পার্ট করত। অ্যাবস্ট্রাক্ট ব্যাপারকে

রিয়ালিটিতে ধরা হত এভাবে। বিবেকের চেহারাটা কেমন ছিল বলো তো?

—বলে যাও। খুব ইনটারেস্টিং লাগছে।

--আলখাল্লা পরনে একটা বুড়ো লোক। লম্বা সাদা দাড়ি। একমাথা সাদা চুল। হাতে একতারা। কয়েকটা সিন বাদে বাদেই স্টেজে চলে আসত বিবেক। আর গান গাইত। কষ্টের গান। দুঃখের গান। আজকাল বিবেকের কথা ভাবলেই আমি চোখের সামনে একতারা হাতে গান গাইতে থাকা সেই মানুষটাকে দেখতে পাই।

—আই গ্রো ওলড.....আই গ্রো ওলড......আই শ্যাল উইয়ার দ্য বটম অব মাই ট্রাউজারস রোলড........সুধা আবৃত্তি করে। .... কোন কবি লিখেছে জানো?

—জানি না। আমি কবিতা পড়ি না। পোয়েট্রি ইজ নট মাই কাপ অব টি.....। শৈবাল লাইটার জ্বালে। টুং-টাং। সিগারেট ধরিয়ে নেয়।

—কবিতা পড়লে মানুষের সূক্ষ্ম অনুভূতিতে শান্ দেওয়া হয়।

--আমার কোনও সূক্ষ্ম অনুভূতি নেই। আমি একজন বোদা মানুষ। কাজ, খিদে, ঘুম আর শরীর ছাড়া কিছু বুঝি না। এখন শরীরে বেশ চাপ। আর কথা বলা যাবে না। আমি টয়লেটে ঢুকছি।

—আমি ব্রেকফাস্ট বানাচ্ছি। কী বানাচ্ছি জানো?

—কী?

--পনির পকোড়া আর চিঁড়ের পলোয়া।

--থ্যাঙ্ক ইউ। আমার জন্যে তুমি এত পরিশ্রম করো!

--তুমি আমার একনম্বর নাগর। তোমার জন্যে পরিশ্রম করব না?

—আমি একনম্বর। তাহলে দু-নম্বর নাগরও আছে বলো?

--যাহ্। আমি দ্বিচারিতায় বিশ্বাস করি না। —সুধা অপূর্ব ভ্রু-ভঙ্গি করে।

৬

সুধার সঙ্গে আলাপ যে খুব বেশি দিনের তা নয়। বছরখানেক হবে? নাকি তার একটু বেশি? একদিন শৈবালের ব্যাঙ্কে সুধা এসেছিল। ঠিক সরাসরি শৈবালের কাছে প্রথমে আসেনি। রিজিওন্যাল ম্যানেজার যে কোনও ব্যাঙ্কেরই খুব উঁচু পদ। তার কাছে যেতে হলে সাধারণ মানুষকে অ্যাপয়েনমেন্ট নিতে হয়। শৈবালের ব্যাঙ্কে একজন অধস্তন অফিসার তার কাছে সুধার বিষয়টা রেফার করে কী করণীয় সে-ব্যাপারে নির্দেশ চেয়েছিল। একটা ছোট্ট নোট-শিট এসেছিল শৈবালের টেবিলে। ওরকম কতই আসে। শৈবাল প্রথমে গুরুত্ব দেয়নি। নিজের কমপিউটরে তার রিজিয়নের মধ্যে যতগুলো ব্যাঙ্ক আছে তাদের গত ছমাসের ডেবিট-ক্রেডিটের আনুপাতিক হার কেমন সে বিষয়ে একটা রিপোর্ট সার্চ করছিল। হঠাৎ তার শীতাতপনিয়ন্ত্রিত চেম্বারের দরজা

ফাঁক হয়েছিল। সে দেখেছিল একজন মহিলার মুখ। বেশ সুশ্রী মুখ। উড়ন্ত পাখির ডানার মতন দুই ভুরু। চিলতে কপালে গোল, মেরুন টিপ। পাতলা ঠোঁটে মেরুন লিপস্টিক। ভাসা-ভাসা, বড় এবং উজ্জ্বল দুই চোখ। তার সঙ্গে রিনরিনে স্বরে—একটু আসতে পারি?

শৈবাল কিছু বলার আগেই নাটকের মতন একটা ব্যাপার ঘটেছিল। তার চেম্বারের সামনে নেভি-ব্লু আর সাদা পোশাকে ধোপদুরস্ত যে নিরাপত্তা রক্ষী বসে থাকে; মহিলাকে টপকে সে ঢুকে পড়েছিল শৈবালের ঘরে। রীতিমতো উত্তেজিতভাবে লোকটা বলেছিল—দেখুন স্যার আমার ফলট্ নাই। আমি এই ম্যাডামকে অনেক বললাম যে সাহেবকে শ্লিপ পাঠান। অ্যাপয়েনমেন্ট ছাড়া উনি কারোর সঙ্গে দেখা করেন না। তো উনি শুনলেন না আমার কথা। দরজা ঠেলে আপনার চেম্বারের মধ্যে ঢুকতে চাইছেন। বলেন'স্যার! কী করব? মাডামের গায়ে তো আমি হাত দিতে পারি না?

মহিলা দৃঢ় স্বরে শৈবালের দিকে তাকিয়ে বলেছিল—দেখুন, আমি বিপদে পড়ে আপনার কাছে সরাসরি এসেছি। আমার কথা আপনাকে শুনতেই হবে ...। —নিরাপত্তারক্ষী রেগেমেগে আবার কী বলতে যাচ্ছিল। শৈবাল হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়েছিল। মুখে বলেছিল—আপনি যান। আমি ওঁর কথা শুনব। ওঁকে ভেতরে আসতে দিন। সুধাকে দেখেও বেশ উত্তেজিত মনে হয়েছিল। তাকে ধাতস্থ হতে সময় দিয়েছিল শৈবাল। তার পর জিজ্ঞেস করেছিল—ম্যাডাম আপনার সমস্যা কী?

সুধা বলেছিল —আপনাদের এখানে সুবীরবাবু বলে একজন আছেন। উনি আমাকে হ্যারাস করতে চাইছেন।

—সুবীরবাবু হ্যারাস করতে চাইছে? ... কেন? কী ব্যাপার?

—আমরা আপনাদের ক্লায়েন্ট। ক্লায়েন্টদের সঙ্গে ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা খারাপ ব্যবহার করবেন কেন?

—কী হয়েছে আমাকে বলুন না? এটা রিজিওন্যাল অফিস। এখানে তো কেউ কারোর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে না?

—খারাপ ব্যবহার নয়তো কী? আপনাদের ব্রাঞ্চ অফিস থেকে খারাপ ব্যবহার পেয়েছি। আবার রিজিওন্যাল অফিস থেকেও খারাপ ব্যবহার পাচ্ছি।

—প্লিজ-ব্যাপারটা আমাকে একটু খুলে বলুন।

তার পর সুধা যা বলেছিল তা হল এরকম। সুধার স্বামী তন্ময় মল্লিকের একটা সেভিংস অ্যাকাউন্ট আছে। কাছাকাছি কোনও ব্রাঞ্চ অফিসে। কিছুদিন আগে ভদ্রলোক মারা গেছেন। ঐ সেভিংস অ্যাকাউন্টে শুধু তন্ময় মল্লিকের নামই ছিল। স্ত্রীর সঙ্গে জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট ছিল না। এখন সুধা অ্যাকাউন্টের টাকা তুলে নিতে চাইছে। কিন্তু চাইলে হবে কী? নিজের স্বামীর মৃত্যুর প্রমাণস্বরূপ সুধা শাখা-ম্যানেজারের কাছে ডেথ-সার্টিফিকেটের কপি দিয়েছিল। কিন্তু তাতে নাকি কাজ হয়নি। ম্যানেজার বলেছেন সুধাই যে তন্ময় মল্লিকের স্ত্রী; সে ব্যাপারে প্রমাণ লাগবে। সুধার মাথ ্ আকাশ

ভেঙে পড়েছিল। হিন্দুমতে সাত পাক দিয়ে সর্বসমক্ষে তাদের বিয়ে হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু গড়পড়তা বাঙালি দম্পতি যা ভুল করে থাকে, ওদের ক্ষেত্রেও তা হয়েছিল। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন করা হয়নি। তখন শাখা-অফিস থেকে সুধাকে বলা হয়েছিল, সে যে মৃত তন্ময় মল্লিকের স্ত্রী; এ ব্যাপারে হয় কোনও গেজেটেড অফিসার বা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের সার্টিফিকেট আনতে হবে। আর না হয় রিজিওন্যাল অফিস থেকে স্ত্রী হিসেবে মৃত ব্যক্তির অ্যাকাউন্ট থেকে সব টাকা তুলে নেওয়া যাবে এ ব্যাপারে ছাড়পত্র নিয়ে আসতে হবে। দ্বিতীয় উপায়টি সুধার কাছে সহজ মনে হয়েছিল। তাই সে সেদিন শৈবালের অফিসে এসেছিল। রিসেপশনে কথা বলে সে জানতে পারে যে, সুবীর রায় নামের কর্মচারীর সঙ্গে সেই ব্যাপারে কথা বলতে হবে। সুধার অভিযোগ হল যে, সে সুবীরবাবুর কাউন্টারের সামনে প্রায় আধঘণ্টা অপেক্ষা করেও তাকে পায়নি। তার পর যাও বা নিজের চেয়ারে বসলেন, তিনি সুধার দিকে মনোযোগ না দিয়ে একটা লেজার খুলে কী সব কাজ করতে শুরু করেছিলেন। সুধা তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গেলে তিনি ধমকের সুরে বলেছিলেন, তিনি ব্যস্ত আছেন। কথা বলতে পারবেন না। তখনই সুধা রেগেমেগে ম্যানেজার অর্থাৎ শৈবালের চেম্বারে ঢুকতে গিয়েছিল। কিন্তু সেখানেও সেই নিরাপত্তাকর্মী সুধাকে আটকেছিল। বলেছিল স্লিপ ছাড়া এবং সাহেব সময় না দিলে তাঁর সঙ্গে সরাসরি দেখা করা সম্ভব নয়। তখনই সুধা আর ধৈর্য রাখতে পারেনি। দরজা ঠেলে ঢুকে পড়েছিল শৈবালের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত অফিস-ঘরে।

সুধার মুখভঙ্গি, ভ্রূভঙ্গি এবং কথা বলার মধ্যে কী যে একটা মোহ ছিল শৈবাল বলতে পারবে না। কিন্তু সে বুঝতে পেরেছিল এই মহিলাকে তার খুব ভালো লাগছে। এবং এই ভালো লাগা বস্তুত ছিল এক সর্বনাশেরই মতন। কারণ সুধার মোহজাল থেকে শৈবাল আর নিজেকে মুক্ত করতে পারেনি। বরং ক্রমশ আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়েছে। প্রথমে অবশ্য এত কিছু মনে হয়নি শৈবালের। একজন সদ্য-বিধবা মহিলাকে সাহায্য করতেই সে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল মূলত। তাদের ব্যাঙ্কের শাখা-অফিস যে সুধার স্বামীর অ্যাকাউন্ট ক্লোজ করা বা টাকা তোলার ক্ষেত্রে নানা ফ্যাকড়া তুলেছিল তার কারণও ছিল যথেষ্ট। এসব ক্ষেত্রে প্রতারণার সুযোগও থাকতে পারে। কিন্তু সুধাকে দেখে এবং তার কথা শুনে শৈবাল আর অগ্রপশ্চাৎ ভাবেনি। সুধাকে সাহায্য করার কথাই তার মনে হয়েছিল। সুধা অবশ্য তেমন কোনও অনুরোধের মধ্যে যায়নি। খুব একটা অনুনয়-বিনয় সে শৈবালকে করেওনি। বরং বেশ ঝাঁঝের সঙ্গেই কথা বলেছিল। বলেছিল—সরকারি অফিসের মতো ব্যাঙ্কেও যে কর্মচারীরা কাজে ফাঁকি দেয়, মানুষের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে তা আমি বুঝতে পারছি আপনাদের অফিসগুলোতে যাতায়াত করে। শৈবাল বলেছিল—দু-একটা বিক্ষিপ্ত ঘটনা থেকে কোনও ব্যাপারে জেনারেল ওপিনিয়ন তৈরি করে ফেলা ঠিক নয়। আপনি যদি কোথাও হ্যারাসড্ হয়ে থাকেন

তার জন্যে আমি দুঃখ প্রকাশ করছি। সুধা বলেছিল—শুধু দুঃখ প্রকাশ করে কোনও লাভ নেই। আমার কাজটা আপনি করে দিন। আমি যাতে আমার হাজব্যাণ্ডের অ্যাকাউন্ট ক্লোজ করে সেভিংসটা তুলে নিতে পারি তার ব্যবস্থা করুন। আমার টাকার খুব প্রয়োজন।

শৈবাল বলেছিল—সব টাকা আপনি তুলবেন কেন? আপনার হাজব্যান্ডের অ্যাকাউন্ট যাতে আপনার নামে হয়ে যায় সেই ব্যবস্থা আমি করছি। উত্তর পেয়েছিল—ঐ অ্যাকাউন্ট আমি কনটিনিউ করতে চাই না। আমার নামে অন্য ব্যাঙ্কে অন্য অ্যাকাউন্ট আছে।

—আস সী ...। কিছু মনে করবেন না ম্যাডাম। একটা প্রশ্ন করছি। আপনি কি সার্ভিস-হোল্ডার?

—হ্যাঁ। আমি ইনটিরিয়র ডিজাইনার। একটা প্রাইভেট ফার্মে কাজ করি। আমার হাজব্যান্ডের অ্যাকাউণ্টে প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা আছে। টাকাটা কেন তুলতে চাইছি জানেন?

—কেন?

—দার্জিলিং-এ কনভেন্ট স্কুলে আমার ছেলেকে ক্লাস ফাইভে ভর্তি করতে হবে। ও ওখানেই থাকবে। হোস্টেলে। ... ওর পক্ষে ভালোই হবে। ওর বাবাকে খুব ভালোবাসত ও। সব বাচ্চাই অবশ্য বাসে। কিন্তু ছেলে ওর বাবার মৃত্যুর পর সত্যিই খুব মনমরা হয়ে গেছে। তার ওপর আমিও সকালে বের হই। রাতে ফিরি। কাজের লোকের হাতে ওকে সারাদিন ছেড়ে যাওয়া। ও খুব লোনলি ফিল্ করে। তাই আমি ওকে দার্জিলিং-এ পাঠাচ্ছি। ওখানে হোস্টেলে বন্ধুদের মধ্যে ও ভালো থাকবে। ভালো পরিবেশে পড়াশোনাও করবে। স্কুলে ভর্তি করা, যাতায়াত, বইপত্তর কেনা এসবের জন্যে অনেক টাকা লাগবে। এই সময় ওর বাবার সেভিংসটা হাতে এসে গেলে কিছুটা সুরাহা হবে আমার।

প্রথম দিনের প্রথম আলাপেই এতটা জানার পর শৈবাল সুধাকে ফেরাতে পারে নি। তার শিভালরি উথলে উঠেছিল। উচ্চপদস্থ অফিসার হিসেবে শৈবালের পক্ষে সুধাকে সাহায্য করা এমন কিছু কঠিন ছিল না। তার নির্দেশ পেয়ে শাখা-অফিসের ম্যানেজার খুব দ্রুত সুধা যাতে মৃত স্বামীর অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলে নিতে পারে তার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। সুধা কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছিল একদিন ব্যাঙ্কে। সেদিন শৈবাল গদগদ হয়ে চা অফার করেছিল সুধাকে। বেশ কিছুক্ষণ ছিল সুধা। জানিয়েছিল, টাকাটা পেয়ে তার উপকার হয়েছে। তার ছেলে দার্জিলিং-এর স্কুলে ভর্তি হয়ে গেছে। ভালোই আছে হস্টেলে। সুধা ঠিক করেছে মাসে একবার করে দার্জিলিং গিয়ে সে ছেলেকে দেখে আসবে। এ ছাড়া সুবিধেমতো টেলিফোন-মারফত এবং চিঠিপত্রে যোগাযোগ তো আছেই। সুধা যখন চলে যাচ্ছিল সেদিন, তখন শৈবাল তাকে নিজের

একটা কার্ড দিয়েছিল। সেই কার্ডে তার মোবাইল-ফোন নম্বর ও অন্যান্য ফোন-নম্বর উল্লেখ করা ছিল। শৈবাল বলেছিল—যদি কোনওদিন প্রয়োজন হয় যোগাযোগ করতে পারেন। সুধা হেসে বলেছিল—ধন্যবাদ। নিয়েছিল কার্ডটা।

সপ্তাহখানেক যেতে না যেতেই সুধা যে যোগাযোগ করবে তা ধারণাতে ছিল না শৈবালের। একদিন দুপুরের দিকে নিজের অফিসে যখন কাজ করছিল শৈবাল তার মোবাইল ফোন বেজেছিল। যে নাম্বারটা চিলতে স্ক্রিনে ভেসে উঠেছিল সেটা শৈবালের পরিচিত নয়। সে মোবাইল কানের কাছে ধরে বলেছিল—হ্যালো?

—আমি সুধা মল্লিক বলছি। —সেই অনুপম কণ্ঠস্বর শুনে শৈবালের বুকের রক্ত মুহূর্তে ছল্‌কে উঠেছিল। —হ্যাঁ। শৈবাল রায় বলছি। কেমন আছেন?

—ঐ চলছে এক রকম। আপনার সঙ্গে একটু দেখা করার প্রয়োজন ছিল।

—আমার সঙ্গে?....চলে আসুন ব্যাঙ্কে। আমি বিকেল চারটে অব্দি আছি। তার পরে অন্য জায়গায় অ্যাপয়েনমেন্ট—

—নাহ, আপনার অফিসে হবে না। আপনি খুব ব্যস্ত মানুষ। সব সময় চেম্বারে কাজকর্ম নিয়ে কেউ না কেউ ঢুকছে। আমি আপনার সঙ্গে নিরিবিলিতে কথা বলতে চাই।

—নিরিবিলিতে?—শৈবালের মুখ দিয়ে ফস্‌ করে বেরিয়ে গিয়েছিল। ও প্রান্তে সুধা রিনরিন হেসেছিল। শৈবালের মনে হয়েছিল সে কোনও দূরাগত ঝরনার ধ্বনি শুনছে।

—নিরিবিলি শব্দটা ব্যবহার করা বোধহয় ভুলই হল।—সুধা বলেছিল। আপনি আমাকে ভুল বুঝলেন.....?

—নাহ্‌ ভুল বুঝব কেন?

—আসলে আমরা, মেয়েরা বলি বটে বেঁচে থাকতে হলে পুরুষের সাহায্য দরকাব নেই। নিজেরাই আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ। কিন্তু কথাটার মধ্যে কিছু ভুলও বোধহয় আছে। তন্ময়ের আন টাইমলি ডেথের পর একা একা থাকতে প্রতি পদে আমাকে হোঁচট খেতে হচ্ছে।

—কেন? আবার কী অসুবিধে হল?

—কিছু অসুবিধে হচ্ছে। ফোনে সবটা বলা যাবে না। যদি শুনতে চান তা হলে কোথাও বসতে হবে। সেজন্যেই নিরিবিলি জায়গার কথা বলেছি। আজকাল সকলের কাছ থেকে সাহায্য কিংবা মানবিকতা আশা করা যায় না। কিন্তু আপনাকে আমার অন্যরকম লেগেছে।

শৈবাল জিজ্ঞেস করেছিল—কোথায় যেতে হবে বলুন?

সুধা বলেছিল—সেটা আমার থেকে আপনি ভালো বুঝবেন। কোনও রেস্তোরাঁ হলে ভালো হয়। তবে বার যেন না হয়। বার মানেই মাতালদের হইচই। বেপরোয়া

চাহনি।.....এমন একটা জায়গা যেখানে টি কিংবা এবং হালকা স্ন্যাকস্ নিয়ে নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ কথা বলা যাবে।

শৈবাল কলকাতার অভিজাত এলাকায় তার পছন্দসই একটা কাফে-র নাম বলেছিল। সুধা চেনে জায়গাটা। সে রাজি হয়েছিল। সে অফিস থেকেই আসবে। ঠিক হয়েছিল বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ সেই কাফেতে তাদের দেখা হবে।

সাড়ে পাঁচটার কিছু পরেই শৈবাল গিয়েছিল। রাস্তায় জ্যাম থাকার কারণে তার কিছুটা দেরি হয়ে গিয়েছিল। সুধা সেই কাফে-র সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। দূর থেকে শৈবাল দেখেছিল, সে অনিশ্চিত ভাবে তাকাচ্ছে এধার-ওধার। শৈবালকে দেখে সে হেসেছিল। আর তখনই শৈবালের মনে হয়েছিল যে, সেদিন ব্যাঙ্কে যা দেখেছিল, তার থেকে সুধা যেন একটু বেশিই সাজগোজ করেছে।

কাফেতে বসে তারা যে খুব বেশি খাবার-দাবার নিয়েছিল তা নয়। শৈবাল নিতে চেয়েছিল অনেক কিছু। চিজ-স্যান্ড উইচ, চিকেন-কাটলেট এই ধরনের কিছু খাবার। সুধা আপত্তি জানিয়েছিল। সে বলেছিল যে শুধু কফি নিলেই হবে। সে আসলে জরুরি কিছু কথা বলতে চায় শৈবালকে। হেসে শৈবাল বলেছিল—কথা শোনবার জন্যেই তো এসেছি। কিন্তু অন্তত কিছু স্ন্যাকস তো নিতেই হবে। শুধু কফি নিলে দরজার কাছে চেয়ার-টেবিল নিয়ে যে মালিক বসে আছে তার গোঁসা হবে। সে বেয়ারা মারফত বারবার সিগন্যাল পাঠাবে যাতে আমরা টেবিল ছেড়ে দিই।

সুধা হেসে বলেছিল—তা হলে কিছু নিন। আমি কিন্তু খেতে আসিনি। শৈবাল বলেছিল—আমি ক্ষুধার্ত। আজ অফিসে সারাদিন যা কাজের চাপ ছিল টিফিনটা অব্দি করা হয়নি।

চিকেন-কাটলেট আর কফি সহযোগে চলেছিল তাদের কথাবার্তা। প্রায় ঘণ্টাখানেক। সুধাই বলছিল। শৈবাল শুনছিল। শৈবাল জানতে পারে সেদিনই যে সুধার স্বামী তন্ময় মারা গিয়েছিল পথ-দুর্ঘটনায়। তন্ময় ছিল অধ্যাপক। কলেজে পড়ানো ছাড়াও সে অধ্যাপকদের সংগঠনের কাজেও আপাদমস্তক জড়িয়ে ছিল। সংগঠনের কাজেই তাকে যেতে হয়েছিল শিলিগুড়ি। একটা টাটা-সুমো ভাড়া করে তারা বেশ কয়েকজন সহকর্মী কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি গিয়েছিল সম্মেলনের কাজে। শিলিগুড়ি থেকে রায়গঞ্জ হয়ে কলকাতা ফেরার সময় ফারাক্কা সেতুর কাছে তাদের গাড়ি ভয়াবহ দুর্ঘটনায় পড়ে। টাটা-সুমোর চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে গাড়ির। বিপরীত দিক থেকে আসা একটা মালবোঝাই ট্রাকের সঙ্গে তন্ময়দের গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। তন্ময় গাড়িতে যে আটজন ছিল, তাদের সবাই কমবেশি আহত হয়েছিল। কিন্তু তন্ময়, তার আর একজন সহকর্মী এবং চালক যারা গাড়ির সামনে ছিল, তারা মারাত্মক জখম হয়। চালকের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয়েছিল। তন্ময় এবং তার সকহর্মীর মৃত্যু হয় হাসপাতালে নিয়ে যাবার সময়।

শুধু এই দুঃখের কথা শোনাতে সুধা সেদিন শৈবালকে ডাকেনি। যে ভাড়াবাড়িতে সে থাকে সেখানে তার সমস্যা হচ্ছিল। বাড়িওলা লোকটা ভালো নয়। তন্ময় মারা যাবার পর প্রায় দু-মাস কেটেছে। ছেলেকে নিয়ে যতদিন ছিল, ততদিন সমস্যা হয়নি। কিন্তু সম্প্রতি সুধাকে একাই থাকতে হয়। কারণ, ছেলেকে সে দার্জিলিং-এর কনভেন্ট স্কুলে ভর্তি করেছে।

সুধা বলছিল—আসলে একজন বিবাহিত কিংবা অবিবাহিত মেয়ের পক্ষে একেবারে একা থাকা যে কী সমস্যা তা আগে বুঝিনি। এখন বুঝছি।

শৈবাল জিজ্ঞেস করেছিল—সমস্যাটা ঠিক কী?

—বাড়িওলা লোকটা বেশ বয়স্ক।......তা পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন তো বটেই। ওর বউ অসুস্থ। বিছানা ছেড়ে উঠতেই পারে না। রিউম্যাটিক পেইন। বাড়িতে সবসময়ের কাজের লোক আছে। কিন্তু কী বলব..........লোকটা অসভ্য। ওর বদ মতলব আছে। —এতটা বলে সুধা কাটলেটের যেটুকু পড়ে ছিল, কাঁটা দিয়ে তুলে মুখের মধ্যে চালান করে দিল। ঠিক তখনই শৈবাল লক্ষ্য করে যে সুধার নাকের নীচে অস্পষ্ট গোঁফের রেখা। খুবই অস্পষ্ট। খুব কাছ থেকে লক্ষ্য করলে বোঝা যায়। আর ঠোঁটের ডানদিকে একটা ছোট্ট সর্ষে-দানা। তিল।

—লোকটার অসভ্যতার বর্ণনা একটু দেওয়া যাবে?

—আর কী বলব?......এখন তো আমি একা থাকি অত বড় বাড়িতে।

—কত বড় বাড়ি?

—দুটো বড় ঘর। এছাড়া পারলার। টয়লেট দুটো। কিচেন।

—বাড়িওলা কী চায়? আপনাকে তুলে দিয়ে অন্য ভাড়াটে বসাতে চায়?

—ঠিক তা নয়। আমি অফিস থেকে ফিরি ধরুন সন্ধে ছটা কিংবা সাড়ে ছটার মধ্যে। আমি অফিস থেকে ফিরে ফ্রেশ হয়ে চা-টা খাই। তারপর একা একা আর কী করব? বই-টই পাড়ি।

—টি. ভি. দেখেন না?

—টিভি?........নাহ। আমি খবর শোনা ছাড়া টিভির সুইচ অন্ করি না। বরং পড়তে বেশি ভালো লাগে।

—ফিকশান?

—নাহ্ কবিতা।

—কবিতা? ও মাই গড? আপনার কবিতা লেখার বাতিক আছে না কি?

—তা নেই। তবে কবিতা পড়তে ভালো লাগে। বিশেষত আধুনিক কবিতা। এখন যারা ভালো লিখছে তাদের কবিতা।

—বুঝলাম।—শৈবাল সিগারেট ধরায়। ধোঁয়া ছেড়ে বলে—বাড়িওলাকে নিয়ে কী যেন সমস্যার কথা বলছিলেন?

—হ্যাঁ। ঠিক রাত আটটা নাগাদ ডোর-বেল বাজাবে।

—কে? বাড়িওলা বুড়ো?

—হ্যাঁ। প্রথম দু-তিনদিন আমি তেমন কিছু মাইন্ড করিনি। বুড়ো আসত। দু-চারটে কথাবার্তা বলত। তার পর চলে যেত। একদিন চা খেতে চাইল। আমি কিচেনে চা বানাচ্ছি। হঠাৎ দেখি কিচেনের চৌকাঠের কাছে বুড়ো এসে হাজির হয়েছে।

—বলেন কী?

—হ্যাঁ চৌকাঠে দাঁড়িয়ে বুড়ো চোখ-মুখের বিশ্রি ইঙ্গিত করছিল। আমি রেগে জিজ্ঞেস করি, কী ব্যাপার বলুন তো? এরকম ব্যবহার করছেন কেন? তখন বুড়ো ফস্ করে আমাকে কু-প্রস্তাব দেয়।

—তার পর? —শৈবাল বেশ আগ্রহ পাচ্ছিল।

—তার পর আর কী। আমি বলেছিলুম আপনি এখুনি বিদেয় হবেন। তা না হলে আমি কিন্তু চেঁচাব। লোকজন চলে আসবে। তখন দেখি সুড়সুড় করে লেজ গুটিয়ে পালাল।

শৈবাল হাসছিল। এমনই হাসছিল যে, আশেপাশের টেবিল থেকে লোকজন তার দিকে তাকাচ্ছিল। সুধা বলল—আপনি হাসছেন? আমার অবস্থাটা একবার চিন্তা করুন।

—পরদিন থেকে বুড়ো নিশ্চয়ই আত রাত আটটার সময় ডোর-বেল বাজায়নি?

—তা বাজায়নি। তবে অন্য অসুবিধে করেছে।

—কী রকম?

—আজকাল প্রায়ই জল বন্ধ করে দিচ্ছে। জলের পাম্প বাড়িওলার হাতে। পাম্প ঠিকমতন চালায় না। ফলে আমার কল প্রায়ই ড্রাই হয়ে যায়। এ ছাড়া একটা নোটিসও দিয়েছে।

—কী নোটিস?

—বাড়ি ছাড়তে হবে। ও অন্য ভাড়াটে বসাবে।

—হুঁ।—শৈবালের কপালে ভাঁজ।—আপনি ওকে স্যাটিসফাই করতে চাননি তাই পেছনে লেগেছে।

—স্যাটিসফাই শব্দটা খুব অশ্লীল শোনায় না?

—সরি, আমি সেরকম ভেবে কিছু বলতে চাইনি।—বেশ অপ্রস্তুত পড়ে গিয়েছিল শৈবাল। তারপর অপ্রস্তুত ভাব কাটাতে বলেছিল—আপনি কি আমার থেকে কোনও সাহায্য আশা করেন?

সুধা স্পষ্ট চোখে তাকিয়েছিল শৈবালের দিকে। বড় বড়, টানা এবং উজ্জ্বল চোখ। শৈবালের মনে হয়েছিল, ওর চোখদুটো সত্যিই খুব আকর্ষণীয়।

সুধা বলেছিল—বুঝতেই পারছেন একা উইডো। হেল্পলেস। আপনার অফিসে গিয়ে আপনার থেকে যে ব্যবহার পেয়েছি তাতে মনে হয়েছে আপনাকে এসব কথা বলা যায়।......কথা বলতে বলতে অনেকক্ষণ কেটে গেছে। দূরে-দরজার কাছে বসে

থাকা মালিকের টনটনে হিসেব। একজন বেয়ারা এসে জিজ্ঞেস করেছিল আরও কিছু আনবে নাকি বিল আনবে। অভিজ্ঞ শৈবাল ইঙ্গিতটা বুঝেছিল। সে সুধার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল—আর কিছু খাবেন?

—নাহ। বাবা! চিকেন কাটলেট পেটে এখনও গজগজ করছে!

—এক কাপ কফি অন্তত?

—বেশি কফি নিলে আবার রাতে ঘুম আসবে না। আমার অনেক বাতিক।

—কিন্তু কিছু তো নিতেই হবে। আপনার বোধ হয় এখনও কিছু বলার আছে? অন্তত আর আধঘণ্টা এখানে বসতে হবে।

—ওহ।—ইঙ্গিতটা বুঝেছিল সুধা। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ঢ্যাঙা বেয়ারাকে একবার দেখেছিল। বলেছিল—তা হলে আমার জন্যে এক কাপ চা—।

—ঠিক আছে।—হেসেছিল শৈবাল। সুধার জন্যে এক কাপ চা আর নিজের জন্যে এক কাপ কফি অর্ডার দিয়েছিল সে।

তার পর তাদের মধ্যে যা কথা হয়েছিল তা এরকম।......শৈবাল জিজ্ঞেস করেছিল সুধা কী করবে ভাবছে। সুধা জানিয়েছিল, ঐ বাড়িটাতে তার একেবারেই থাকার ইচ্ছে নেই। নিজের বদ মতলব চরিতার্থ করতে পারেনি বলে ঐ বাড়িওলা বুড়ো দিনের পর দিন নানারকম ফন্দি-ফিকির করে সুধাকে অতিষ্ঠ করে তুলবে। সে বুঝতে পারছে ঐ বাড়িতে থাকা তার পক্ষে সমীচীন নয়। তা ছাড়া এখন সে একা। অত বড় বাড়ি তার দরকারটাই বা কী? ছেলেও হস্টেলে থাকে। কালে ভদ্রে বাড়িতে আসবে। সুতরাং সে ভদ্র এলাকায় একটা ছোট বাড়ি খুঁজছে। সে ব্যাপারে শৈবাল কি তাকে কোনও সাহায্য করতে পারবে? শৈবাল বলেছিল যে, তাকে বিষযটা নিয়ে একটু ভাবতে হবে। দুদিন সময় দরকার।

—তা আপনাকে কবে ফোন করব?—জিজ্ঞেস করেছিল সুধা।

—আপনাকে ফোন করতে হবে না। আমিই আপনাকে ফোন করব। কিন্তু আপনার ফোন-নাম্বার?

—আপনাকে বলা হয়নি। — হেসেছিল সুধা।—আমার নিজের একটা মোবাইল সেট আছে।

—তা হলে তো খুবই ভালো। যখন ইচ্ছে যোগাযোগ করতে পারব। নাম্বারটা বলুন?

নিজের মোবাইল ফোনে সুধার নাম্বার স্টোর করে নিয়েছিল শৈবাল। সুধাকে আশ্বাস দিয়েছিল। খুব দ্রুত সে যোগাযোগ করবে।

—যে বাড়ি আমার জন্যে খুঁজবেন তা যেন বেশ পশ্ এলাকায় হয়। একা থাকতে হবে। বুঝতেই পারছেন।

—দেখা যাক কী করতে পারি। আমার মাথায় অন্য আইডিয়াও আছে—শৈবাল হেসেছিল।

একজন অভিজ্ঞ এবং তুখোড় ব্যাঙ্ক-অফিসার হিসেবে সুধার জন্যে সত্যিই অন্যরকম ভেবেছিল সে। তার পরিচিতিদের সংখ্যাও কম নয়। একজন প্রোমোটার বন্ধুর সঙ্গে সেদিন রাতেই ফোনে যোগাযোগ করেছিল শৈবাল।

—হ্যাঁরে সঞ্জয় ফ্ল্যাট-টাট কিছু আছে তোর হাতে?

—কার জন্যে? তোর নিজের জন্যে না। পরের জন্যে।

—আরে না না। নিজের জন্যে নয়। পরের জন্যে।

—কোন অঞ্চলে প্রেফার করছিস?

—সাউথের দিকে হলেই ভালো হয়।

—কুঁদঘাটের দিকে হতে পারে। ঠিক সাউথ নয়। একটু ভেতরে।

—কুঁদঘাট?—শৈবাল থমকেছিল। —অত ইনটেরিয়রে হলে আবার অসুবিধে হবে না তো?

—অসুবিধের ব্যাপারটা অনেক কিছুর ওপর নির্ভর করে বস্। যে থাকবে তার অফিস কিংবা বিজনেস কোথায়। ছেলেমেয়েরা কোন্ স্কুলে পড়ে। এসব অনেক ব্যাপার।

—হুঁ। দেখি একটু কথা বলে নিতে হবে...।

—কার দরকার তা তো বললে না বস?

—অত জেনে তোর দরকার কী? তুই শালা প্রোমোটার—পয়সা পাবি ফ্ল্যাট বেচবি।

—তবুও......মনে হচ্ছে কিছু চেপে যাচ্ছো গুরু?—ফোনের মধ্যেই খ্যা খ্যা হেসেছিল শৈবালের বন্ধু।

—এক ভদ্রমহিলার দরকার। কিছুদিন আগে বেচারার হাজব্যান্ড মারা গেছে অ্যাকসিডেন্টে। তার একটা বাড়ি দরকার।

—স্বামীহারা ভদ্রমহিলা?.....বাহ্ বাহ্ চালিয়ে যাও গুরু?

সুধাকে জিজ্ঞেস করে শৈবাল জানল যে, কুঁদঘাটে বাড়ি পেলে তার অসুবিধে নেই। কারণ তার ইনটেরিয়র ডেকরেশনের অফিস হল দেশপ্রিয় পার্কের কাছে। কুঁদঘাট থেকে প্রতিদিন যাতায়াতে তেমন অসুবিধে হবার কথা নয়। ডাইরেক্ট বাসও আছে। তখন শৈবাল প্রস্তাব দিয়েছিল—চলুন, তা হলে একদিন দেখে আসা যাক।

শৈবালের অফিসের গাড়িতেই ওরা গিয়েছিল কুঁদঘাট। অনেকটা জায়গা জুড়ে বহুতল। আবাসনের নির্মাণ সম্পূর্ণ। লোকজন ফ্ল্যাটে থাকাও শুরু করেছে। বাইরে থেকে বাড়িটা দেখেই বেশ পছন্দ হয়ে দুজনেরই। শৈবালের বন্ধু তার একজন কর্মচারীকে বলে রেখেছিল। সে তিনতলার একটা ফ্ল্যাটের চাবি নিয়ে অপেক্ষা করছিল। ফ্ল্যাটটা দেখে পছন্দ হয়ে গেল সুধার। বেশি বড় নয়। কার্পেট এরিয়া সাতশো স্কোয়ার ফুট। একা কিংবা দুজনের পক্ষে যথেষ্ট।

শৈবাল জিজ্ঞেস করেছিল—কী? পছন্দ তো?

—পছন্দ খুবই। কিন্তু.......

—কী?

—এটা তো ওনারশিপ ফ্ল্যাট। পারচেজের ব্যাপার। আমি তো ভাড়া বাড়ি খুঁজছি?

—কেন? এই ফ্ল্যাট পারচেজ করুন? অসুবিধে কী?

—কী বলছেন আপনি?—সুধা প্রায় আঁতকে উঠেছিল।—এই ফ্ল্যাটের দাম কমসে কম পাঁচ-ছ লাখ টাকা তো হবেই। অত টাকা আমি পাব কোথায়? তন্ময়ের কলেজ থেকে টাকাপয়সা কিছুই তো এখনও পাওয়া যায়নি। প্রভিডেন্ট....গ্র্যাচুয়িটি এসব পেতে দেরি হবে। কত টাকা পাব তাও জানি না। নিজের আট হাজার টাকার মতো মাইনে সম্বল। দেখলেন তো—আপনাদের ব্যাঙ্কে তন্ময়ের সেভিংস অ্যাকাউন্টসে যা টাকা ছিল তা সবই উইথড্র করে নিলুম। দার্জিলিং-এর স্কুলে ছেলেকে ভর্তি করতেই সব টাকা বেরিয়ে গেল। ওর হস্টেল আর পড়ার খরচই তো মাসে মাসে তিন হাজারের মতো। আমার পক্ষে ফ্ল্যাট পারচেজ করা অসম্ভব।...আকাশ-কুসুম কল্পনা!

শৈবাল হেসে বলেছিল—অত ঘাবড়াচ্ছেন কেন? সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

—কী ব্যবস্থা হয়ে যাবে?

—আমি ব্যাঙ্ক থেকে হোম-লোনের ব্যবস্থা করে দেব।

—লোন? মেটাব কী করে?

—বলছি তো। আমার কিছু বিশেষ ক্ষমতা আছে। সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করে আমি আপনাকে সুবিধেজনক কিস্তিতে হোম-লোনের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। এরকম সুযোগ চট করে লোকে পায় না।....আপনাকে একটা কথা বলি। ভাড়া বাড়িতে একা একজন মহিলার পক্ষে থাকা সত্যিই সম্ভব নয়। যে অসুবিধেগুলো আপনি ফেস করছেন তা অন্য জায়গাতেও থাকবে। তার থেকে নিজের ফ্ল্যাটে থাকবেন। কেউ আপনাকে ডিসটার্ব করতে পারবে না।

—কিন্তু ....সুধা তার নিজস্ব ভঙ্গিতে মুক্তোর মতো ছোট দাঁতে পাতলা ঠোঁট কামড়েছিল। শৈবাল ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছে এই ভঙ্গিতে সুধাকে অপরূপ লাগে। শৈবালের এক মুহূর্ত মনে হয়েছিল, তিনতলার এই নির্জন ও ফাঁকা ফ্ল্যাটবাড়িতে সে ঐ নারীকে একবার সবেগে আলিঙ্গন করে? সুধার ঠোঁটে ডুবিয়ে দেয় নিজের ঠোঁট! কিন্তু নিজেকে সংযত করেছিল সে। হেসে জিজ্ঞেস করেছিল—এর মধ্যে আবার কিন্তু কী?

—আপনি আমাব জন্যে এত করবেন কেন?

—এসব কথার কোনও উত্তর হয়?

—তবুও......

—আপনি তো নিজেই সেদিন বললেন যে, আমাকে দেখে আপনার অন্যরকম মনে হয়েছে।....কিছুটা মানুষ বলে মনে হয়েছে আমাকে।

—সেটা তো অবশ্যই। সত্যিই আপনাকে যত দেখছি তত...

—তা ছাড়া কারোর কারোর জন্যে তো করতেও ইচ্ছে করে.....?—হেসে কথাটা বলেছিল শৈবাল। সুধা কিছু বলেনি। তার ফর্সা মুখে শুধু ফুটে উঠেছিল রক্তিম আভা।

বাড়িটা নিয়ে নিল সুধা। পুরো টাকাটাই প্রোমোটার বন্ধুকে ব্যাঙ্ক-ঋণ হিসেবে পেমেন্টের ব্যবস্থা করল শৈবাল। ব্যাঙ্কের নিয়মে সাধারণত এরকম হয় না। ঋণ খুব বেশি হলে ষাট শতাংশ বা সত্তর শতাংশ পাওয়া যায়। বাকি টাকা ঋণ-গ্রহীতাকেই দিতে হয়। তা ছাড়া সচ্ছলতার প্রমাণ-স্বরূপ নিজস্ব কিছু মর্টগেজও রাখতে হয় ব্যাঙ্কের কাছে। কিন্তু শৈবাল নিজের প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে সুধার ক্ষেত্রে সব কিছু মকুব করে দিল। মাসে মাসে শুধু আড়াই হাজার টাকা কিস্তি (সুদসহ) মেটাতে হবে। অনেক বছর। তা চলুক না? সুধাও থাকবে। আর শৈবালও তো পালিয়ে যাচ্ছে না।

সুধার সঙ্গে শৈবালের দৈহিক সম্পর্ক শুরু হয় সুধা নতুন ফ্ল্যাটে উঠে যাবার কয়েকদিনের মধ্যেই। ব্যাপারটা মধ্যে যে খুব পরিকল্পনা ছিল তা নয়। একদিন সন্ধেবেলা। শৈবাল গিয়েছিল সুধার ফ্ল্যাটে। সুধারই আমন্ত্রণ ছিল। সুধা ফোনে তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল।

—কী ব্যাপার একেবারে চুপ হয়ে গেলেন যে?—ফোনে জিজ্ঞেস করেছিল।

—সব ঠিক আছে?—প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে শৈবাল জিজ্ঞেস করেছিল।

—হ্যাঁ। ঠিকই তো আছে। নতুন জায়গায় কাজের লোকও তো পেয়ে গেছি।

বাহ! ঠিকই তো আছে তা হলে?

—নতুন ফ্ল্যাটে কেমন আছি আমি দেখতে আসবেন না?

—দুদিন বাদে যাব। আরও একটু গুছিয়ে নিন?

—নাহ, আজই আসতে হবে।—আবদারের ভঙ্গিতে বলেছিল সুধা।

—আজই?.............কখন?

—সন্ধের দিকে? অফিস ফেরত। আমি অপেক্ষা করব।

এর পর শৈবাল আর সংযত করতে পারেনি নিজেকে। অফিসের পর বাড়ি না গিয়ে সুধার ফ্ল্যাটে গিয়েছিল। প্রতিদিন অফিসের পর নিয়ম করে সন্ধের সময় বাড়ি ফেরার মধ্যে যেন কী এক অসহায় গেরস্থপনা আছে। আর বাড়ি ফিরেও তো আজকাল বিরক্তি। যত দিন যাচ্ছে অনিতা যেন কী রকম বুড়ি পিসিমাদের মতো হয়ে উঠছে। কত আর বয়স তার? সুধারই বয়সী হবে। একটু উনিশ-বিশ হতে পারে। অনিতা সুধার থেকে দু-এক বছরের বড়ও হতে পারে। সে যাই হোক, অনিতার মধ্যে আজকাল কী যে ভক্তিরসের প্রাবল্য জেগেছে। কোথাকার কোন্ এক গুরুদেব জুটিয়েছে সে। সর্বক্ষণ সেই গুরুদেবের নির্দেশ সে মেনে চলে। বাসি কাপড়ে এটা কোরো না। ওটা কোরো না। দোতলায় ছাতের পাশে যে ঠাকুরঘর তার সংস্কার চলছে শুধু। মেঝেতে টাইলস বসানো হল। দেয়ালে টাইলস বসানো হল। পেতলের গোপাল হয়ে গেল

আগাগোড়া রুপোর। আর সর্বক্ষণ বাড়িতে অডিও-ক্যাসেটে হিন্দি ভজন চলছে। এসবও না হয় মেনে নেওয়া গেল। অনিতার সব আবদার বিনা বাক্যব্যয়ে মেটায় শৈবাল। টাকা খরচের কসুর করে না। সংসারে তার উঁচু পদের চাকরির সুবাদে যথেষ্ট সচ্ছলতা আছে। কিন্তু বিনিময়ে আজকাল তাকে অনিতা কী দেয়? বিছানায় মনে মনে যে ধরনের খেলোয়াড় মেয়ে পছন্দ করে শৈবাল, অনিতা কোনওকালেই সেরকম নয়। দাম্পত্য-জীবনের প্রথম থেকেই যৌন-অতৃপ্তি তার থেকেই গেছে। তাও যা-হোক খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছিল। কিন্তু আজকাল রাত্রে, বিছানায় সত্যিই অনিতা অসহ্যভাবে বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে। শৈবাল ডাকলে সে অবশ্য আপত্তি করে না। নির্বিবাদে চলে আসে। কিন্তু খেলার নিয়ম অনুযায়ী খেলবার কোনও স্পৃহাই তার যেন থাকে না। যেন সে মনে মনে শৈবালকে বলে—তোমার ইচ্ছে মতো, চাহিদা-মতো তুমি যা করার করো। আমি বাধা দিচ্ছি না। আমি চুপচাপ শুয়ে আছি।....কিন্তু এটা তো খেলার নিয়ম নয়? সংসারের সব কিছুর মতো যৌন-সম্পর্কের ক্ষেত্রেও উভয়ের বোঝাপড়া দরকার। উভয়ের সক্রিয় অংশগ্রহণ দরকার। সেখানে অনিতার যথেষ্ট ঘাটতি আছে।

অফিস থেকে সন্ধে সাতটা নাগাদ সোজা সুধার ফ্ল্যাটে গিয়ে ডোর-বেল বাজালে সুধাই দরজা খুলেছিল। এমন ভাবে দরজা খুলে গিয়েছিল যে শৈবালের মনে হয়েছিল ঠিক তারই অপেক্ষায় ছিল সুধা। যে পোশাক পরনে ছিল সুধার, তাতে শৈবাল তাকে আগে দেখেনি। টাইট জিনস পাতলুন আর খাটো গোলাপি টপ। সম্পূর্ণ অন্যরকম লাগছিল সুধাকে। তার যৌবন যে কত তীব্র তা যেন বুঝিয়ে দিচ্ছিল সুধা। ঘরের মধ্যে হালকা সুগন্ধ। স্টিরিওতে মৃদু তালে বাজছিল কোনও পিয়ানোর সুর। চা এবং কিছু হালকা খাবার খাওয়ার পর টুকটাক কথা চলছিল। বাইরে অন্ধকার ঘন হয়ে নেমে এসেছিল। চারপাশের বাড়িগুলো থেকে কথাবার্তা ভেসে আসছিল মাঝে মাঝে। শৈবাল সিগারেট ধরিয়েছিল। সুধা চুপচাপ বসেছিল বিপরীত দিকের সোফায়। যেন ভাবছিল কী বিষয়ে কথা বলবে। হঠাৎ শৈবাল নিজের ভেতরে অনুভব করেছিল অবরুদ্ধ কামের চাপ। এরকম পরিবেশে পরিপূর্ণ একজন নারীকে একা পেয়ে শৈবাল আর নিজেকে ঠিক বাখতে পারেনি।

সুধাকে ডেকেছিল—শুনুন একবার.......

—কী?—সুধা অদ্ভুত ভঙ্গিতে হেসেছিল।

—কাছে আসুন। কথা আছে।

আশ্চর্য! সুধাও যেন এই ডাকটার জন্যেই অপেক্ষা করছিল। সাহসী পুরুষের দিক থেকে এক মৃদু আহ্বান। সে উঠে এসেছিল শৈবালের সামনে। সটান উঠে দাঁড়িয়েছিল শৈবাল। তারপর দুই-হাতে সুধাকে আলিঙ্গন করে তার ঠোঁটে ডুবিয়ে দিয়েছিল নিজের ঠোঁট। আর তখনই বুঝেছিল, পুরুষের স্পর্শ পাবার জন্যে কতটা উন্মুখ হয়ে আছে সুধার ঠোঁট, তার স্থাপত্য-সদৃশ শরীর। দুজনেই এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল একেবারে। সুধাকে আদরের ফাঁকে ফাঁকে ক্রমশ নিরাবরণ করে ফেলছিল

শৈবাল। তারপর বিছানায় যাবার মুহূর্তে সুধা গাঢ় স্বরে ফিসফিসিয়ে বলেছিল—আলোর সুইচটা অফ্ করে দাও প্লিজ.........

চানঘর থেকে স্নান সেরে তাজা হয়ে এখন বেরল শৈবাল। পুরনো কথা ভাবতে ভাবতে সে চানঘরে অনেকটা সময় কাটিয়েছে। তাকে দেখে সুধা বলল—টেবিলে ব্রেকফাস্ট রেডি করেছি। শৈবাল বলল, হ্যাঁ যাচ্ছি। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে শৈবালের মনে হল, এটা তার দ্বিতীয় সংসার। ভাবতেই তার হাসি পেল। সুধার নজর এড়াল না শৈবালের হাসি। সে জিজ্ঞেস করল—হাসছ যে বড়?

শৈবাল বলল—এমনি।......কিছু কথা মনে পড়ল বলে.......।

৭

তমাল এখন অপরেশ লাহিড়ির কাছে পড়তে যাচ্ছে। আজ রবিবার। অপরেশ বাড়ি থাকবেন। প্রত্যেক সপ্তাহে রবিবার সকালের দিকে তমাল অপরেশ-স্যারের কাছে পড়তে যায়। ইংরেজি পড়ে। অঙ্কটাও দেখে নেয়। অপরেশ ঐ দুটো বিষয়ে অত্যন্ত ভাল শিক্ষক। যদিও তিনি নীতিগতভাবে প্রাইভেট টিউশন করেন না। বাড়িতে কোচিং-ও বসাননি। তমাল যে স্কুলে পড়াশোনা করেছে, অপরেশ সেখানকারই অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার। তমালকে তিনি ছাত্র হিসেবে বেশ পছন্দ করতেন। যদিও তমাল ছাত্র হিসেবে খুব উঁচুদরের কিছু ছিল না। ক্লাশ টেন-এ উঠে সে বিজ্ঞান বিভাগে পড়তে পারেনি। কারণ, অঙ্কে তার নম্বর আশানুরূপ ছিল না। কলাবিভাগের ছাত্র হয়ে গিয়েছিল তমাল। সে সাধারণ মানের একজন স্নাতক। আজকাল চাকরির বাজারে সাধারণ স্নাতকের কোনও দর নেই। টেকনিক্যাল লাইন ছাড়া চাকরি কোথায়? অনেক ভেবে এবং বাবার সঙ্গে আলোচনা করে তমাল ঠিক করেছে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের আয়োজনে যেসব প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা হয় তাতে সে বসবে। এছাড়াও শৈবাল তাকে পরামর্শ দিয়েছে ব্যাঙ্কের চাকরির জন্যে ব্যাঙ্কিং-সার্ভিস আয়োজিত পরীক্ষাতেও বসতে। এবারে তমাল উঠে পড়ে লেগেছে। যে কোনও উপায়ে একটা ভদ্রস্থ চাকরি তাকে জোগাড় করতেই হবে। সময় চলে যাচ্ছে। বয়স বেড়ে যাচ্ছে। বেকার বাড়িতে বসে থাকতে তার খুবই খারাপ লাগে। যাহোক একটা চাকরি জুটিয়ে নিতে পারলে সে বেশ নিজের মতো করে জীবনটাকে গুছিয়ে নিতে পারবে।

চাকরির জন্যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় যে দুটি বিষয়ের ওপর সব থেকে গুরুত্ব দিতে হবে সেগুলো হ'ল, সাধারণ অঙ্ক আর ইংরেজি। এই দুটো বিষয়ে তমাল যথেষ্ট দুর্বল। শৈবাল তাকে পরামর্শ দিয়েছিল ঐ দুটো বিষয় পড়ার জন্যে কোনও কোচিং-এ

ভর্তি হতে। পরীক্ষায় যদি বসতেই হয়, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ যদি করতেই হয় তাহলে একেবারে পেশাদারী মনোভাব নিয়েই তা করা উচিত। সাধারণ কেরানির চাকরির জন্যে আজকাল লাখ লাখ ছেলেমেয়ে পরীক্ষায় বসে। এই তো কিছুদিন আগে খবরের কাগজে দেখেছিল শৈবাল। কোনও এক সরকারি দপ্তরে মাত্র কুড়িটা পদে প্রার্থী নিয়োগের জন্যে খবরের কাগজে যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল; তার উত্তরে দরখাস্ত জমা পড়েছিল প্রায় দু-লাখ। ফলে আতঙ্কিত হ'য়ে ঐ দপ্তর নিয়োগ আপাতত স্থগিত রেখেছে।

বাস্তবে অবস্থাটা যখন এরকম তখন বুঝে নিতে হবে যে, সামান্য কেরানির চাকরির জন্যেও প্রার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা খুব জোরদার হবে এবং সেক্ষেত্রে অঙ্ক এবং ইংরেজির মতো দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে খুব বেশি নম্বর তুলতে না পাবলে কোনও চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা তেমন নেই। সেই কথা মাথায় রেখেই শৈবাল ছেলেকে পরামর্শ দিয়েছিল কাছাকাছি কোনও কোচিং-এ ভর্তি হয়ে যেতে। এমন কোনও কোচিং যেখানে অঙ্ক এবং ইংরেজি এই দুটো বিষয়েই বেশ উঁচু মানের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। কোচিং ঠিক পাড়াতে না হ'লেও একটু দূরে আছে। বাসে উঠলে দুটো স্টপ। দু-বেলা গাদাগাদা ছেলে-মেয়ে সেই কোচিং-এ পড়তে যায়। চাকরির জন্যে প্রতিযোগিতামূলক পবীক্ষায় যারা বসতে চায়, তারাই ঐ কোচিং-এর ছাত্রছাত্রী। কিন্তু তমালের ঠিক ইচ্ছে হয়নি ওরকম জায়গায় ভর্তি হতে। বরং তার মাথায় অন্য এক বুদ্ধি এসেছিল। সে ভেবেছিল অপরেশ-স্যারের কথা। একবার জিজ্ঞেস করে দেখবে অপরেশে-স্যারকে? উনি যদি অঙ্ক আর ইংরেজির বিষয়ে তমালকে একটু গাইড করেন; তাহলে আর কোনও দুশ্চিন্তা থাকবে না। চাকরির পরীক্ষায় সে ভালো করলেও করতে পারে। যদিও সে অনেকদিন আগে স্কুল ছেড়েছে। প্রায় বছর চারেক। অপরেশ-স্যাবের সঙ্গে তাব এখনও যোগাযোগ আছে। রাস্তায় কিংবা বাজার-দোকানে দেখা হলে তমাল স্যারের দিকে এগিয়ে যায়। জিজ্ঞেস করে—স্যার ভালো আছেন? তমালকে সঙ্গে সঙ্গেই চিনতে পারেন অপরেশ। কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞেস করেন—আরে তমাল যে? কী খবর? কেমন আছো?

—ভাল আছি স্যার। তমাল হেসে বলে।

—সে তো বটেই। ভালই তো থাকবে। খারাপ থাকবে কেন? সবসময় নিজের ওপর আত্মবিশ্বাস রাখবে।... তুমি এখন কী করছ বেশ?

—বেকার স্যার। অর্ডিনারি গ্র্যাজুয়েট। বাড়িতে বসে আছি।

—বাড়িতে বসে থাকবে কেন? কমপিটিটিভ পরীক্ষা-টরীক্ষা গুলোতে বোসো। তুমি তো খারাপ ছেলে নও। কিছু একটা চাকরি তোমার হয়ে যাবে। তবে ফাইট করতে হবে তমাল! আজকাল এমনি এমনি কিছু হবে না।

—হ্যাঁ। স্যার, জানি। —তমাল বলে স্যারকে।

ভদ্রস্থ একটা চাকরি জুটিয়ে নেবার জন্যে শৈবাল যখন ছেলেকে প্রায় প্রতিদিনই,

যাকে বলে উঠতে বসতে অনুপ্রাণিত করছিল; তখন তমালেরও চেপে গেল জিদ। সত্যিই তার আন্তরিকভাবে চেষ্টা করা উচিত। তার বয়স বেড়ে যাচ্ছে। চাকরির জন্যে নির্দিষ্ট পরীক্ষাগুলোতে সত্যিই তার বসা উচিত। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে অ্যাপ্লিকেশন ঠুকে দিল তমাল। চাকরিটা এমন কিছু বলার মতো নয়। নিতান্তই কেরানির চাকরি। কিন্তু কী আর করা যাবে? যে মাত্র একচল্লিশ শতাংশ নম্বর পেয়ে স্নাতক হয়েছে তার পক্ষে খুব বড় মাপের চাকরির আশা করা কি ঠিক? তমালের এ ব্যাপারে নিজের ওপর তেমন আত্মবিশ্বাস ছিল না। শৈবাল একদিন ছুটির দিন সকালবেলা ছেলেকে ডেকেছিল। তমাল এসে দাঁড়িয়েছিল বাবার সামনে।

জিজ্ঞেস করেছিল—কিছু বলছ?

—আজকের নিউজপেপারে ডব্লিউ. বি. সি. এস. পরীক্ষার বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে চোখে পড়েছে তোমার?

—হ্যাঁ দেখেছি।

—ফর্ম ফিল-আপ করে দাও। ঐ পরীক্ষাটা খারাপ নয়। নানা গ্রুপে অনেক রকম চাকরি আছে। যে কোনও একটা লেগে যেতে পারে।

—ওটা আমার পক্ষে একটু ডিফিকাল্ট পরীক্ষা বাবা।

—ডিফিকাল্ট? কী বলছ তুমি? আগে থেকেই এরকম ভাবার কী আছে? চেষ্টা তো করা উচিত।

—আমি পি. এস. সি.-র ক্লার্কশিপ পরীক্ষাতেই বসতে চাই। ডব্লিউ. বি. সি. এস. বোধহয় পারব না। ওটা ভাল ছেলেদের জন্যে।

—এই তোমার এক দোষ। হারার আগেই হেরে বসে আছো।

—আপাতত আমি পি. এস. সি.-র পরীক্ষাতেই বসব। অ্যাপ্লিকেশন করে দিয়েছি।

—যা ভালো বোঝো করো। আমার কথা যখন শুনবে না.....।

একদিন সন্ধের দিকে তমাল চলে গিয়েছিল অপরেশ-স্যারের বাড়ি। অপরেশ বাড়িতেই ছিলেন। তাঁর ছোট ফ্যামিলি। স্ত্রী, ছেলে আর তিনি নিজে। ছেলের ব্রিলিয়ান্ট কেরিয়ার। ডাক্তারি পড়ছে। মেডিক্যাল কলেজে থার্ড ইয়ার চলছে। ডোর-বেল বাজলে দরজা নিজেই খুলেছিলেন অপরেশ। একটু যেন অবাকই হয়েছিলেন তমালকে দেখে।

—কী ব্যাপার তমাল? কিছু বলবে?

—একটু কথা ছিল স্যার।..... পাঁচ মিনিটের ব্যাপার.....

—আরে এসো এসো। সব ব্যাপারে অত সঙ্কোচ করো কেন? অপরেশের বাইরের ঘর বেশ সাজানো। আসবাবপত্র তেমন বেশি কিছু নেই। একটা সোফা। সেন্টার-টেবিল। লম্বাটে ঘরের এক কোণে একটা ছোট লেখার টেবিল। কাঠের চেয়ার একটা। ঘরের চারপাশে দেয়ালের সঙ্গে আঁটা কাঠের ব্যাকে অনেক বই। অপরেশ বেশ পড়ুয়া মানুষ। মাঝে মাঝে পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে থাকেন। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং সামাজিক অবস্থান,—এটাই হ'ল মূলত তাঁর লেখালেখির বিষয়। একসময়, মানে,

বছর তিন আগেও অপরেশ বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। রাজনৈতিক দলের সদস্য ছিলেন। হঠাৎ তিনি নিজেকে রাজনীতি থেকে সরিয়ে নেন। তার কিছু কারণও আছে। তমাল জানে। সেই সময়টাতে সে কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র। তার কিছু বন্ধু ছিল যারা কলেজে ছাত্র-রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিল। তাদেরই কারো মুখে তমাল অপরেশের রাজনীতি ছেড়ে দেওয়াব কারণটা জানে। সে নিজেও তখন যোগাযোগ রাখত অপরেশের সঙ্গে। অপরেশ তাঁকে কিছু কিছু কথা বলেছিলেন। সে সব মনে আছে তমালের।

তমাল বসেছে সোফায়। অপরেশ কিছু একটা লেখালেখির কাজ করছিলেন। ছোট টেবিলটাতে খাতা খোলা। কলমও খোলা অবস্থায় ছিল। অপরেশ বল-পয়েন্ট কলমে লেখেন না। তিনি লেখেন ঝরনা কলমে। আজকাল ঝরনা কলমে কেউ কি তেমন লেখে? তমালও লেখালেখির কাজ যা কিছু করে বল-পয়েন্ট কলমে। অপরেশ ধীরেসুস্থে কলমের খাপ বন্ধ করেছিলেন। নিজে বসেছিলেন চেয়ারে।

জিজ্ঞেস করেছিলেন—তার পর? কী বলবে যেন তমাল?

—স্যার, আমি একটা অনুরোধ নিয়ে এসেছি।

—অনুরোধ? কী ব্যাপার গো?

—স্যার আমি এবার পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ক্লার্কশিপ পরীক্ষাতে বসব.....।

—বাহ ভালো কথা!

—আমাকে একটু সাহায্য করতে হবে স্যার?

—সাহায্য?.....কপাল কুঁচকে গিয়েছিল অপরেশের। কিছু ভেবেছিলেন তিনি কিছুক্ষণ। তারপর বলেছিলেন—কী ধরনের সাহায্য চাই তোমার?

—আপনি জানেন স্যার আমি অঙ্ক আর ইংরেজি দুটোতেই বেশ উইক.....?

অপরেশ তাকিয়ে ছিলেন। তমালের মুখের দিকে। কিছু বললেন না।

—ওই দুটো সাবজেক্টে আপনি আমাকে একটু গাইড করতে পারবেন স্যার?

—গাইড?.....আমার সময় কোথায় গো তমাল? স্কুলে টুয়েলভ ক্লাসের ছেলেদের কোচিং করতে হয়। হপ্তায় তিনদিন। এ ছাড়া বোর্ডের খাতা দেখা আছে।

তমাল জানে, অপরেশ-স্যার স্কুলের যে কোচিং-এর কথা বললেন সেখানে ছাত্রদের কোনও মাইনে দিতে হয় না। স্কুল থেকেই তা পরিচালনা করা হয়। বারো ক্লাশের কিছু ছাত্রকে বেছে নেওয়া হয় স্কুলের কোচিং-এর জন্যে। যাদের উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় খুব ভালো রেজাল্ট করবার সম্ভাবনা আছে তাদেরই বেছে নেওয়া হয়।

—সপ্তাহে অন্তত একদিন এক-দেড় ঘন্টা সময় দিতে পারবেন না স্যার? মাত্র কয়েক মাস। এটা এপ্রিল মাস। আমার পরীক্ষা সেপ্টেম্বরে। আপনার গাইডেন্স পেলে ঐ দুটো সাবজেক্টে আমি ভালো মার্কস পেতে পারি। সেরকম হ'লে কমপিটিশনে আমি টিঁকে যাব।

অপরেশ মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন তমালের কথা। আর ভাবছিলেন। তারপর

একসময় বললেন—ছাত্র হিসেবে আমি তোমাকে পছন্দ করতাম। এটা আমার মনে আছে তমাল। তুমি যখন এসে এভাবে আমাকে অনুরোধ করছ তখন তো আমাকে অন্যরকম ভাবতেই হয়। কিন্তু আমার সময়টা কোথায় সেটাই ভাবছি।

—স্যার সপ্তাহে অন্তত একদিন হলেও চলবে। শুধু ম্যাথস্ আর ইংরেজি এই দুটো সাবজেক্ট।.....আপনি জানেন স্যার আমি খুব অর্ডিনারি ছাত্র। বাবা বলছেন বি. সি. এস. পরীক্ষায় বসতে। কিন্তু ঐ চাকরির জন্যে অনেক কমপিটিশন। আমার মনে হয় না ঐ পরীক্ষায় আমি সুবিধে করতে পারব। তাই সাধারণ কেরানির চাকরির জন্যে পরীক্ষায় বসব ঠিক করেছি। ম্যাথস্ আর ইংরেজি আপনার কাছে একটু দেখে নিলে আমি চাকরিটা পেয়ে যাব মনে হয়।

—আচ্ছা। ঠিক আছে। তুমি যখন এভাবে বলছ....। তোমার পরীক্ষা কবে বেশ?

—সেপ্টেম্বর নাগাদ ঐ পরীক্ষা হয় স্যার।

—এটা এপ্রিল মাস। তার মানে প্রায় ছ মাসই হাতে আছে। বেশ.....অপরেশ থেমে গেলেন। ভাবলেন আবার। তারপর বললেন—রবিবার সকালেব দিকে তুমি আসতে পারবে?

—পারব স্যার? কখন আসতে হবে?

—দশটা নাগাদ।

—হ্যাঁ স্যার। পারব।

—ঠিক আছে। আজ বুধবার। তুমি তাহ'লে আগামী রবিবার থেকেই আসতে পার।

তমাল সেরকমই যায় অপরেশের বাড়িতে। প্রতি রবিবার সকাল দশটায়। দু-মাস হ'ল সে অপরেশের কাছে ইংরেজি আর অঙ্কে কিছুটা লেসন নেয়। অপরেশের পড়ানোর টেকনিক দারুণ। তিনি যা করেন নিষ্ঠার সঙ্গেই করেন। ইতিমধ্যেই তিনি নিজে থেকেই পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ব্যবস্থাপনায় ক্লারিক্যাল সার্ভিস-সংক্রান্ত সাজেশানস জোগাড় করেছেন। তমালকে তিনি অনেক টাস্ক দেন। তমাল সারা সপ্তাহ ধরে সেসব টাস্ক করে। রবিবার অপরেশের কাছে টাস্কের খাতা জমা দেয়। যেভাবে চলছে তাতে তমালের আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে আছে। পরীক্ষায় সফল প্রার্থীদের প্যানেলে তার নাম প্রথম দিকেই থাকবে। এটাই সে আশা করছে। চাকরিটা তাকে পেতেই হবে।

অপরেশের বাড়িতে পৌঁছে ডোরবেল বাজাল তমাল। এই বাড়িতে আজ কারা এসেছে? ঠিক দরজার সামনে দুটো স্কুটার এবং একটা সাইকেল। রবিবারের সকালে নানা লোকজন আসতেই পারে। তবে অপরেশ খুব একটা যে লোকজনের সঙ্গে মেলামেশ করেন তা নয়। একসময় করতেন। যখন রাজনীতি করতেন অপরেশ কিন্তু আজ বছর দুই হ'ল অপরেশ রাজনীতির সঙ্গে যাবতীয় সংস্রব ত্যাগ করেছেন যে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন, সেই দলের লোকেরাই তাঁকে খুব অপমান করেছিল। কেন অপমান করেছিল তা তমাল কিছুটা জানে। তখন সে কলেজের

প্রথম বর্ষের ছাত্র। এই মানুষটির বাড়িতে প্রায়ই যেত তমাল। যেতে ভালো লাগত। তাই যেত। তমালকে নানা বইপত্র পড়তে দিতেন অপরেশ। বেশিরভাগই সাহিত্য। অপরেশ তখন খুব উৎসাহ দিতেন তমালকে নানাধরনের বই পড়ার ব্যাপারে। কিছু বইয়ের নাম আজও তমালের মনে আছে। বেশির ভাগ অবশ্য বিদেশি লেখকের বই। বাংলা ভাষায় অনূদিত বই। যেমন—'দুনিয়া কাঁপানো দশ দিন'। রাশিয়ায় জারতন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লেনিনের নেতৃত্বে কমিউনিস্টদের অভ্যুত্থান হয়েছিল। সেই বিষয়ে দারুণ একটা বই। তারপর ম্যাক্সিম গোর্কির এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প-উপন্যাস তমাল পড়েছিল অপরেশের কাছ থেকে বইগুলো পেয়ে। তখন অপরেশ স্থানীয় এলাকার একজন বুদ্ধিজীবী এবং নেতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। প্রায়ই মাঠে, ময়দানে রাজনৈতিক দলের সভায় বক্তৃতা করতেন অপরেশ। অপরেশ যে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তমাল সেই দলেব সমর্থক ছিল না। কোনও রাজনৈতিক দলের সমর্থকই সে সময় ছিল না। এখনও নয়। তবুও একমাত্র অপরেশের বক্তৃতা শুনতেই সে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকত। সত্যিই অসাধারণ বক্তা ছিলেন অপরেশ। তমালের অন্তত খুবই ভালো লাগত। সে লক্ষ্য করত বক্তৃতার শেষে অপরেশ হাততালিও পেতেন খুব। তাবপর কী যে হল! অপরেশ নিজের রাজনৈতিক দলের কাছেই চক্ষুশূল হয়ে উঠলেন একদিন। দল তাঁকে এড়িয়ে যেতে লাগল। তাঁর গুরুত্ব কমে গেল দলে। তিনি সমর্থকদের কাছে একবার প্রকাশ্য জনসভায় অপমানিত হলেন। বড় তীব্র ছিল সেই অপমান। তারপর অপরেশ নিজেই একদিন চুপচাপ হয়ে গেলেন। অনেকের মতো তমালও জেনেছিল তিনি রাজনীতি থেকে সরে এসেছেন। একা হয়ে গেলেন অপরেশ। প্রকাশ্য জনসভায় তাঁকে আর দেখা যেত না। তাঁর অপূর্ব বক্তৃতা থেকে বঞ্চিত রইল তমাল। তখনও মাঝে মঝে তমাল অপরেশের বাড়িতে আসত। তমালকে অনেক কথা বলতেন অপরেশ। নিজের ক্ষোভের কথা। অপমানের কথা। দুঃখের কথা।

অন্যদিন ডোরবেল বাজিয়ে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয় না। দরজা খুলে যায়। কোনওদিন অপরেশ দরজা খোলেন। কোনওদিন তাঁর স্ত্রী। কিন্তু আজ এতক্ষণ দাঁড়াতে হচ্ছে কেন? স্যারের কাছে কারা এসেছে? কিছু লোকজন এসেছে সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে। নিশ্চয়ই কোনও আলোচনা চলছে। কী ব্যাপারে আলোচনা?..... দরজা খুলে গেল। অপরেশের স্ত্রী। তমালকে দেখে একটু যেন অপ্রস্তুত হলেন। —তুমি এসেছ? আজ কি উনি পড়াতে পারবেন? কয়েকজন এসেছেন।..... কথাবার্তা বলছেন।

—তা হ'লে কি আমি খানিক বাদে আসব?

—বাদে আসবে?.... আচ্ছা দাঁড়াও ওঁকে জিজ্ঞেস করি। মহিলা ভেতরে চলে গেলেন। দরজা ঈষৎ ফাঁক রেখে। অন্যদিন তমালকে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় না। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই সে বাড়ির ভেতরে যেতে পারে। কিন্তু আজ সমস্ত ব্যাপারটা কীরকম খাপছাড়া লাগছে। কারা এসেছে অপরেশের কাছে? যারা এসেছে

তারা যে বেশ গুরুত্বপূর্ণ তা তো বুঝতেই পারছে তমাল। অপরেশের স্ত্রী ফিরে এলেন।

—স্যার মনে হচ্ছে আজ খুব ব্যস্ত? জিজ্ঞেস করল তমাল।

—হ্যাঁ। একটু ব্যস্তই। —ক্ষীণ হাসলেন মহিলা।

—ওঁর সঙ্গে একবার অন্তত দেখা হবে না?

—আসলে কয়েকজন এসেছেন।..... ঘরের দরজা বন্ধ করে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করছেন উনি। তুমি এসেছ শুনে বললেন—

—কী বললেন স্যার?

—বললেন যে আজ উনি তোমাকে সময় দিতে পারবেন না। তুমি যদি পরের রবিবার আসতে পার ভালো হয়।.... অবশ্য একটা কাজ তুমি করতে পার..... সেটা উনি বললেন.....।,

—কী?

—তোমার টাস্কের খাতাটা আমাকে দিয়ে যেতে পার। উনি দেখে রাখবেন। দু-তিন দিন পরে এসে খাতাটা নিয়ে গেলেও চলবে।

—আচ্ছা তাই করি। —কাঁধের ঝোলা-ব্যাগ থেকে তমাল দুটো খাতা বের করল। একটা ইংরেজির খাতা। আর একটা অঙ্কের। অপরেশের স্ত্রী খাতাদুটো নিলেন।

—আমি এখন আসি তাহলে?

—হ্যাঁ। —দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

চিন্তিতভাবে তমাল হাঁটছিল। আজ সকালে কারা এসে হাজির হয়েছে অপরেশের কাছে? দুটি স্কুটারে। আর সাইকেলে। তারা কী এমন গুরুত্বপূর্ণ লোক যে অপরেশ ঘরের দরজা বন্ধ করে তাদের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছেন? স্যার একবার দরজার কাছে এসে নিজেই তমালকে কথাগুলো বলে যেতে পারলেন না? তমালের অভিমান হচ্ছিল। শুধু অভিমান কেন? কৌতূহলও হচ্ছিল। খুব জানতে ইচ্ছে করছিল কারা এসেছে অপরেশের বাড়িতে। কীভাবে জানা যায়? অপরেশের বাড়ির গলি শেষ হয়ে বড়রাস্তা। গলির মুখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবে তমাল? অপরেশের বাড়িতে যারা এসেছে তারা গলি থেকে বেরিয়ে এই রাস্তাতেই তো আসবে। তখন তো তমাল দেখে নিতে পারে কারা এসেছিল অপরেশের বাড়িতে? কিন্তু সেরকম করা কী খুব ভালো কাজ হবে? এ যেন গোয়েন্দাগিরি করা। শুধু শুধু গোয়েন্দাগিরি করতে যবে কেন তমাল? তা ছাড়া এরকম যদি হয়? গলির মুখ পর্যন্ত অপরেশ নিজেই এলেন লোকগুলোকে পৌঁছে দিতে। তখন তমালকে গলির মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তিনি বেশ অবাক হয়ে যেতে পারেন। সন্দেহও করতে পারেন। সুতরাং এরকম কাজ করা ঠিক হবে না। আজ সকালটা তার নষ্টই হল। অপরেশ প্রতি রবিবার প্রায় ঘন্টা দুই তমালকে পড়ান। তাঁর কাছে দুটো বিষয়ে পড়তে এসে তার যে বেশ উন্নতি হচ্ছে এটা তমাল অনুভব করছে। ফলে নিজের ওপর তার আত্মবিশ্বাসও বাড়ছে। এই আত্মবিশ্বাসটাই দরকার। অপরেশও যেটা প্রায় বলেন। নিজের ওপর বিশ্বাস রাখো

তাহলে সাকসেসফুল তুমি হবেই। নিজের ওপর বিশ্বাস ক্রমশ বাড়ছে তমালের। যেভাবে পড়াশোনা এগোচ্ছে মনে হচ্ছে সে চাকরিটা পেয়ে যাবে। তমাল বাড়ির রাস্তা ধরল।.....

৮

ছাত্রবয়স থেকেই অপরেশ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। কলকাতার রাস্তায় মিছিলে হেঁটেছেন কত। আজকের বিখ্যাত অনেক রাজনীতিবিদকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন। অনেক মানুষকে একসঙ্গে নিয়ে চলার ব্যাপারে অপরেশের এক ধরনের সহজাত দক্ষতা আছে। রাজনীতি করতে হলে যা খুবই দরকার। নিয়মিত পড়াশোনা করতেন বলে কথাবার্তা বলতে পারেন ভাল। বক্তৃতার ক্ষমতাও অপরেশের আছে। সে কারণেই ছাত্র বয়স থেকে অপরেশ নেতৃত্ব দিতে অভ্যস্ত।

পূর্ববঙ্গের খুলনা জেলা থেকে যখন তাঁরা এ বাংলায় আসেন তখন অপরেশের বয়স মাত্র পাঁচ বছর। ছিন্নমূল উদ্বাস্তু হয়ে এদেশে আসা, বাসস্থানের অভাবে রাতের পর রাত শিয়ালদা স্টেশনে কাটানো;—সেইসব বিভীষিকার দিনগুলো অপরেশের কিছু কিছু মনে পড়ে। সবটা মনে পড়ে না। জলছবির মতন অস্পষ্ট হয়ে আছে সেইসব দুঃখের দিনের স্মৃতি। অপরেশরা দু-ভাই। তাঁদের কোনও দিদি কিংবা বোন ছিল না। বাবা ছিলেন খুলনাতেই হাইস্কুলের শিক্ষক। ওপারে ওদের অবস্থা বেশ ভাল ছিল। শিক্ষক হিসাবে অপরেশের বাবা শিবতোষের ভাবমূর্তি খুব উজ্জ্বল ছিল এলাকায়। তাঁর বিষয় ছিল অঙ্ক। স্ত্রী বিনতা এবং দু ছেলেকে নিয়ে শিবতোষ সুখে এবং সচ্ছলতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন। তার পর তাঁদের নিশ্চিন্ত জীবনে নেমে এসেছিল দেশভাগের চরম আঘাত।

প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিতে ওদের বেশ কষ্ট হয়েছিল। অসংখ্য ছিন্নমূল মানুষের সঙ্গে একটা কলকাতামুখী ট্রেনে শিবতোষ স্ত্রী এবং দু-ছেলেকে নিয়ে কোনওরকমে উঠে পড়েছিলেন প্রাণে বাঁচতে। অপরেশের এখনও মনে পড়ে, মাঝরাতে ঘুমচোখে তাঁকে হাঁটতে হচ্ছিল রাস্তা দিয়ে। বাবার হাত ধরে। পেছনে দাদা আর মা। দাদা সমরেশ তার থেকে প্রায় আট বছরের বড়। সেদিন সেই নিশুত রাতে রাস্তায় তাঁরা একা ছিলেন না। আরও অনেক মানুষ হাঁটছিল তাঁদের সঙ্গে। প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য কোনওরকমে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছনো। কারণ সেদিন রাতেই অপরেশদের পাশের গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছিল দাঙ্গাকারীরা। অবাধে করেছিল লুঠপাট। পুরুষদের সামনে পেয়ে তরোয়ালের দিয়ে যাকে পেরেছিল কচুকাটা করেছিল। আর মেয়েদের নির্বিচারে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়েছিল ঝোপের আড়ালে। রাতেই সেই খবর দাবানলের মতো ধেয়ে এসেছিল অপরেশদের গ্রামে। তা শুনে শিবতোষ আর কোনও ঝুঁকি নিতে চাননি। জমি,

ভিটেবাড়ি, পুকুর, দীর্ঘদিন ধরে তিল তিল করে গড়ে তোলা আদর্শ শিক্ষকের ভাবমূর্তি, তাঁর বড় সাধের ইস্কুল;—সব কিছু নিমেষের মধ্যে ত্যাগ করে নিজেকে এবং পরিবারের সবাইকে দাঙ্গাকারীদের নিষ্ঠুর এবং নির্মম রোষ থেকে বাঁচাতে পথে নেমে পড়েছিলেন।

মানুষ যদি প্রকৃতই ভাল হয়, ভাগ্যও বোধহয় একসময় সহায় হয় তার। রাতারাতি উদ্বাস্তু বনে যাওয়া শিবতোষ যখন শিয়ালদা স্টেশনের প্লাটফর্মে দু-দিন কাটিয়েছেন, অসহ্য এক নারকীয় পরিবেশে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তাঁর স্ত্রী বিনতা, এরকম দুঃসময়ে বড় বিচিত্রভাবে ভাগ্য সহায় হয়েছিল তাঁদের। সত্যিই সে এক চমকপ্রদ গল্প!

স্ত্রী আর ছেলেদের শিয়ালদা স্টেশনে রেখে শিবতোষ কলকাতা শহরের অচেনা অরণ্যে বেরিয়েছিলেন কোনও কাজ এবং বাসস্থানের খোঁজে! যদিও হঠাৎ কয়েক ঘন্টার মধ্যে যাবতীয় ভূ-সম্পত্তি ফেলে রেখে দেশ ছাড়তে হয়েছিল তাঁকে; কিন্তু একেবারে কর্পদকহীন যে এসেছিলেন তা বলা যাবে না। পাঞ্জাবির পকেটে নিয়ে আসতে পেরেছিলেন তিন হাজার টাকা। উনিশশ' বাহান্ন সালে তিন হাজার টাকার মূল্য অনেক ছিল। শিবতোষ ঘুরছিলেন রাস্তায় একটা ভদ্রগোছের বাসস্থান যদি পাওয়া যায়। যে টাকা তাঁর সঙ্গে ছিল, তা দিয়ে কয়েক মাস চালিয়ে দেওয়া সম্ভব। তার মধ্যে যাহোক একটা চাকরি কি জুটিয়ে নিতে পারবেন না? ওপারে যখন দাঙ্গা সবে শুরু হয়েছে, তখনই সিঁদুরে মেঘ অনুমান করে তাঁর পরিচিত অনেকেই বাড়িঘর ছেড়ে কলকাতা শহরে এসে জুটেছিল। শিবতোষের কাছে খবর ছিল, প্রথমে কিছুদিন অসুবিধে হলেও পরে তারা এই শহরের আশেপাশে কিংবা শহরতলিতে কোথাও না কোথাও যাহোক আস্তানা জুটিয়ে নিতে পেরেছে। মার্চেন্ট অফিসে কিংবা ইস্কুলে চাকরিও জুটে গিয়েছে তাদের। এসব খবর খুলনার গ্রামে বসেই পেয়েছিলেন শিবতোষ। সুতরাং এত বড় শহরে তাঁরও কি কিছু একটা জুটবে না? ভদ্রস্থ একটা চাকরি। স্ত্রী এবং ছেলেদের নিয়ে নির্বিঘ্নে কাটাতে পারবেন এরকম একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই। কিন্তু সেইসব চেনা লোকেরা সব গেল কোথায়? তাদের কারোর সঙ্গে যদি দেখা হয়ে যেত শিবতোষের! দুদিন ধরে শিবতোষ এলোমেলো শুধু শহরের রাস্তায় ঘুরেই মরছিলেন। সামান্য একটা ভাড়া বাড়িও জোগাড় করতে পারেননি। চাকরি তো দূর অস্ত। পরপর কয়েক রাত রাস্তায় কাটিয়ে তাঁর স্ত্রী রীতিমতো অসুস্থ। মাদুর এবং কাঁথা বিছিয়ে স্টেশনের প্লাটফর্মেই তাঁকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। সরকারি ডাক্তার এই স্টেশনে জমে থাকা উদ্বাস্তুদের একবার দেখতে এসেছিল বটে। শিবতোষের স্ত্রী বিনতাকেও দেখে গিয়েছিল। কিন্তু সেই দেখার মধ্যে কোনও আন্তরিকতা ছিল না। নেহাতই কয়েকটা ট্যাবলেট দিয়ে চলে গিয়েছিল ডাক্তার। ঐ একই ধরনের ট্যাবলেট সে প্রায় প্রত্যেক উদ্বাস্তুকেই দিয়ে যাচ্ছিল। ওপার থেকে আসা ছিন্নমূল এই উদ্বাস্তুদের মধ্যে কেউ যেন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পঞ্চত্ব প্রাপ্তি না হয় সে জন্যেই সরকার ডাক্তার পাঠিয়েছিল সকালে এবং রাতে শিয়ালদা স্টেশনেই নেহাতই নিয়ম রক্ষের ব্যাপার। রুটিন-চেক-আপ। সরকারি ডাক্তারের বিলনো সেই ট্যাবলেট খেয়ে বিনতা খুব একটা সুস্থ হয়ে উঠেছেন এরকম মনে হয়নি শিবতোষের।

গ্রীষ্মের খর দুপুর। আকাশে সূর্যের আগুন-চোখ। মাঝে মাঝে দমকা বাতাস দিচ্ছিল। সেই বাতাসে রাস্তার ধুলো চোখে, মুখে, নাকে এসে ঝাপটা মারছিল। দিশাহারা শিবতোষ এলোমেলোভাবে ঘুরছিলেন রাস্তায়। কোথায় যাবেন, কী করবেন কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। ঘুরতে ঘুরতে একটা দোতলা বাড়িতে দেখেছিলেন ইংরেজিতে 'টু লেট' লেখা একটা বোর্ড ঝুলছে। মহা উৎসাহিত হয়ে শিবতোষ বাড়িটার কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠে গিয়েছিলেন দোতলায়। বাড়ির ভেতরটা কীরকম অন্ধকার এবং স্যাঁতসেঁতে। শুধুমাত্র দোতলাতে উঠেই তাঁর মনে হয়েছিল, এখানে কি কোনও পরিবারের ঘরবাড়ি আছে? দেখেছিলেন সারি সারি কয়েকটা দোকানঘর। দোতলার প্রশস্ত দালানে তাঁকে অনিশ্চিতভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখে একজন অবাঙালি লোক হিন্দিতে জিজ্ঞেস করেছিল শিবতোষকে যে তিনি কী কাউকে খুঁজছেন? শিবতোষ হিন্দি জানতেন না। বাংলাতেই তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন যে বাইরে 'টু লেট' লেখা একটা বোর্ড ঝুলছে। এখানে কোনও ঘরভাড়া পাওয়া যাবে কী না। লোকটা বুঝেছিল শিবতোষ বাসস্থান খুঁজছেন। সে জানিয়েছিল যে, সেই বিল্ডিং-এ অফিসের জন্যে ঘর পাওয়া যেতে পারে। থাকবার জন্যে কোনও ঘর পাওয়া যাবে না। হতাশ হয়ে শিবতোষ আবার রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিলেন। পথশ্রমে, ক্লান্তিতে তিনি অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেন। তেষ্টায় বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছিল। রাস্তার একপাশে কর্পোরেশনের কল থেকে জল খেয়ে তৃষ্ণা মেটাচ্ছিলেন তিনি, সেই সময়ে কে যেন তাঁকে নাম ধরে ডেকেছিল.....

—মাস্টারমশাই না? —শিবতোষ ঘুরে তাকিয়েছিলেন। সাদা প্যান্ট, কালো কোট, টাই, মাঝারি উচ্চতা, গায়ের রং শ্যামবর্ণ, মাথার চুল পাট করে আঁচড়ানো, নাকের নীচে বুরুশ গোঁফ, হাতে ফোলিও ব্যাগ; লোকটাকে প্রথমে ঠিক চিনতে পারেন নি শিবতোষ। জল খাওয়া হয়ে গিয়েছিল তাঁর। পাঞ্জাবির পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছে লোকটাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—আপনি কি মশাই আমাকে বলছেন?

—স্যার আমাকে চিনতে পারছেন না? আমি গোবিন্দ.....বসাক।

—গোবিন্দ?.....বসাক?.....আপনি.....তুমি কি ভুবন বসাক-এর ছেলে নাকি?

—এই তো। এবার স্যারের মনে পড়েছে।

সত্যিই মনে পড়েছিল শিবতোষের। ভুবনের ছেলে গোবিন্দ তাঁর ছাত্র ছিল। খুব য আহামরি কিছু ছাত্র ছিল তা নয়। তবে একেবারে খারাপও নয়। খুলনা কলেজ থকে স্নাতক হবার পর সে আইন পড়তে কলকাতায় চলে আসে। ভুবনেরও ছেলের চ্ছেয় সায় ছিল। কারণ, আসলে কলকাতায় তাদের একটা খুঁটির জোর ছিল। ভুবনের ছাটভাই গগন বসাক কলকাতার হাইকোর্টে বেশ পসার-ওলা উকিল। ভাইপো যদি কানওরকমে ওকালতিটা পাস করতে পারে তাহলে কাকার দৌলতে মক্কেলের অভাব ত হবে না। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সব মনে পড়েছিল শিবতোষের। মনে মনে

তিনি ক্ষীণ আশার আলোও দেখতে পাচ্ছিলেন। কলকাতা শহরে এসে পড়া অব্দি তাঁর মনে হচ্ছিল যেন এক গভীর অরণ্যে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। যেখানে জন্তু-জানোয়ারের বদলে কিলবিল করছে শুধু মানুষ। একজন চেনা মানুষের সঙ্গে অন্তত দেখা হয়েছিল শিবতোষের।

—তুমি কি এখন ওকালতি করছ বাবা? —পুরনো ছাত্রকে জিজ্ঞেস করেছিলেন শিবতোষ।

—হ্যাঁ স্যার। দু'বছর হল আমি হাই-কোর্টে প্র্যাকটিস করছি। ঐ চত্বরেই আমার একটা ছোট অফিসও আছে।

—বাহ বাহ! শুনে খুব খুশি হলুম.....

—আপনি কবে কলকাতায় এলেন স্যার? বাসা নিয়েছেন কোথায়? গোবিন্দর এই প্রশ্ন শিবতোষকে প্রথমে থমকে দিয়েছিল। নিজের, শুধু নিজের কেন, পরিবারের সকলের নিদারুণ দুরবস্থার কথা রাস্তার ফুটপাতে দাঁড়িয়েই বলেছিলেন শিবতোষ। ছাত্র হিসেবে গোবিন্দ যে মানেরই হোক না কেন, বয়স্ক শিক্ষকের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় সে দিয়েছিল ভালভাবেই।

প্রথমে শিবতোষরা গোবিন্দ বসাকের বাড়িতেই উঠেছিলেন। বিডন স্ট্রিট অঞ্চলে যে ভাড়াবাড়িতে থাকত গোবিন্দ এবং তার পরিবার; সেটা নেহাত ছোট বাড়ি ছিল না। নামমাত্র ভাড়ায় দোতলা বাড়ি। একতলাটা পুরো শিবতোষকে ছেড়ে দিয়েছিল গোবিন্দ। বলাই বাহুল্য, মাস্টারমশাইয়ের কাছ থেকে ভাড়া সে নেয়নি এক পয়সা। ভিটেমাটি সব চিরতরে হারিয়ে রাতারাতি উদ্বাস্তু হয়ে যাবার প্রাথমিক ধাক্কা ক্রমে সামলে উঠতে পেরেছিলেন শিবতোষ। ছাত্রের উদ্যোগেই শিবতোষ কর্পোরেশনের স্কুলে শিক্ষকতার চাকরি পেয়ে গিয়েছিলেন। অপরেশকে ভর্তি করা হয়েছিল স্কুলে তার দাদাকেও। তারপর ধীরে ধীরে নিজের পায়ের নীচে শক্ত মাটি পেয়ে গিয়েছিলেন শিবতোষ। আবার নতুন উদ্যমে তিনি ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন। বছরখানেক ছাত্রের বাড়িতে ঠাঁই নিতে হয়েছিল শিবতোষকে। তার পর একটু সামলে নিয়ে তিনি স্ত্রী এবং ছেলেদের নিয়ে কাছাকাছি এলাকায় একটা ভাড়া বাড়িতে উঠে গিয়েছিলেন।

তার পর অনেক বছর কাটল। বড় ছেলে চাকরি পেল ব্যাঙ্কে। অপরেশ হলেন শিক্ষক। বিয়ের পর বড় ছেলে আলাদা থাকা মনস্থির করল। অপরেশ থাকতেন বাবা মা-কে নিয়ে। অপরেশ মাস্টারি পাওয়ার পর শিবতোষ চাকরি থেকে অবসর নেবার ঠিক একবছর আগে নিজের বাড়ি সম্পূর্ণ করে ভাড়াটে হবার যন্ত্রণা থেকে চিরকালের মতো মুক্ত হলেন। এর পর অপরেশ বিয়ে করলেন। বিয়ের একবছর পর বাবাকে হারালেন হঠাৎই। এমন এক মৃত্যু হয়েছিল শিবতোষের যা বোধহয় সব মানুষের কাম্য। রাত্রে ঘুমের মধ্যে হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে যায়। সেই প্রথম আক্রমণ। সেই শেষ। আশ্চর্য্য! শিবতোষ বোধহয় বুঝতেও পারেননি তিনি মরে যাচ্ছেন। পরের দিন সকালে অনেক বেলা হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও শিবতোষ ঘুম থেকে না ওঠায় অপরেশই বাবাকে

মৃত হিসেবে প্রথম দেখেন। বাবার মৃত্যুর পর অপরেশের মা তাঁর সংসারেই ছিলেন। অপরেশের দাদা কয়েকবার বিনতাকে নিয়ে যেতে চেয়েছেন তাঁর সংসারে। কিন্তু বিনতা রাজি হননি। ছোট ছেলের কাছে থাকতেই তিনি স্বস্তি বোধ করতেন। অপরেশের স্ত্রীও অত্যন্ত ভাল স্বভাবের মহিলা। প্রাণ দিয়ে তিনি শাশুড়ির সেবা-যত্ন করতেন। দু-বছর হল প্রায় সাতাত্তর বছর বয়সে অপরেশের মা এই পৃথিবী ত্যাগ করেন।

অনেক প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে প্রাণপণ লড়াই করে জীবনে দাঁড়িয়েছেন অপরেশ। পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে রাজনীতিও করতে থাকেন ছাত্রবয়স থেকেই। বামপন্থী রাজনীতিতেই বরাবর আকৃষ্ট ছিলেন অপরেশ। তাঁর বিষয় ছিল মূলত অর্থনীতি। নিজের স্কুলে ক্লাস ইলেভেন ও টুয়েলভে তিনি কলা বিভাগের ছাত্রদের অর্থনীতি পড়ান। একটু নীচু শ্রেণি থেকে মাধ্যমিক স্তর অব্দি তিনি পড়ান ইংরেজি ও অঙ্ক। এই এলাকায় যাঁরা বামপন্থী রাজনীতি অনেক দিন ধরে করছেন তাঁদের মধ্যে কেউ যদি মার্কসবাদ কিছুটা বোঝেন, তিনি হচ্ছেন অপরেশ। অর্থনীতির ছাত্র বলেই দাস ক্যাপিটাল অপরেশ বহুদিন ধরে পড়েছেন। এই বিখ্যাত গ্রন্থটির অনেক অংশ, ইংরেজি অনুবাদে অপরেশ বারবার পড়েছেন। সময় পেলে এখনও পড়েন। তাঁর সেই পড়াশোনার ধার ঝল্সে ওঠে তাঁর কথাবার্তায়। এবং জনসভায় তাঁর বক্তৃতায়। নিজের যোগ্যতা অনুসারেই অপরেশ আঞ্চলিক পার্টিতে একজন তাত্ত্বিক নেতা হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। নিজের রাজনৈতিক দলের মুখপত্রে তিনি প্রায়ই রাজনীতির নানা জটিল বিষয়ে প্রবন্ধ লেখেন।

আজ তিনবছর হল, অপরেশ প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন। কয়েকটা বিতর্কিত বিষয়ে অপরেশের সঙ্গে তাঁর দলের বিরোধ চরমে উঠেছিল। সেই বিরোধের ফলশ্রুতি হিসেবে অপরেশকে অনেক অপমান সহ্য করতে হয়। নিজের দলের বিরুদ্ধে তিনি কোনও কাজ করেননি। অন্তত সে রকম কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তাই দল থেকে তিনি বহিষ্কৃত হন নি। কিন্তু নানাভাবে তাঁর ওপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করা হয়। স্থানীয় দলের নেতৃত্বে তাঁর জায়গা ছিল। রাতারাতি তাঁর সেই সম্মানজনক অবস্থান থেকে দল তাঁকে সরিয়ে দেয়। এ ছাড়া একবার প্রকাশ্য জনসভায় তাঁকে বিশ্রীভাবে হেনস্থা করা হয়। সেই জঘন্য ঘটনার পর থেকে অপরেশ তাঁর প্রিয় রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সব সম্পর্ক নিজেই ছিন্ন করেন।

নৈতিক মূল্যবোধকে বরাবর সবথেকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে এসেছেন অপরেশ। এ ব্যাপারে তাঁর উদাহরণ হলেন বাবা শিবতোষ। ছোটবেলা থেকে তিনি খুব কাছ থেকে বাবাকে দেখেছেন। প্রত্যক্ষ করেছেন দুঃখ-দুর্দশার ঝড় নিজের চওড়া কাঁধ দিয়ে কীভাবে সামলেছেন শিবতোষ। চরম আর্থিক কষ্টের মধ্যেও শিবতোষ একজন আদর্শ শিক্ষকের মূল্যবোধ আঁকড়ে ছিলেন। দেশভাগের পর যখন কলকাতায় চলে এলেন এবং ধীরে ধীরে গুছিয়ে নিচ্ছিলেন নিজের ছন্নছাড়া সংসার; তখন তাঁর যে টাকা-পয়সার খুব

প্রয়োজন ছিল সেটা তো অস্বীকার করা যাবে না। গোবিন্দ বসাক কর্পোরেশনের স্কুলে চাকরির সন্ধান দিয়েছিল এবং সেই চাকরি শিবতোষের হয়েও গেল। তখন কলকাতায় চাকরির এত আকাল ছিল না। কলকাতার আদি বাসিন্দারা বস্তুত চাকরি-বাকরিতে তেমন উৎসাহ পেত না। বাবু-কালচারের হাওয়া তখনও কলকাতায় রয়ে গেছে। আসলে দেশভাগের পর ওপার বাংলার মানুষ এপারে এসে অফিসে বা নানা বিদেশি কোম্পানিতে চাকরিতে বহাল হতে শুরু করে। কারণ, সেইসব ছিন্নমূল মানুষদের তখন যে ভাবে হোক মাথা গোঁজার ঠাঁই এবং অর্থনৈতিক নির্ভরতা দরকার ছিল। যাদের চাকরি করার মতো জ্ঞানবুদ্ধি এবং ইচ্ছে ছিল, তারা প্রায় বিনা আয়াসেই নানা ধরনের চাকরিতে বহাল হতে পেরেছিল।

শিবতোষের মতো একজন গুণী এবং প্রবীণ শিক্ষকের সে কারণেই মাধ্যমিক স্কুলে চাকরি পেতে অসুবিধে হয়নি। গোবিন্দ বসাক শুধু এক্ষেত্রে যোগাযোগটাই ঘটিয়ে দিয়েছিল। বাকি কৃতিত্ব সবই শিবতোষের এটা যদি বলা হয় তাহলে খুব একটা ভুল বলা হবে না। ছাত্রদের পড়াবার আশ্চর্য প্রতিভা ছিল শিবতোষের। কিছুদিনের মধ্যেই ভাল শিক্ষক হিসেবে তাঁর নাম স্কুলে বেশ চাউর হয়ে যায়। এর ফলে অন্য এক ধরনের সুযোগ এসে গিয়েছিল শিবতোষের সামনে। বেশি অর্থ উপার্জনের সুযোগ। সেই সুযোগ যে খুব একটা আপত্তিজনক তা বলা যাবে না।

বহু বছর আগেকার কথা। অপরেশের এখনও স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করে। একদিন সকালে তাঁদের বিডন স্ট্রিটের ভাড়া বাড়িতে গোবিন্দ বসাক এসে হাজির। সে একা ছিল না অবশ্য। সঙ্গে তিনজন ভদ্র মানুষ। অপরেশ আর তাঁর দাদা পড়াশোনা করছিলেন বাবার কাছেই। গোবিন্দকে আরও তিনজনের সঙ্গে বাড়িতে ঢুকতে দেখে শিবতোষ উঠে দাঁড়িয়ে তাদের অভিবাদন জানিয়েছিলেন। গোবিন্দকে দেখলেই তিনি আবেগে গদগদ হয়ে যেতেন। তার কারণও ছিল। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে গোবিন্দই তো শিবতোষকে নতুনভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর রাস্তার সন্ধান দিয়েছিল। গোবিন্দ বসাকের প্রতি তিনি সত্যিই আজীবন কৃতজ্ঞ ছিলেন। এবং সেই কৃতজ্ঞতার প্রকাশ প্রায়ই ঘটত তাঁর কথাবার্তায়।

—এসো গোবিন্দ, বসো বাবা।.....আপনারাও বসুন।

—সকালে চলে এলুম স্যার। বিরক্ত করলুম না তো?

—নাহ। বিরক্ত করবে কেন? তুমি আমার প্রতিবেশী। আমার জীবনে সবথেকে বড় উপকার তুমি করেছ বাবা। এ তো আমি ভুলব না।

—আহ কী যে বলেন স্যার? এক গ্রামে থাকতুম। আপনি আমাকে পড়িয়েছেন। ভিটেমাটি সব খুইয়ে আপনি সপরিবারে এপারে এসে পড়েছেন। আপনাকে সাহায্য করা তো আমার কর্তব্য ছিল.....। যাক সে কথা। আজ আমি এঁদের নিয়ে এলুম আপনার কাছে।

—এঁদের তো ঠিক চিনলাম না?

—এঁরা হলেন সবাই আমারই মক্কেল। —গোবিন্দ জানিয়েছিল।

—ওহ।.....শিবতোষ ঠিক বুঝলেন না গোবিন্দর মক্কেলদের আগমনের হেতু।

—মাস্টারমশাই হিসেবে আপনার খ্যাতি তো এই অল্পদিনের মধ্যেই সারা স্কুলে ছড়িয়ে পড়েছে স্যার?

শিবতোষ কুণ্ঠিতভাবে হেসেছিলেন।

—এঁদের ছেলেরা সব ঐ স্কুলেই পড়ে।.....আপনার কাছে এঁরা একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন।

—প্রস্তাব?

—হ্যাঁ। —গোবিন্দ বলল। —এঁদের ছেলেরা আপনার কাছে বাড়িতে পড়তে আসবে।

—বাড়িতে পড়তে আসবে?.....কয়েক মুহূর্ত ভেবেছিলেন শিবতোষ। তারপর বলেছিলেন—তা আসুক না। অসুবিধে নেই। আমি তো আমার ছেলেদের পড়াই। ওদের সঙ্গে নাহয় এঁদের ছেলেরাও পড়বে।

—খুব ভাল কথা স্যার। আমি জানতুম আপনি আমার অনুরোধ রাখবেন।. ..এবার আপনার রেট বলুন স্যার?

—রেট?.. ..কিসের রেট?

—বাঃ! আপনি কি বাড়িতে বিনাপয়সায় পড়াবেন নাকি? এক একজন স্টুডেন্টপিছু কত ক'রে টিউশন-ফি নেবেন আপনি সেটাই তো জানতে হবে? —হেসে গোবিন্দ বলেছিল।

এতদিন বাদেও অপরেশ নিখুঁত মনে করতে পারেন বাবার প্রতিক্রিয়া। যেন বিস্ময়ে গোবিন্দ বসাকের মুখের দিকে তিনি কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে ছিলেন। তারপরই মুখভাব পালটে গিয়েছিল শিবতোষের। ধবধবে সাদা আকাশ হঠাৎই যেমন কালো মেঘে ছেয়ে যায়, তেমনই শিবতোষের সারা মুখে বিষণ্ণতাব কালো ছায়া এসে নেমেছিল। তিনি ব্যথিত চোখে গোবিন্দর দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—বিদ্যাদান করব। তার বিনিময়ে টাকাপয়সা নেব? তুমি আমাকে এত ছোট কী করে ভাবলে গোবিন্দ? আমার এত বছরের শিক্ষকজীবনে আমি একদিনের জনেও প্রাইভেট টিউশনির চিন্তাকে প্রশ্রয় দিইনি। ইস্কুলে পড়ানোর চাকরি করি। তার বিনিময়ে মাইনে নিয়ে থাকি। এটা ঠিক। তা বাদে বিদ্যাদান করে পয়সা উপার্জন?..... সে আমি ভাবতেও পারি নে।

শিবতোষের এরকম তীব্র প্রতিক্রিয়ায় গোবিন্দ বেশ অপ্রস্তুত পড়ে গিয়েছিল। সেই তিনজন ভদ্রলোকও যে অপ্রস্তুত বোধ করছিলেন সেটা তাঁদের মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল।

ম্লান হেসে গোবিন্দ বলেছিল—না বুঝে আমি বোধহয় আপনাকে আঘাত দিয়ে ফেলেছি স্যার। কিছু মনে করবেন না।.....আসলে আমি ভেবেছিলুম আপনি সারাদিন

ইস্কুলে ছেলেদের পড়িয়ে আবার নিজের বাড়িতে বিনা পারিশ্রমিকে অন্যদের পড়ানোর পেছনে খাটবেন কেন? তা ছাড়া.....সর্বস্ব হারিয়ে আপনি সবাইকে নিয়ে এ-পারে এলেন। আমি ভেবেছিলুম এখন আপনার টাকাপয়সার খুব দরকার।

—তুমি ঠিকই বলেছ গোবিন্দ। ওপারে আমি একজন সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলুম। কী ছিল না আমার বলতে পারো?.....কয়েক বিঘে ধানজমি ছিল, ছোটখাটো একটা পুকুর ছিল, বাপ-ঠাকুর্দার নিজেদের হাতে একটু একটু করে গড়ে তোলা একটা বাসস্থান ছিল। শিক্ষক হিসেবে সারা গ্রামে আমার সম্মান ছিল। কিছু সাম্প্রদায়িক মানুষের দুর্বুদ্ধির কারণে আমি সব হারিয়ে এক রাতের মধ্যে রাস্তার উদ্বাস্তু হয়ে গেলুম। তোমার সঙ্গে যদি ঈশ্বর দেখা না করিয়ে দিতেন সেদিন তা হলে স্ত্রী আর ছেলেদের হাত ধরে বোধহয় রাস্তায় থাকতে হত আমাকে।.....তুমি ঠিকই বলেছ গোবিন্দ। ভুল কিছু বলোনি। আবার, আমাকে নতুনভাবে শুরু করতে হবে জীবন। যা গেছে তা আর ফিরবে না জানি। কিন্তু তা বলে হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিলে তো চলবে না। কোমর সোজা করে আবার আমাদের সকলকে উঠে দাঁড়াতে হবে। তার জন্যে টাকারও প্রয়োজন এটা ঠিকই। কিন্তু সেই প্রয়োজনের কাছে আমি নিজের আদর্শকে জলাঞ্জলি দিতে পারব না। প্রাইভেট টিউশন আমি কোনওদিন করতে চাই না। হ্যাঁ— কোনও দিন না। ইস্কুলে পড়িয়ে মাইনে পাই। তারপরে আবার বাড়িতে বিদ্যাদান করে টাকা উপার্জন?.....নো.....নেভার..... নেভার.....!

তারপরই শিবতোষ অন্যরকম এক কান্ড ঘটিয়েছিলেন। তিনি এগিয়ে গিয়ে সেই তিনজন ভদ্রলোকের সামনে হাতজোড় করে বলেছিলেন—আপনারা আমাকে কিন্তু ভুল বুঝবেন না। বাড়ি বয়ে আমাকে যখন অনুরোধ করতে এসেছেন, তখন আমি আপনাদের ফেরাব না। আপনাদের ছেলেদের পাঠিয়ে দেবেন আমার বাড়িতে। হ্যাঁ সকালবেলা। আমার ছেলেদের পড়াই। ওদেরও পড়াব। তবে তার বিনিময়ে কিন্তু পয়সা নিতে পারব না।

এই ঘটনার পর আর এক বিপত্তি হল। এতদিন পর প্রৌঢ় অপরেশ সে সব দিনের কথা শুধু ভাবেন আর তাঁর চোখ জলে ভিজে আসে। সত্যিই তাঁর নিজের বাবাকে তিনি সারাজীবন যেরকম আদর্শ-নিষ্ঠ দেখেছিলেন সে রকম আর কাউকে দেখেননি। গোবিন্দ বসাক যে তিনজন ভদ্রলোককে শিবতোষের বাড়ি সেদিন নিয়ে এসেছিল, তাদের ছেলেরা তো পড়তে আসা শুরু করলই; এ ছাড়া কর্পোরেশনের স্কুলে রটে গেল যে, শিবতোষ স্যার বিনা পয়সায় তাঁর বাড়িতে কোচিং খুলেছেন। ফলে প্রায় জনা কুড়ি ছেলে প্রতিদিন সেই অবৈতনিক কোচিং-এ পড়তে আসা শুরু করল। শিবতোষ বিদ্যাদান করতে কোনওদিন কার্পণ্য করেননি। বিনিময়ে একটা পয়সাও কোনওদিন কারোর থেকে নয়। স্ত্রী বিনতা মাঝে মাঝে মৃদু স্বরে অনুযোগ জানাতে চাননি যে তা নয়। এতগুলো ছেলের জন্যে এত শ্রম দিচ্ছেন শিবতোষ, প্রত্যেকের

কাছ থেকে দশ-পনেরো টাকা করে নিলেও তো মাসের শেষে কটা টাকা হয়। টানাটানির সংসারে সেটাই বা কম কী। কিন্তু শিবতোষ বরাবর একটা কথাই বলে এসেছেন। বিদ্যাদান হচ্ছে পবিত্র কাজ। সেই কাজের বিনিময়ে পয়সা নেওয়া পাপ। বিনতা তর্ক জুড়ে দিতেন। —তা হলে তো ইস্কুলে পড়িয়ে মাইনে নিচ্ছেন শিবতোষ? সেটাও তো বিদ্যাদানের বিনিময়ে টাকা নেওয়া। সেটা বুঝি পাপ নয়? হাসতেন শিবতোষ। বড় লাজুক হাসি। স্ত্রীকে বলতেন—তোমার কথায় যুক্তি আছে। আবার বলারও কিছু আছে।...স্কুলে বিদ্যাদান আমার চাকরি। একটা কিছু উপার্জনের উপায় তো মানুষকে অবলম্বন করতে হবে। তা না হ'লে পেট চলবে কী করে? কিন্তু তার বাইরে বিদ্যাদানকে টাকা রোজগারের মাধ্যম তিনি করবেন না। কোনওদিনও না।.....

এত কথা বিশদভাবে বলার উদ্দেশ্য একটাই। পাঠককে জানানো যে, চার কিংবা পাঁচ দশক পরে চারপাশে মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখেও অপরেশ এক চুল টলেন নি। বাবার আদর্শকে, অন্তত বিদ্যাদানের ব্যাপারে, আঁকড়ে ধরে আছেন বরাবর। তাঁর সহকর্মীরা প্রায় সবাই চুটিয়ে প্রাইভেট টুইশানি করে। সুধীর সামন্ত অপরেশের স্কুলেই বিজ্ঞান-বিষয়ের শিক্ষক। বাড়িতে শুধু প্রাইভেট টুইশানি করেই তিনতলা বাড়ি হাঁকাল। সম্প্রতি একটা লাল টুকটুকে মারুতি কিনেছে। প্রতিদিন ভোর ছটা থেকে সুধীরের দিন শুরু হয়। প্রথমে একটা ব্যাচ কোচিং-এ পড়তে আসে। কুড়ি জনের ব্যাচ। তারপর আটটা থেকে আবার নতুন ব্যাচ। বিকেলেও তাই। বিকেল পাঁচটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত দুটো ব্যাচ। শিক্ষক হিসেবে স্কুলে অপরেশের খুব সুনাম। ইচ্ছে করলে তিনি সুধীর বা অন্যান্যদের মতো চুটিয়ে প্রাইভেট টুইশান করে বাড়ি এবং গাড়ি হাঁকাতে পারতেন। কিন্তু সেইসব প্রলোভন জয় করতে পেরেছেন অপরেশ।

সেই ছাত্র-বয়স থেকেই নিজেকে একজন আদর্শ কমিউনিস্ট হিসেবে ভাবতে ভালবাসেন অপরেশ। তাঁর পরনের পোশাক কোনওদিনই প্যান্ট-শার্ট নয়। সাদা পাজামা এবং পাঞ্জাবি। আগে চওড়া ঘেরের পাজামা পরতেন অপরেশ। এখন অবশ্য চোস্ত পাজামা পরেন। তাঁর চিবুকে ফরাসি ধাঁচের দাড়ি। কাঁচাপাকা। একমাথা ব্যাকব্রাশ চুল। তাও কাঁচাপাকা। মাঝারি উচ্চতা অপরেশের। গলার স্বর গম্ভীর। বরাবর গুছিয়ে কথা বলতে দক্ষ। অল্প বয়স থেকেই পরিচিত মহলে তাঁর আলাদা ভাবমূর্তি। প্রবন্ধ লেখার হাতও যথেষ্ট ভাল। দলের মুখপত্রে তিনি একসময় নিয়মিত রাজনৈতিক নিবন্ধ লিখেছেন। অল্প বয়সে, তখন সবেমাত্র স্কুলের চাকরিতে ঢুকেছেন; অপরেশ দলীয় মুখপত্রে নিয়মিত একটা বিখ্যাত গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করতেন। সেই বইয়ের নাম—'হোয়াট ইজ টু বি ডান'। লেখকের নাম ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন। যে কোনও গুরুগম্ভীর বিষয়ে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করতে পারেন অপরেশ। শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শোনে এ রকম বক্তৃতা দিতে পারেন। সৎ এবং স্বচ্ছ ভাবমূর্তি তাঁর। এরকম একজন মানুষকে অপরেশের দল রাজনৈতিক কাজে ব্যবহার করতে তো চাইবেই।

দলের সাংস্কৃতিক বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন অপরেশ। আঞ্চলিক কমিটির সদস্য ছিলেন। ছাত্রদের এবং এলাকার অন্যান্য যুবকদের নিজের রাজনৈতিক দলের প্রতি আকৃষ্ট করার কাজে রীতিমতন সক্রিয় ছিলেন অপরেশ বরাবর। তাঁর ছাত্রদের অনেকেই অপরেশের সঙ্গে মেলামেশা করত। অপরেশের অন্যতম একটা কাজ ছিল সেইসব উঠতি যুবকদের কমিউনিস্ট আদর্শে দীক্ষিত করা। তমাল সে রকম একজন ছাত্র ছিল। যাকে অপরেশ অজস্র বই পড়তে দিয়েছেন। বাড়িতে ডেকে কতরকম আলোচনা করেছেন। এতে লাভও হয়েছে। কলেজে পড়াকালীন তমাল বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের সক্রিয় কর্মী না হলেও; সেই সংগঠনকেই মনেপ্রাণে সমর্থন করত। আঠারো বছর বয়স থেকে সে ভোট দিচ্ছে। বরাবর সে বামদল-সমর্থিত প্রার্থীকেই ভোট দিয়ে এসেছে। এসবের মূলে ছিলেন আসলে অপরেশই। স্নাতক হয়ে কলেজের পাঠ শেষ করার পর তমাল হয়তো অপরেশ যে রাজনৈতিক দলের সদস্য ছিলেন, সেই দলেরই একজন সদস্য হয়ে যেত। কিন্তু তার আগেই অপরেশের সঙ্গে তাঁর দলের গণ্ডগোল শুরু হয়ে গেল। সেই গণ্ডগোল এমনই চরমে পৌঁছেছিল যে, অপরেশ নিজেই ক্রমশ প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন। কী ঘটেছিল তা তমাল কিছুটা জানত। কারণ তখন তার সঙ্গে অপরেশের যোগাযোগ খুব নিবিড় ছিল। এ ছাড়া কোনও কোনও বিষণ্ণ মুহূর্তে অপরেশ তমালকে কাছে পেয়ে নিজের রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষোভ-বিক্ষোভ, রাগ এবং হতাশাবোধের প্রকাশও ঘটিয়েছিলেন।

সে আজ থেকে তিন কিংবা চার বছর আগের কথা। তমালের তখন কলেজে তৃতীয় বর্ষ চলছে। নিজের দলের সঙ্গে অপরেশের প্রবল মতবিরোধ শুরু হয়েছিল।

৯

চারপাশে যা ঘটছিল তার অনেককিছুই মেনে নিতে পারছিলেন না অপরেশ। তাঁর মনে হচ্ছিল, দলের যারা নেতা তাঁদের অনেকেই নৈতিক মূল্যবোধকে যেন তেমন গুরুত্ব দিচ্ছেন না আর। অপরেশের প্রধান ক্ষোভ ছিল আঞ্চলিক দলের নেতা মোহিত চৌধুরীর বিরুদ্ধে। মোহিত বরাবর সব সময়ের জন্যে রাজনীতি করেন। চালু ভাষায় যাকে বলা হয় হোলটাইমার। তাঁর স্ত্রী প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। সন্তান বলতে শুধুমাত্র এক মেয়ে। মোহিত চৌধুরীকে খুব কাছ থেকে অনেক দিন দেখে আসছেন অপরেশ। অপরেশদের মতো মোহিতও পূর্ববঙ্গের মানুষ। দেশভাগের বেশ কিছুদিন বাদে ভিটেমাটি সব খুইয়ে, রাতারাতি সম্পন্ন গৃহস্থ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে এপার বাংলায় চলে আসেন। অপরেশের থেকে বয়সে তিনি বড়। অপরেশেরও আগে থেকে বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। কলোনি এলাকায় ছন্নছাড়া মানুষদের সংঘটিত করার কাজে

একসময় মোহিত প্রচুর পরিশ্রম করেছেন। তাঁর ভাবভঙ্গিতে একধরনের মেঠো রুক্ষতা আছে। মেঠো ভাষাতেই বক্তৃতা দিতে পারেন ঘন্টার পর ঘণ্টা। তাঁর শ্রম, নিষ্ঠা এবং দক্ষতার কারণেই মোহিত নেতা হতে পেরেছেন। একই দলে, একই এলাকায় অপরেশ মোহিতের নেতৃত্বে বহুদিন কাজ করছেন। মোহিতের বাড়িতেও তাঁর যাতায়াত আছে। মোহিতের মেয়ে চুমকিকে খুব ছোট থেকে দেখছেন অপরেশ।

মেয়ের কারণেই মোহিতের দুর্নাম রটেছিল এক সময়। এমন দুর্নাম যা নিয়ে দলকেও সংবাদমাধ্যমের কাছে এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে বেশ সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল। মোহিত এবং তাঁর স্ত্রী চেয়েছিলেন তাদের একমাত্র মেয়েকে ডাক্তারি পড়াবেন। উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায়--- সেই মেয়ে প্রথম ডিভিশনে পাস করলেও খুব যে ভাল নম্বর পেয়েছিল তা বলা যাবে না। অপরেশ নিজে শিক্ষক। এবং রাজনীতি করার কারণে তাঁর নানা মহলে যাতায়াত আছে। তাঁর কাছে সব খবরই আসত। মোহিতের মেয়ে উচ্চ-মাধ্যমিকে যে, মাত্র তেষট্টি শতাংশ নম্বর পেয়েছে তা অপরেশ জানতেন। এরপর প্রকাশিত হল জয়েন্ট এনট্রান্স পরীক্ষার ফলাফল। তাতেও মোহিতের মেয়ের র‍্যাঙ্ক খুবই নীচুতে ছিল। অপরেশ যা খবর রাখতেন তা হল, মোহিতের মেয়ের র‍্যাঙ্ক ছিল নাকি দশ হাজারেরও নীচে। এত খারাপ ফল করে ডাক্তারি পড়া অসম্ভব। কিন্তু মোহিতের মেয়ের পক্ষে তা তো সম্ভব হল! কলকাতার এক নামী কলেজে সে ডাক্তারি পড়তে ভর্তি হল। আজকাল সর্বত্র রান্নাঘরের রাজনীতি চালু হয়ে গেছে। এক রাজনৈতিক দল সুযোগ পেলেই বিপক্ষ দলের নেতাদের ভুল-ভ্রান্তি-কেচ্ছা কিংবা দুর্নীতির খবর জনসমক্ষে তুলে ধরে। মোহিতের বিরুদ্ধে এলাকায় পোস্টারিং শুরু হল। সেই পোস্টারের ভাষা খুবই ন্যক্কারজনক। দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে মোহিত চৌধুরী তাঁর মেয়েকে ডাক্তারি পড়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। তিনি এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলের শীর্ষস্থানীয় নেতা বলেই কম নম্বর পেয়েও তাঁর মেয়ে অনেক ভাল ছাত্রকে বঞ্চিত করে ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পেয়েছে। এটা এক ধরনের দুর্নীতি। এই দুর্নীতির তদন্ত হওয়া উচিত। একটা বড় পোস্টার, যা সাঁটা ছিল অপরেশদের পাড়ায় একটা বাড়ির দেয়ালে, তার ভাষা অপরেশের আদৌ ভাল লাগেনি। সেই পোস্টারে বলা ছিল—দুর্নীতিগ্রস্ত মোহিত চৌধুরীরা সমাজের শত্রু। জনতার আদালতে এদের বিচার হওয়া প্রয়োজন।

মোহিত চৌধুরীকে আজকাল ফাঁকা প্রায় পাওয়াই যায় না। সবসময়েই তিনি ভক্ত-পরিবৃত হয়ে থাকেন। অপরেশ চেয়েছিলেন বিরোধীরা যে সব বদনাম মোহিতের নামে রটাচ্ছে; তার একটা বিহিত হওয়া প্রয়োজন। প্রয়োজন হ'লে জনসভা ডেকে মানুষের কাছে এসব ব্যাপার খোলাখুলি আলোচনা করাও দরকার। তা না হ'লে সাধারণ মানুষ মোহিতকে তো ভুল বুঝবেই। মোহিত এবং অপরেশ যে রাজনৈতিক দলের সদস্য, সেই দলের কার্যকলাপ সম্বন্ধেও ভুল বার্তা পৌঁছবে মানুষের কাছে। কিন্তু

বিষয়টা নিয়ে নিরিবিলি আলোচনা করার কোনও সুযোগই পাচ্ছিলেন না অপরেশ। মোহিতের চারপাশে সর্বদাই লোকজন। সর্বদাই মোহিত ব্যস্ত। যারা আজকাল মোহিতের চারপাশে ঘোরাফেরা করে তাদেরও যে অপরেশ ব্যক্তিগতভাবে খুব পছন্দ করেন তা নয়। সেইসব লোকজনের মধ্যে কেউ রেশন দোকানের মালিক, কেউ প্রোমোটার, কারোর মোটর-পার্টসের বড় দোকান, কেউ হোটেল-ব্যবসায়ী। এসব লোকজনের সঙ্গে মোহিতের কী সম্পর্ক তা ঠিক বুঝতে পারেন না অপরেশ। এরাও কি রাতারাতি বামপন্থী রাজনীতির সমর্থক বনে গেল? মোহিত কি এদেরও নেতা হয়ে গেলেন? ব্যাপারটা খুবই অপছন্দের ছিল অপরেশের কাছে। তাঁর মনে হত, এসব নিয়ে খোলাখুলি কথা বলা উচিত মোহিতের সঙ্গে। তিনি কতবার ভেবেছেন দলের আঞ্চলিক সভায় এসব প্রসঙ্গ তুলবেন। মোহিত এবং তাঁর খুবই ঘনিষ্ঠ কিছু সদস্যকে সতর্ক করা উচিত। অপরেশের বরাবরের ধারণা, একজন সাচ্চা কমিউনিস্টের প্রথম এবং প্রধান কাজ হল, নিজের ব্যক্তিগত ভাবমূর্তিতে পরিচ্ছন্ন রাখা। একজন কমিউনিস্টের কোনও দ্বিতীয় জীবন থাকবে না। সে সামনে যেরকম। আড়ালেও সে রকম। কিন্তু এখন কী সব পালটে যাচ্ছে? রাজনীতি করতে গিয়ে তিনি দেখছেন, তাঁর সহকর্মীদের অনেকেরই কার্যকলাপ যেন সন্দেহের উর্ধ্বে নয়। যাদের তিনি বরাবর দেখে আসছেন হতদরিদ্র, তারা যেন ইদানীং বেশ বিত্তশালী হয়ে উঠছেন। পার্টি কিংবা দল যেন এ সব দেখেও দেখছে না আজকাল। এসব নিয়ে তখন প্রায়ই ভাবতেন অপরেশ। মনে মনে একটা ধাক্কা অনুভব করেছিলেন তিনি যখন দেখলেন যে, তাঁর স্কুলের সহকর্মী সুধীর সামন্তকে তাঁর দল যথেষ্ট পাত্তা দেয়।

ব্যাপারটা হল এরকম। অপরেশ এবং সুধীর একই রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু অপরেশ পার্টিতে সুধীরের সিনিয়ার। তিনি পার্টির সদস্য হওয়ার অন্তত সাত বছর পর সুধীর পার্টিতে এসেছেন। সুধীরের কার্যকলাপ কিংবা ভাবভঙ্গি কোনওদিনই পছন্দের ছিল না অপরেশের। বেশ অহঙ্কারি, নাক-উঁচু টাইপের মানুষ সুধীর। কথায় কথায় নিজেকে জাহির করেন খুব। অপরেশ সুধীরের যে ব্যাপারটা সব থেকে বেশি অপছন্দ করতেন, সেটা হ'ল তাঁর টাকাপয়সার প্রতি অত্যধিক প্রীতি। শিক্ষকদের প্রাইভেট টুইশানি করার প্রবণতা ক্রমশ বাড়ছে, এটা সমাজের খারাপ দিক;—এই বিষয়ে কতবার আলোচনা হয়েছে পার্টিতে। কিন্তু সেই পার্টিরই অনেক সমর্থক চুটিয়ে বাড়িতে প্রাইভেট টুইশানি করে যাচ্ছে সে ব্যাপারে যেন নেতারা দেখেও দেখছেন না। সুধীর এবং আরও কারোর কারোর কার্যকলাপ অপরেশ কয়েকবার পার্টির মিটিং-এ সমালোচনা করতে চেয়েছেন। কিন্তু তিনি দেখেছেন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যেন বিষয়টাকে এড়িয়ে যেতেই চান। নানা অজুহাত দিয়ে অপরেশকে দমিয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি বিষয়টা উত্থাপন করতে গেলেই তাঁকে বলা হয়েছে যে, শিক্ষকদের প্রাইভেট টুইশানি করা উচিত কি অনুচিত এ ব্যাপারে পার্টির ওপরমহলে ভাবনাচিন্তা চলছে। সুতরাং

এটি আঞ্চলিক স্তরে আলোচনা করা ঠিক হবে না। পার্টির নীতি নির্ধারণ করার দায়িত্ব যাঁদের তাঁরা এসব বিবেচনা করছেন। সুতরাং বিষয়টা নিয়ে 'ওপেন ডিসকাশন' করার কোনও সুযোগ নেই। মনের ক্ষোভ মনের মধ্যেই চেপে রাখতে হ'ত অপরেশকে। তাতে তাঁর ক্ষোভ শুধু বাড়ত। তিনি একা-একা জ্বলে-পুড়ে মরতেন। তাঁর মনে হ'ত, কোথাও একটা বিরাট ভুল হয়ে চলেছে। তবুও সেই ভুলের সংশোধনের কথা কেউ ভাবছে না।

এর পর যা ঘটল তাতে অপরেশ সত্যিই বড় রকমের আঘাত পেলেন। সুধীর এবং তিনি নিজে,—দুজনেই আঞ্চলিক সদস্য ছিলেন। অপরেশ দেখলেন তাঁকে টপকে তাঁর সহকর্মী সুধীর জেলা স্তরের সদস্য হয়ে গেলেন। সুধীর পার্টিতে অপরেশের থেকে জুনিয়র। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনও খুব স্বচ্ছ নয়। অপরেশ যখন পুরনো সাইকেলে প্রতিদিন রাস্তাঘাটে যাতায়াত করেন, তখন তিনি প্রায়ই দেখেন একটা লাল টুকটুকে মারুতিতে সুধীর এধার-ওধার যাচ্ছেন। ব্যক্তিগত জীবনে গাড়ি ব্যবহার করার ক্ষেত্রেও সুধীর খুব সাবধানী। প্রতিদিন স্কুলে আসেন সুধীর অপরেশের মতনই পুরনো, ঝরঝরে-মার্কা সাইকেলে। কিন্তু তাঁর বাড়ির লোকেরা আজকাল গাড়ি ছাড়া এক-পা বোধহয় হাঁটে না। অপরেশের সন্ধানী চোখ কিছুই এড়ায় না। সুধীরের মেয়ে লাল টুকটুকে মারুতিতে স্কুলে যায়। সুধীরের স্ত্রী সেই গাড়িতে মাঝে মাঝে মার্কেটিং-এ যায়। অপরেশের মনে হত, সুধীরের সামাজিক অবস্থানই যেন কবে পাল্টে গেছে। তিনি এখন সমাজের সুবিধাজনক শ্রেণিতে অবস্থান করেন। কিন্তু পার্টির মিটিং-এ কিংবা বক্তৃতায় সুধীর নির্দ্বিধায় শ্রমজীবী মানুষের নানা সমস্যার কথা তুলে ধরেন। সেইসব সমস্যার মোকাবিলায় তাদের নিয়ে লড়াইয়ের কথা বলেন। এটা কি এক ধরনের দ্বিচারিতা নয়? কিন্তু এ সব কাকে বলবেন অপরেশ? কে তাঁর কথা শুনবে? এসব বলতে গিয়ে তিনি যেন অন্যদের বিরক্তির উদ্রেক করছেন। সুধীরের ব্যক্তিগত জীবনে যে দ্বিচারিতা অপরেশের চোখে ধরা পড়েছে, সে সবের সমালোচনা যে তিনি করেন পার্টির অন্যান্য সদস্যদের কাছে এবং মাঝে মাঝে মোহিতদার কাছেও; তা যেন কীভাবে সুধীরের কানেও পৌঁছেছে। সুধীর আজকাল অপরেশকে এড়িয়ে যান। এটা বুঝতে পারেন অপরেশ। মুখোমুখি দেখা হলেও কথা তেমন বলেন না। স্কুলের স্টাফ-রুমে কিংবা করিডোরে দেখা হওয়া তো স্বাভাবিক। আগে দুজনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কত কথা হত। কিন্তু ইদানীং দেখা হলেই সুধীর অল্প হেসে ব্যস্ততার ইঙ্গিত দিয়ে পাশ কাটিয়ে যান। একদিন বাজারের রাস্তায় অপরেশ সুধীরের সঙ্গে একটু কথা বলতে চেয়েছিলেন। নিতান্ত মামুলি কথাবার্তা। সাইকেলের হ্যান্ডেলে বাজারেব থলি ঝুলিয়ে বাজারে যাচ্ছিলেন অপরেশ। আর দু-থলি বাজার সাইকেলের হ্যান্ডেলে ঝুলিয়ে সুধীর ঈষৎ নড়বড় করতে করতে আসছিলেন। রাস্তা ফাঁকা ছিল। সুধীরকে বাজার-ফেরত আসতে দেখে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন অপরেশ। ভদ্রতাবশত সুধীরকেও

দাঁড়াতে হয়েছিল। পরস্পর পরস্পরকে তাঁরা 'তুমি' বলেই সম্বোধন করেন।

—হয়ে গেল বাজার? —জিজ্ঞেস করেছিলেন অপরেশ।

—হ্যাঁ। হল তো।.....এটুকু বলেই সাইকেলের প্যাডেলে চাপ দিতে যাচ্ছিলেন সুধীর।

—আজ কোচিং নেই? —জিজ্ঞেস করেছিলেন অপরেশ।

—আজ রবিবার। তোমার বোধহয় খেয়াল নেই। রবিবার কোচিং বন্ধ।

—তাও তো বটে।.....তারপর? কেমন আছো? আজকাল তো আর কথাবার্তাই হয় না।

—আমি কেমন আছি তোমার কাছে সে খবর আছে।

—মানে?

—আমার খবর তুমিই তো আজকাল বেশি রাখো। আমি কী করছি না করছি সে ব্যাপারে তুমি আড়ালে আমার সমালোচনাও করো। সব খবর আমিও রাখি একটু-আধটু। —বাঁকা হেসেছিলেন সুধীর।

—সমালোচনা যদি করেই থাকি সেটা কি খুব ভুল করেছি বলে তোমার মনে হয়?

—আমার ব্যাপারে সমালোচনা করার অধিকার তোমাকে কে দিল? —বেশ রাগত ভাবেই বলেছিলেন সুধীর।—তোমার ঐ সস্তা আদর্শপনাতে আজকাল লোকে ভুলবে না। নিজে দীন-দরিদ্রের মতন থেকে মেহনতি মানুষের নেতা সাজা—ওসব অনেক পুরনো কৌশল ভাই। সমাজ ভেতরে ভেতরে বদলাচ্ছে এটা টের পাচ্ছ তো? এটা বিশ্বায়নের যুগ মনে রেখো। দরজা জানলা সব খুলে রাখতে হয় আজকাল মানসিকতারও পরিবর্তন দরকার। ফাঁকা আদর্শের বুলি আজকাল আর মানুষ খাচ্ছে না তেমন। তুমি নিজেকে পালটাতে পারছ না। প্রগতির হাওয়া কোন্‌দিকে বুঝতে চেষ্টা করো। না হলে নিজেকেই পস্তাতে হবে। ঠিক আছে। চলি। —সাইকেলের প্যাডেলে চাপ দিয়ে চলে গিয়েছিলেন সুধীর। স্তম্ভিত হয়ে অপরেশ দাঁড়িয়েছিলেন কিছুক্ষণ। তারপর তিনিও মৃদুভাবে চাপ দিয়েছিলেন সাইকেলের প্যাডেলে।

এর পর এমন এক ঘটনা ঘটল যাতে অপরেশের সঙ্গে তাঁর পার্টির বিরোধ একেবারে প্রকাশ্যে চলে এল। মোহিতের মেয়ের ডাক্তারি পড়া মনে মনে মেনে নিতে পারেন নি অপরেশ। সেই মেয়ের নাম অঞ্জলি। জয়েন্ট এনট্রান্স পরীক্ষায় তার র‍্যাঙ্ক অনেক নীচে থাকা সত্ত্বেও নিজের রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে মোহিত তাকে ডাক্তারি পড়তে পাঠিয়েছিলেন। অপরেশ এটা মেনে নিতে পারেননি। স্থানীয় বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো থেকেও পার্টির নেতা মোহিত চৌধুরীর বিরুদ্ধে দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার পড়েছিল। এ সব নিয়ে পার্টিতে কানাঘুষো হয়েছিল বটে কিন্তু তার পর সময়ের নিজস্ব নিয়মে সব চাপাও পড়ে গিয়েছিল। জনতার স্মৃতি নিত্য পরিবর্তনশীল। এ

রকম একটা প্রবাদও তো আছে।

কিন্তু অঞ্জলি ডাক্তারি পাস করার পর যখন তার বিয়ের ব্যবস্থা হল, এবং সেই বিয়ের অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলেন অপরেশ; তখন এমন কিছু দেখলেন যা তাঁকে উত্তেজিত করল খুব।

ডাক্তার মেয়ের ডাক্তার পাত্র জুটিয়েছিলেন মোহিত। সে তিনি জোটান, তাতে অপরেশের আপত্তি নেই। কিন্তু বিয়ের অনুষ্ঠানের আড়ম্বর দেখে অপরেশ রীতিমতো অবাক হয়ে গেলেন।

বিয়ের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল এলাকার এক বড় বাড়িতে। খুব ধনী মানুষদের বিয়ের অনুষ্ঠান সেই বাড়িতে হয়ে থাকে। দোতলা বাড়ি। বিশাল এক হলঘর। অন্তত পাঁচশো মানুষ সেখানে নির্বিঘ্নে বসে খাওয়াদাওয়া করতে পারে। নীচে দুটো ঘর। দোতলাতে চারটে ঘর। সেই বাড়ি বিয়ে এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে ভাড়া দেওয়া হয়ে থাকে। এক রাতের ভাড়া অপরেশ যতদূর খবর রাখেন আটহাজার টাকা। সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষদের পক্ষে ঐ বাড়ি অনুষ্ঠানের জন্যে ভাড়া নেওয়া প্রায় অসম্ভব। অপরেশ দেখেছেন অধিকাংশ সময়ে বাড়িটা ফাঁকাই পড়ে থাকে। মাঝে মাঝে ভাড়া হয় বটে। বাড়ির চারপাশে আলোর রোশনাই আর সারি সারি গাড়ির ভিড় দেখে বোঝা যায় কোনও ধনী পরিবারের অনুষ্ঠান চলছে সেখানে। মোহিতের নিজস্ব আয় বলতে কিছুই প্রায় নেই। তিনি সারাক্ষণের রাজনৈতিক কর্মী। তাঁর স্ত্রী এক প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষিকা। তা হলে মোহিতের পক্ষে শুধুমাত্র অনুষ্ঠানের বাড়ি ভাড়া করার জন্যে আট হাজার টাকার ভার সামলানো কীভাবে সম্ভব? অত আড়ম্বর মোহিত করতেই বা গেলেন কেন? তিনি যে বাড়িতে থাকেন, সেই বাড়ির লাগোয়া বেশ অনেকটা ঘাসজমি আছে। সেটা নাকি মোহিতদেরই জায়গা। সেখানে সাধারণ মাপের প্যান্ডেল বেঁধেও তো নিমন্ত্রিতদের বসবার এবং খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করতে পারতেন। এই প্রশ্ন আর কারোর মনে এসেছিল কি না বলতে পারবেন না অপরেশ। কিন্তু মোহিত অপরেশকে যে নিমন্ত্রণ-পত্র দিয়েছিলেন, তাতে বিবাহ-অনুষ্ঠানের স্থানিক বিবরণ দেখে অপরেশের মনে এই প্রশ্নগুলো এসেছিল।

অনুষ্ঠানের আসরে উপস্থিত হ'য়ে অপরেশের মনে আরও অনেক প্রশ্ন এসেছিল। এবং তিনি রীতিমতো উত্তেজিত বোধ করেছিলেন। মোহিত হলেন সেই রাজনৈতিক দলের নেতা, যে দল শ্রমজীবী মানুষদের কথা ভাবে; গরিব মানুষদের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নতির জন্যে সেই দল অঙ্গীকারবদ্ধ। মোহিত তাঁর মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে যে এলাহি আয়োজন করেছেন; তা দেখে অপরেশের অবশ্য মনে হয়েছিল, একমাত্র শিল্পপতি বা ঐ ধরনের ধনী মানুষরাই সে ধরনের আয়োজন করার ক্ষমতা রাখেন। প্রশস্ত বাড়িতে আলোয় আলোয় ছয়লাপ। বাড়ির সব সিঁড়ি এবং মেঝে আগাগোড়া কার্পেটে মোড়া। অতিথিরা যখন আসছেন তখনস সুন্দরী মেয়েদের দল

তাদের গোলাপফুল দিয়ে আপ্যায়ন করছেন। তার পরই কেতাদুরস্ত পোশাকে সজ্জিত যুবকেরা, (যারা কেটারিং সংস্থার প্রতিনিধি সেটা তাদের দেখেই বোঝা যায়) চলে আসছে ট্রে নিয়ে। সেই ট্রেতে নানা রঙের শরবত। এ ছাড়াও অতিথিদের গায়ে মাঝেমাঝে গোলাপজল ছিটানো হচ্ছিল। এসব দেখে লজ্জা পাচ্ছিলেন অপরেশ। কমিউনিজমে বিশ্বাসী কোনও ব্যক্তির মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে এসব আড়ম্বর কীভাবে মেনে নেওয়া যেতে পারে?

সামনের ঘরে এককোণে একটা চেয়ারে গম্ভীর মুখে চুপ করে বসেছিলেন অপরেশ। দূর থেকে মোহিত একবার তাঁকে দেখতে পেয়ে হাত নেড়েছিলেন। মোহিত অবশ্য একা ছিলেন না। কয়েকজন লোক তাঁকে সর্বদা ঘিরে ছিল। তাদের দেখেই বোঝা যাচ্ছিল তারা যে কোনও মুহূর্তে মোহিতের নির্দেশ পালন করার জন্যে তটস্থ। তিন-চারজন লোক মোহিতের সঙ্গে ছিল। অপরেশের দুর্ভাগ্য তিনি তাদের প্রত্যেককেই চিনতে পেরেছিলেন। সেই লোকগুলোর দুজন ছিল এম. আর. ডিলার, একজন পরিচিত প্রোমোটার। আর একজন মাঝারি মাপের এক বিস্কুট-কারখানার মালিক। এদের সঙ্গে প্রকাশ্যে এত দহরম-মহরম দেখানো কি মোহিতের ভাবমূর্তির পক্ষে ঠিক হচ্ছে?

হলঘরটিকে ঘিরে খাওয়া-দাওয়া করছিল অতিথিরা। অপরেশের মনে হচ্ছিল বটে তিনি না খেয়ে কেটে পড়বেন। বিয়েবাড়ির বাতাবরণ তাঁর কাছে খুবই অস্বস্তিকর মনে হচ্ছিল। কিন্তু না খেয়ে চলে গেলে কি খুব বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে না? অনুষ্ঠানের দিন সেই বাড়াবাড়ি করা বোধহয় ঠিক নয়। কিন্তু যেখানে খাওয়া-দাওয়া হচ্ছিল সেখানে গিয়ে অপরেশ আবার বেশ ধাক্কা খেলেন।

জায়গাটা কীরকম আলো-আঁধারি। এক-একটা টেবিলে চারজন করে অতিথি বসেছে। খুব সুদৃশ্য টেবিল। মাঝখানে টেবিল-ল্যাম্প। ঠিক যেন দামি হোটেলের পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। স্টিরিওতে মৃদু তালে চলছে গান। সেই গান কানে যেতেই মেজাজ আবার চটকে গেল অপরেশের। চটুল ফিল্মী গান বাজছে স্টিরিওতে। মোহিতের মেয়ের বিয়েতে রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজতে পারত। রবিশঙ্করের সেতার কিংবা আমজাদ আলি খানের সরোদ বাজতে পারত। তার বদলে বাজছিল বিদঘুটে সুরে ও জগঝম্প মিউজিকে হিন্দি গান। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল অপরেশের। তাঁর মনে হচ্ছিল তিনি চিৎকার করে ওঠেন—এখনই বন্ধ হোক স্টিরিও মোহিত চৌধুরীর মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে এই নিম্নরুচির প্রকাশ সহ্য করা যাচ্ছে না!.....কিন্তু কিছুই করতে পারলেন না অপরেশ। সে রকম করলে সিনক্রিয়েট করা হত। একটা টেবিলের সামনে তিনি গোমড়া মুখে বসেছিলেন। খাবার স্পৃহা তিনি আদৌ বোধ করছিলেন না।

খাবারের মেনু দেখেও অপরেশের চক্ষু চড়কগাছ! চিকেন বিরিয়ানি, শিককাবাব, ভেটকির ফ্রিল, দই ইলিশ, নান রুটি, বাটার-চানা, চিংড়ি মাছের মালাইকারি। এছাড়া

নিরামিষাশিদের জন্যে অন্তত পাঁচরকম পদ। মিষ্টি চাররকম। দই। আইসক্রিম। অপরেশ অভিজ্ঞতা থেকে বুঝলেন, যা ঢালাও আয়োজন করা হয়েছে, তাতে এক একটি প্লেটের দাম পড়েছিল নিশ্চয়ই আড়াইশো থেকে তিনশো টাকা। তার মানে এত বিপুল সংখ্যক নিমন্ত্রিতদের আপ্যায়ন ও খাওয়া-দাওয়াতেই অন্তত দু' থেকে তিন লাখ টাকা খরচ করেছেন মোহিত। এছাড়াও বিয়ের অনুষ্ঠানের খরচ আছে। আশ্চর্য? এত টাকা মোহিত খরচ করতে পারেন কীভাবে? যে দেশের প্রায় চল্লিশ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্য-সীমার নীচে পড়ে আছে এখনও; সে দেশে সামান্য বিয়ের অনুষ্ঠানে এরকম আড়ম্বরের আয়োজন করে অর্থের অপচয় করা মোহিতের মতো একজন রাজনৈতিক নেতার পক্ষে কী ঠিক কাজ হয়েছে?

সেদিন অপরেশ তেমন কিছু খেতে পারেননি। নেহাতই যেটুকু না খেলে খারাপ দেখায় সেটুকুই নিয়েছিলেন। মোহিত একবার টেবিলের সামনে এসে জিজ্ঞেস করেছিলেন—কী হে অপরেশ? তুমি যে কিছুই নিচ্ছ না? অপরেশ মৃদুভাবে বলেছিলেন—নাহ, ঠিক আছে। এলাকার একজন এম. আর. ডিলার, যে মোহিতের পাশেই ছিল, হাত জোড় করে গদগদ ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করেছিল— মেনু কেমন হয়েচে স্যার? পছন্দ তো?.....অপরেশ কিছু বলেননি। শুধু কটমট করে তাকিয়েছিলেন।

পার্টির মাসিক সভা মোহিতের সভাপতিত্বেই হয়ে থাকে। আঞ্চলিক কমিটির সদস্যরা সবাই সেই সভায় হাজির থাকে। নানা বিষয়ে আলোচনা। রাজনৈতিকসংগঠন নানা এলাকায় কীভাবে আরও নিবিড় এবং জোরদার করতে হবে এসব বিষয়েই মূলত মত জানতে চাওয়া হয় উপস্থিত সদস্যদের কাছ থেকে। সে রকম এক সভায় যথারীতি অপরেশ হাজির ছিলেন। তাঁর বক্তব্য রাখার সময় তিনি যা বললেন তা শুনে উপস্থিত সবাই প্রায় চমকে উঠল। বস্তুত সেই সভায় এক বোমা ফাটিয়েছিলেন অপরেশ।.....

সেদিনের সভা ছিল নেহাতই নিয়মমাফিক। খুব একটা বিশেষ কিছু আলোচনার কথা ছিল না। নানা অঞ্চল থেকে সদস্যেরা পার্টির কাজকর্মের রিপোর্ট পেশ করছিলেন। অপরেশ প্রথম থেকেই কিছু একটা বলার জন্যে উশখুশ করছিলেন। সভার শুরুতেই তিনি সভাপতি মোহিতকে জানিয়েছিলেন যে, তিনি কিছু বলতে চান। মোহিত অপরেশের দিকে একবার তির্যকদৃষ্টি হেনে বলেছিলেন—সভার একটা নিয়ম আছে। আগে নিজের নিজের অঞ্চল থেকে সদস্যেরা রিপোর্ট করুন, তারপর তোমার বক্তব্য শোনা যাবে। আঞ্চলিক প্রতিনিধিদের এমনভাবে বক্তব্য রাখার জন্যে ডাকতে লাগলেন মোহিত যে, অপরেশ বলার কোনও সুযোগই পাচ্ছিলেন না। তিনি শুধু মনে মনে অস্থির হচ্ছিলেন। সভা যত এগিয়ে যাচ্ছিল, ক্রমশ অপরেশ বুঝতে পারছিলেন যে, তিনি সম্ভবত বলার কোনও সুযোগ পাবেন না। কেন? এক সময় অপরেশ আর পারলেন না। এক সদস্যের বক্তব্য শেষ হয়েছে, অন্য একজন শুরু করতে যাবেন, ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে অপরেশ উঠে দাঁড়ালেন। —আমাকে কিছু বলতে দেওয়া হোক। —দাবি করলেন তিনি।

মোহিত জিজ্ঞেস করেছিলেন—কী বলতে চাও তুমি?

অপরেশ বললেন— সেটা আমি বলতে শুরু করলেই বোঝা যাবে।

—তুমি তো সাংস্কৃতিক কমিটির প্রতিনিধি। সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ নিয়ে যখন আলোচনা হবে তখন তুমি বলতে পার।

—আমি অন্য একটা ব্যাপারে কিছু বলতে চাই। আমাকে বলতে দিতে হবে। —অপরেশ বেশ জোর দিয়ে বললেন। মোহিত এবং অপরেশের এই তর্ক-বিতর্ক উপস্থিত অন্যান্যরা লক্ষ্য করছিল। সভায় একটা গুঞ্জন উঠল। অনেকেই বলল—আচ্ছা অপরেশবাবু কী বলতে চাইছেন শোনা যাক। ওঁকে বলতে দেওয়া হোক। মোহিত আর 'না' বলতে পারলেন না। অপরেশ উঠে দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করলেন। তিনি যা বলেছিলেন তা এরকম—

'এখানে যতজন আমরা উপস্থিত আছি, প্রত্যেকেই কমিউনিস্ট আদর্শে বিশ্বাসী। যে আদর্শের মূল কথা হল, শ্রমজীবী মানুষের উন্নতিবিধানের জন্যে লাগাতার লড়াই। নিরন্তর গ্রহণ-বর্জনের মধ্যে দিয়ে এমন এক উন্নত সমাজব্যবস্থার কথা আমরা ভাবি যেখানে মানুষের সামাজিক এবং আর্থিক বৈষম্য কমবে আমাদের সমাজের বেশিরভাগ মানুষ গরিব। তারা খেয়ে পরে বাঁচবে। সুস্থ অবস্থায় জীবনধারণ করবে। শিক্ষায় অগ্রাধিকার পাবে। মূলধনের অযৌক্তিক বৈষম্যের অবসান ঘটানোও আমাদের একটা অন্যতম লক্ষ্য। কিন্তু আমরা অনেকে যদি নিজেরাই নিজেদের জীবনধারণকে অস্বচ্ছ এবং দুর্নীতিগ্রস্ত করে তুলি তা হলে গরিব মানুষের নেতৃত্ব আমরা কীভাবে দেব?'

এতটা বলে অপরেশ যেইমাত্র থেমেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সভায় আবার গুঞ্জন উঠেছিল। কেউ কেউ বলেছিল যে বড় বেশি তত্ত্বের অবতারণা হয়ে যাচ্ছে। আসল বক্তব্য কী অপরেশ ঝেড়ে কাশুক।

'হ্যাঁ। আমি এবার সরাসরিই বলতে চাই। কিছুদিন আগে আমি একটা বিবাহ-অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। আপনারা অনেকেই গিয়েছিলেন। সেই অনুষ্ঠানে আমি কয়েকটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছি যা আমার ভাল লাগেনি।..... হ্যাঁ—অভিযোগটা আমি মোহিতদার বিরুদ্ধেই করতে চাই। মোহিতদা অনেকের মতোই আমাদের পার্টির একজন হোল-টাইমার। তাঁর নিজের রোজগার নেই বললেই চলে তাঁর স্ত্রী প্রাইমারি স্কুলে পড়ান। কিন্তু মোহিতদার মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়ে আমার মনে হয়েছে কয়েক লাখ টাকা খরচ করেছেন তিনি। প্রতি মুহূর্তে আমার সেদিন মনে হয়েছে যে, কমিউনিজমের আদর্শে দীক্ষিত কোনও নেতার বাড়িতে আমি নেমন্তন্ন খেতে আসিনি। আমি নেমন্তন্ন খেতে এসেছি কোনও ধনী শিল্পপতির মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে। আমার প্রথম প্রশ্ন হল—এত টাকা মোহিতদা কোথা থেকে পেলেন? শুধু আমার মনে এ প্রশ্ন হয়ত আসে

আপনাদের অনেকের মনেই এসেছে। সবথেকে বড় কথা হল, সাধারণ মানুষের মনেও এই প্রশ্ন আসবে। আমাদের সকলেরই কাজকর্ম বিষয়ে ভুল ধারণা পোষণ করতে থাকবে সাধারণ মানুষ। আমাদের রাজনৈতিক দলের ভাবমূর্তি কি এতে ক্ষুণ্ণ হচ্ছে না?'

এতদূর বলতে পেরেছিলেন অপরেশ। আর বলতে পারেননি। কারণ সেদিনকার সভায় জোর গোলমাল শুরু হয়েছিল। কোনও কোনও সদস্য তেড়ে এসেছিলেন অপরেশের দিকে। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে মোহিত তাকিয়েছিলেন অপরেশের দিকে। অনেকেই চিৎকার করছিলেন যে, এভাবে সরাসরি প্রকাশ্যে মোহিতের মতো একজন সিনিয়র নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে অপরেশ অধিকার ভঙ্গের দোষে দোষী হয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। সেই সভাতেই দেখা গেল, সবাই যে অপরেশের বিরুদ্ধে তা নয়। দু-একজন, যদিও তাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়, তাঁর সঙ্গে সহমত পোষণ করেন। হয়ত প্রকাশ্যে অভিযোগ করার সাহস তাঁদের ছিল না। তাঁদেরই একজন বললেন যে, মোহিত চৌধুরীর বিরুদ্ধে অভিযোগ যখন উঠেছে তা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সেই অভিযোগের সত্যতা যাচাই করার জন্যে ঊর্ধ্বতন নেতৃবৃন্দের কাছে তদন্ত দাবি করা হোক। সভায় স্পষ্টত দুটি পক্ষ হয়ে গিয়েছিল। অপরেশের সমর্থকেরা ছিলেন খুবই অল্প। তবু যাহোক তাঁদের সাহায অপরেশ সেদিনের সভায় শারীরিক নির্যাতনের হাত থেকে কোনওক্রমে বেঁচে ছিলেন।

কিন্তু এই ঘটনার কিছু দিন বাদেই অপরেশ তাঁর দলের নেতৃত্বের কাছ থেকে একটা চিঠি পেলেন। সেই চিঠিতে লেখা ছিল, অপরেশের নেতৃত্বে এলাকার সাংস্কৃতিক কাজকর্মের তেমন অগ্রগতি না হওয়ায় তাকে ঐ সমিতির সচিবের পদ থেকে অপসারণ করা হল। খুবই অপমানিত বোধ করেছিলেন অপরেশ। মোহিত চৌধুরীর কাছে তিনি জানতে চেয়েছিলেন, প্রকাশ্য সভায় সকলের মতামত না নিয়ে এভাবে তাঁকে সরিয়ে দেবার অর্থ কী। মোহিত ভালোভাবে কথাই বলেননি অপরেশের সঙ্গে। শুধু জানিয়েছিলেন যে, সেটা জেলা নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত। সে ব্যাপারে তিনি কিছু বলতে পারবেন না।

দেখা গেল, অপরেশকে হঠাৎ সাংস্কৃতিক সমিতির সচিবের পদ থেকে অপসারণ করে যে অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছিল তার বিরুদ্ধে কেউ মুখ খুললেন না। অপরেশ ক্রমশ একা এবং বিচ্ছিন্ন বোধ করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে আরও একটা ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটল, যাতে নিজেকে চরমভাবে অপমানিত বোধ করলেন অপরেশ।

তিনি যে এলাকাতে থাকেন, সেখানেই একটা ভালো পাবলিক লাইব্রেরি আছে। প্রতি বছর বেশ আড়ম্বরেব সঙ্গে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন করা হয় সেই লাইব্রেরির পক্ষ থেকে। বক্তব্য রাখার জন্যে অনেক গুণী ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সেবার অনেকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে কিছু বক্তব্য রাখার জন্যে লাইব্রেরির পক্ষ থেকে

আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল অপরেশকেও। আজ থেকে প্রায় চার বছর আগের কথা। তখন তমাল কলেজে সবে প্রথম বর্ষের ছাত্র। তার তখন একটা নেশা ছিল নানা জায়গায় বক্তৃতা শুনতে যাওয়ার। বিশেষত অপরেশ-স্যারের বক্তৃতা, তা সে যে কোনও বিষয়েই হোক, তমাল সুযোগ পেলেই শুনত। অপরেশ-স্যারের বক্তৃতা শুনতে তার বরাবরই ভাল লাগে। অতি সাধারণ বিষয়েও অপরেশ তুখোড় বক্তৃতা করতে পারেন। তঁরা বাচনভঙ্গি, শব্দচয়ন, বিষয়ের উপস্থাপনা সব কিছুই খুব আকর্ষক। শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শোনে। পাবলিক লাইব্রেরির সেই রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠানে সেদিন সন্ধ্যায় তমালও উপস্থিত ছিল। নিজের চোখে সে দেখেছিল অপরেশ স্যারের অপমান।

রোজকার মতো ধবধবে সাদা পাজামা ও পাঞ্জাবি পরনে অপরেশ অন্যান্য অতিথিদের সঙ্গে বসেছিলেন মঞ্চে। লাইব্রেরির নিজস্ব প্রেক্ষাগৃহে চলছিল অনুষ্ঠান। শ্রোতাদের সংখ্যাও ছিল বেশ। দুজনের বক্তব্য শেষ হওয়ার পর ডাক পড়ল অপরেশের। ঘোষক মাইকে পরবর্তী বক্তা হিসেবে তাঁর নাম ঘোষণা করার পর অপরেশ যেইমাত্র চেয়ার থেকে উঠে মাইকের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে চোখের নিমেষে সেই বিশ্রী ব্যাপারটা ঘটেছিল। শ্রোতাদের পক্ষ থেকে আচমকা উঠে দাঁড়িয়েছিল দুজন ছোকরা। কিছু একটা নিক্ষেপ করেছিল তারা অপরেশের দিকে। এক মুহূর্তের মধ্যে হলুদ-রং কী এক পদার্থে নোংরা হয়ে গিয়েছিল অপরেশের পাঞ্জাবি। সামনের সারিতে যেসব শ্রোতারা এবং মঞ্চে অন্যান্য অতিথিরা বসেছিলেন, তাঁদের নাকে এসে লেগেছিল তীব্র কটু গন্ধ! গন্ধটা ছিল পচা ডিমের। শ্রোতারা কিছু বুঝতে পারার আগেই সেই দুজন ছোকরা পালিয়ে যেতে পেরেছিল। তাদের মুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছিল কয়েকটা স্লোগান। সেগুলো হল এরকম—প্রতিক্রিয়াশীল অপরেশ রায় দূর হটো দূর হটো।.....অপরেশ রায়ের কালো হাত ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও। ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও।.....সবাই দেখেছিল অপরেশ কাঁপতে কাঁপতে মঞ্চের উপর ধুলোতেই বসে পড়ছেন।

প্রকাশ্যে এভাবে অপমানিত হওয়ার পর থেকে অপরেশ কীরকম চুপচাপ হয়ে গেলেন। তাঁর পরিচিত সামাজিক গন্ডি থেকে তিনি নিজেই নিজেকে সরিয়ে নিলেন। মিটিং করতে পার্টি অফিসে আর যেতেন না। কোনও সভার উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে আমন্ত্রণ গ্রহণ করতেন না। স্কুলে যেতেন, পড়াতেন আর চলে আসতেন। তাঁর পার্টিও অপরেশের তেমন খোঁজ-খবর রাখত না। তিনি সাহস করে অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছিলেন। বুক চিতিয়ে কিছু নির্মম সত্য তিনি প্রকাশ্যে তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু কেউ তাঁকে সমর্থন জানাল না। তিনি যখন নানাভাবে সামাজিক জীবনে অপমানিত হয়ে চলেছেন, তখনও কেউ তাঁর পাশে দাঁড়াল না। সে কারণেই বোধহয় অপরেশ অভিমান করে নিজেকে সরিয়ে নিলেন রাজনৈতিক জীবন থেকে তো বটেই, এমনকী সামাজিক জীবন থেকেও।.....

১০

একদিন সকালে তমাল আবার গেল সুহাসদের বাড়ি। দিনটা ছিল রবিবার। আজ ইন্দ্রানী, সুহাসের মা বাড়ি থাকবেন। তাঁর স্কুলে ছুটি। বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলা যাবে। এর আগে যেদিন নিজেই খুঁজে খুঁজে সুহাসদের বাড়িতে গিয়েছিল তমাল, সেদিন ফিরে আসবার সময় ইন্দ্রানী তাকে বাড়ির টেলিফোন নাম্বার দিয়েছিলেন। তমালকে বলেছিলেন—যখনই দরকার মনে হবে ফোন কোরো। তমাল সে কথার কোনও উত্তর না দিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়েছিল। তখন ইন্দ্রানী বলেছিলেন—কথাটা বোধহয় ঠিক বলা হ'ল না। দরকার বলতে আমি অন্য কিছু বলতে চাইনি। আমার কাছে তোমার আর কী দরকার থাকবে? আসলে আমি বলতে চেয়েছি যখন তোমার মনে হবে তখনই তুমি আমার বাড়ি আসতে পার। তুমি সুহাসেরই বয়সী প্রায়। তুমি তো আমার ছেলের মতো। তোমার জন্যে আমার বাড়ির দরজা সবসময় খোলা থাকবে। তমাল বলেছিল—আমি আসব মাসিমা। নিশ্চয়ই আসব। এ বাড়িতে আসতে আমারও খারাপ লাগবে না। আপনি জানেন তো—আমার কোনও বন্ধু নেই।..... কথাটা তমাল এমনই সরলভাবে বলেছিল যে ইন্দ্রানী তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ছিলেন। তারপর বলেছিলেন—এই কথাটা আমি জীবনে দুবার শুনলাম বাবা। কথাটা বলে তুমি আমার একটা স্মৃতি হঠাৎই উস্‌কে দিলে.....। ইন্দ্রানীর কথাটা তমাল ঠিক বোঝেনি। তাই অনিশ্চিতভাবে তাকিয়ে ছিল। ইন্দ্রানী মুখ নিচু করে বলেছিলেন—আমার ছেলে সুহাসও একদিন আমাকে জানিয়েছিল যে তার কোনও বন্ধু নেই। সে খুব একা। তমাল জিজ্ঞেস করেছিল—সত্যিই সুহাস বলেছিল এই কথা? আশ্চর্য!

—হ্যাঁ বলেছিল। সুহাস বোধহয় তার সমবয়সী কারোর সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারত না। তাকে বোধহয় কেউ ঠিক বুঝতে পারত না। তাই.....

—তাই কী মাসিমা?

—সুহাস প্রায়ই আমার গলা জড়িয়ে ধরে বলত তুমিই আমার একমাত্র বন্ধু মা। এরকমই ছেলেমানুষ ছিল ও। জানো তো—সুহাস কবিতাও লিখত।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। সে নিজে বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করেছে। ভাল ছাত্র ছিল। ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমা পেয়েছিল। চাকরির চেষ্টা করছিল। চাকরি একটা পেয়ে যেত হয়তো। কিন্তু তার আগেই—ইন্দ্রানী চুপ করে গিয়েছিলেন। তমাল বুঝেছিল তিনি কেন চুপ করে গিয়েছিলেন। তাই ইন্দ্রানীর মনকে অন্যদিকে ফেরাবার জন্যেই

বোধহয় তমাল প্রশ্ন করেছিল—সুহাস কবিতা লিখত বলছেন। সেসব কবিতা কোথাও ছাপা হয়নি?

—হ্যাঁ। যা বলছিলাম। বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও সুহাস কবিতা পড়তে ভালবাসত। ওর বইয়ের তাকে কত কবিতার বই আছে। পরের দিন তুমি এলে দেখাব।.....

—সুহাসের কবিতা ছাপা হত মাসিমা? প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করেছিল সে।

—নাহ। শুধু নিজের ডায়েরিতে লিখে রাখত। মাঝে মাঝে আমাকে পড়ে শোনাত।

—সেই ডায়েরিগুলো আছে আপনার কাছে?

—হ্যাঁ। আছে। এরপর যেদিন আসবে দেখাব। আর শোনো—তুমি আমাদের বাড়ির ফোন-নম্বরটা রেখে দাও। যখন আসতে চাইবে ফোন করে যদি আমাকে জানিয়ে দাও আমার সুবিধে হবে।

--ঠিক আছে মাসিমা। —তমাল ইন্দ্রানীর দেওয়া টুকরো কাগজটা নিজের জামার বুকপকেটে রেখেছিল। বাড়ি ফিরে এসে নিজের ব্যক্তিগত ডায়েরিতে সে সেই নম্বর টুকে রেখেছিল। তমালেরও একটা ব্যক্তিগত ডায়েরি আছে। সেই ডায়েরিতে যখনই ইচ্ছে হয় সে নিজের মনের কথা লিখে রাখে। কত রকম কথা। যা সে কাউকে বলতে পারে না। কারোর কাছে সেভাবে প্রকাশ করতে পারে না। সুহাসের মতো অবশ্য কবিতা রচনার ক্ষমতা তার নেই। তবে সুহাসের সঙ্গে একটা ব্যাপারে তার মিল! সুহাসের মতো তমালেরও কোনও বন্ধু নেই। সুহাস তবুও তার মাকে পেয়েছিল। নিজের মনের কথা বলতে পারত মাকে। কবিতা শোনাতে পারত। কিন্তু তমাল তো তাও পারে না। তার বাবা সর্বদাই ব্যস্ত। দিনের মধ্যে কতটা সময় আর সে বাবাকে পায়। সকাল নটা নাগাদ বাবা অফিসে বেরিয়ে যায়। প্রতিদিনই ফেরে অনেক রাত করে। বাড়ি ফিরে বাবা কারোর সঙ্গে তেমন কথাবার্তা বলে না। ডাইনিং স্পেসে একটা টিভি আছে। বস্তুত, তাদের বাড়িতে দুটো টিভি আছে। একটা বাবা-মায়ের বেড-রুমে। আর একটা ডাইনিং স্পেসে। তমালদের অবস্থা বরাবরই সচ্ছল। হবেই তো। তার বাবা শৈবাল ব্যাঙ্কের খুব বড় অফিসার। অনেক টাকা মাইনে পায়। আধুনিক জীবনযাত্রার উপকরণ যা যা একটা সচ্ছল পরিবারে থাকার কথা তাদের বাড়িতে সবই আছে। দুটো টিভি, খুব বড় ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন—এইসব। তা সত্ত্বেও শৈবাল একদিন তমালকে জিজ্ঞেস করেছিল—তোর ঘরে কি একটা টিভি লাগবে?

—আমার ঘরে? কেন? বাড়িতে তো দুটো টিভি?

—একটা আমাদের বেডরুমে। আর একটা ডাইনিং স্পেসে। তুই যদি রাতের দিকে বিছানায় শুয়ে শুয়ে টিভি দেখতে চাস?

—টিভি দেখতে আমার ভাল লাগে না। —তমাল জানিয়েছিল।

শৈবাল প্রায় প্রতিদিনই অফিস থেকে রাত করে বাড়ি ফেরে। তারপর খেতে

বসে ডাইনিং টেবিলের সামনে টিভি অন্ করে দেয়। নানান চ্যানেলের খবর শোনার নেশা শৈবালের। খেতে খেতে সে একটা চ্যানেল একবার ঘোরায়। পছন্দ না হ'লে আবার অন্য একটা চ্যানেলে চলে যায়। তারপর একসময় খাওয়া শেষ হ'লে উঠে পড়ে। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ধূমপান করে। তারপর বিছানায় যায়।

আর তমালের মা, অনিতা, সবসময় নিজের ঠাকুর-দেবতা নিয়ে ব্যস্ত। গুরুদেব নিয়ে ব্যস্ত। তমালের খাওয়া-দাওয়ার দিকে অনিতার খুব নজর। শৈবালের খাওয়া-দাওয়ার দিকেও তার নজরের অভাব নেই। কিন্তু সংসারের কাজ ছাড়া অনিতা অধিকাংশ সময়ে তার পুজো-আর্চা নিয়েই থাকে। তমাল মাকে আর কি নিজের কথা শোনাবে?

রবিবার সুহাসদের বাড়ি যাবে। তাই শনিবার ইন্দ্রানীকে ফোন করেছিল তমাল। একটু রাতের দিকে। বাবা তখনও অফিস থেকে ফেরেনি। মা বেডরুম অন্ধকার করে ভজনের ক্যাসেট শুনছিল। তমাল পরেরদিন আসবে জেনে ইন্দ্রানী খুশি হয়েছিলেন।

আজ রবিবার এমনিতে বাসে ভিড় কম। রাস্তাঘাটও ফাঁকা। তবুও তমাল যে বাসে উঠেছিল সেটা যেতে যেতে একসময় দাঁড়িয়ে পড়ল। বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। একটা মিছিল যাচ্ছিল। বেশ লম্বা মিছিল। তমাল বাসের জানলা থেকে ঘাড় বেঁকিয়ে দেখছিল মিছিলটাকে। রাস্তার মধ্যিখান দিয়ে চলেছে মিছিল। ফলে যাবতীয় যানবাহন দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছে। কারোর কিছু বলার নেই। সামনেই একটা তেমাথার মোড়। সেখানে দুজন ট্রাফিক পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। তাদের একজন হাত তুলে আছে। সমস্ত ট্রাফিক থেমে গেছে সেই হাতের ইঙ্গিতে। অর্থাৎ যানবাহন থামিয়ে রাস্তা দিয়ে মিছিল যাবার ব্যাপারে ট্রাফিক-পুলিশেরও সম্মতি আছে। কীসের মিছিল? তমাল জানলার ধারের আসনে বসে ছিল। সে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টা করল কী ব্যাপারে মিছিল যাচ্ছে। মিছিলকারীরা সমস্বরে কিছু একটা বলছিল। সেটা শুনে তমাল বুঝল সেটা আসলে নির্বাচনের প্রচার মিছিল। এখন কীসের নির্বাচন? গত তিন বছর আগে বিধানসভা নির্বাচন হয়ে গেছে। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর বিধানসভা নির্বাচন হওয়ার কথা। ঐ নির্বাচন আবার হবার সময় এখনও আসেনি। আর লোকসভা নির্বাচন তো মাত্র ছ-মাস আগে হয়ে গেল। সেই নির্বাচনে ভোট দেবার অভিজ্ঞতা হয়েছে তমালের। সেই অভিজ্ঞতা খুব ভাল নয়। ভোটকেন্দ্রে ভোট দিতে গিয়েছিল সে দুপুর দুটো নাগাদ। তার ধারণা ছিল ঐ সময়ে গেলে ভোটকেন্দ্রে ভিড় কম হবে। কিন্তু অভিজ্ঞতা হয়েছিল অন্যরকম। সে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে লাইনে দাঁড়িয়েছিল। খুব লম্বা লাইন ছিল না। এক এক করে সবাই এগিয়ে যাচ্ছিল। তমালও একসময়ে প্রিসাইডিং-অফিসারের সামনে পৌঁছল। সেখানে আরও কয়েকজন ভোট-কর্মী ছিল। তাদের একজন তমালের ছবিসহ পরিচয়পত্র দেখতে চেয়েছিল। তমালের কাছে তা ছিল। সেই ছবির তথ্য অনুযায়ী তমালের নাম

ভোটার-তালিকায় খুঁজছিল ভোট-কর্মী। একসময় সে তমালের নাম ভোটার-তালিকায় পেয়েওছিল। কিন্তু দেখা গেল, তমালের ভোট আগেই পড়ে গেছে। এটা কী করে করে সম্ভব হল? তমাল তো আগে ভোট দিতে আসেনি? আর একবার ভোট দিলে সে দ্বিতীয়বার কেন্দ্রে আসবে কেন? তার তো সেরকম কোনও দুরভিসন্ধি নেই? তমাল রীতিমতো তর্ক জুড়ে দিয়েছিল ভোটকর্মীদের সঙ্গে। তখন প্রিসাইডিং-অফিসার এগিয়ে এসেছিল। ভদ্রলোক উত্তেজিত না হয়ে বেশ শান্তভাবে তমালকে বুঝিয়েছিল আসলে কী ঘটেছিল। কেউ একজন তমালের নাম-পরিচয় ভাঁড়িয়ে আগেই ভোট দিয়ে চলে গেছে। তমাল অফিসারকে জিজ্ঞেস করেছিল যে সেটা কীভাবে সম্ভব হল? ভোটারদের পরিচয়পত্রে তো ছবি থাকে। সেই ছবি দেখলেই তো মিথ্যে ভোটার ধরা পড়ে যাবে। উত্তরে অফিসার জানিয়েছিলেন, সব ভোটারের যে ছবিসহ পরিচয়পত্র থাকবে এমন কোনও কথা নেই। অনেকের পরিচয়পত্র থাকে না। তার বদলে অন্যান্য ডকুমেন্ট দেখে তাদের পরিচয় বুঝতে হয়। তমালের হয়ে কেউ যখন ভোট দিয়েই গেছে, তখন তমাল নিয়ম অনুযায়ী টেন্ডার ভোট দিতে পারে। তমালকে ব্যালট-পেপার দেওয়া হবে। সে তার পছন্দমতো প্রার্থীকে ভোটও দেবে। কিন্তু সে নিজের ভোট ব্যালট-বাক্সে ফেলতে পারবে না। তমালের ভোট গোনাও হবেনা। টেন্ডার-ভোট আসলে শুধুই সান্ত্বনা-ভোট। সেই কথা শুনে তমাল রেগেমেগে ভোটকেন্দ্র থেকে চলে এসেছিল।

বাসের জানলা থেকে মিছিলকারীদের কারোর কারোর হাতের পোস্টার দেখে এবং শ্লোগান শুনে তমাল বুঝল যে, লোকসভার উপনির্বাচন হতে চলেছে। মিছিলকারীরা তাদের মনোনীত প্রার্থীকে উপনির্বাচনে জয়ী করার জন্যে জনগণের কাছে আবেদন রাখছে। রাস্তা দিয়ে যে মিছিলটা যাচ্ছিল, সেটা দক্ষিণপন্থী এক রাজনৈতিক দলের মিছিল। সেই মিছিলের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তমালের মনে পড়ল যে, কিছুদিন আগেই তাদের এলাকার এম.পি. (সাংসদ) হঠাৎই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। লোকসভার এক একটা কেন্দ্র আয়তনে খুব বড় হয়। তমাল যে এলাকার বাসিন্দা, সেখানেও তাহলে উপনির্বাচন হবে। তার মানে কিছুদিনের মধ্যে আরও একবার সে ভোট দেবার সুযোগ পাবে। তার জীবনের প্রথম ভোটটি সে দিতে পারেনি। তার জন্যে মনে মনে আফসোস রয়ে গেছে। উপনির্বাচনের তারিখ কবে পড়েছে? চলমান একজন মিছিলকারীর হাতের পোস্টারটি পড়তে পারল তমাল। উপনির্বাচনের তারিখ একুশ জুন। তার মানে প্রায় একমাস সময় আছে এখনও।

বাসের যাত্রীদের মধ্যে নির্বাচন-সংক্রান্ত বাদ-প্রতিবাদ শুরু হয়ে গেছে। বেশির ভাগ যাত্রীর কথাবার্তাতে সমালোচনার সুর। তমাল কান পেতে শুনছিল। যাত্রীদের মধ্যে অনেকেই অভিযোগের ভঙ্গিতে অনেক কথা বলছিল। যেমন, রাস্তাঘাট দিনের পর দিন খারাপ হচ্ছে। সারানোর ব্যাপারে সরকার কিংবা প্রশাসন কোনও

ব্যবস্থা নিচ্ছে না। জিনিসপত্রের দাম হু হু করে বাড়ছে। বড়লোকেরা নাকি ক্রমশ আরও বড়লোক হয়ে উঠছে। আর গরিবেরা গরিব। সেসব দিকে সরকারের তেমন নজর নেই। শুধু কোটি কোটি টাকা খরচ করে বছরভর এখানে সেখানে নির্বাচনই হচ্ছে। তমালের মনে হচ্ছিল, যাত্রীদের অনেকেই ঠিক কথাই বলছে। সে প্রতিদিন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খবরের কাগজ পড়ে। অনেক খবর পড়ে তার ভাল লাগে না আজকাল। চারপাশে শুধু উগ্রপন্থীদের আক্রমণ, হত্যা, রক্তপাত, মহিলাদের ওপর অত্যাচার, ধর্ম নিয়ে গোঁড়ামি, পদস্থ ব্যক্তিদের নৈতিক অধঃপতন। দিনের শুরুতেই এসব খবর পড়তে ভাল লাগে না। একেবারেই ভাল লাগে না তমালের।

আজও সুহাসদের বাড়িতে পৌঁছতে বেশ সময় লাগল। ডোর-বেল বাজাতে কাজের মেয়ে সুমি নয়; ইন্দ্রানী নিজেই দরজা খুললেন। তমালকে দেখে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হাসিতে ভরে গেল। —এসো—এসো তমাল, তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি। বাড়িতে পা দিতে না দিতেই আপ্যায়ন শুরু হল। ইন্দ্রানী প্রথমেই তমালকে নিয়ে গেলেন ডাইনিং-টেবিলে। তমাল মৃদু আপত্তি জানাতে চেয়েছিল। সে জানিয়েছিল যে সে বাড়ি থেকে জলখাবার খেয়েই বেরিয়েছে। কিন্তু ইন্দ্রানী কিছুতেই শুনলেন না। তাঁর বক্তব্য হল, গতকাল তমাল যখন টেলিফোনে ইন্দ্রানীকে তার এ-বাড়িতে আসার কথা জানিয়েছিল, তখন তো তিনি তাকে বলেছিলেন যে, তিনি জলখাবারের ব্যবস্থা করবেন। তাহলে তমাল বাড়ি থেকে খেয়ে বেরোবে কেন? কোনও ওজর-আপত্তি টিকল না তমালের। তাকে খেতে হল—লুচি, আলুর দম, মিষ্টি। তারপর চা। ইন্দ্রানীও চা নিলেন। সুহাস যে ঘরে থাকত সেই ঘরেই সোফাতে বসে ছিল তমাল। বিপরীত দিকের সোফায় ইন্দ্রানী। সুমি মাঝে মাঝে আসা-যাওয়া করছিল রান্নার ব্যাপারে এটা সেটা জানতে। কথাবার্তার ফাঁকে তমাল লক্ষ্য করেছিল সুহাসের ফ্রেমে-বাঁধানো একটা ফোটো তার বাবার ফোটোর পাশেই রাখা হয়েছে। এই ফোটো নতুন। প্রথম দিন যখন তমাল এ-বাড়িতে এসেছিল সে এই ফোটো দেখেনি। সুহাসকে কেমন দেখতে সে জানত না। এখন সে সেই ফোটোর দিকে তাকিয়ে দেখছিল। ইন্দ্রানী উঠে পাশের ঘরে গেছেন। বোধহয় প্রতিবন্ধী মেয়ে খুকুর কোনও প্রয়োজন মেটাতে।

সুহাসের ফোটোর দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে তমালের মনে হল, ওকে ঠিক ওর বাবার মতো দেখতে। বাবার ফোটোটাও তো পাশেই রাখা আছে। সুহাসের বাবার ছিল একমাথা কোঁকড়া চুল। সুহাসেরও তাই। বড় বড় দুই চোখে স্পষ্টভাবে সুহাস তাকিয়ে আছে। মনে হল, তমালের দিকেই তাকিয়ে আছে। একথা ভেবেই তমালের গা শিরশির করে উঠল। তার মনে হল, এই যে তার কোনও বন্ধু নেই, সুহাসের সঙ্গে আগে আলাপ হলে অন্তত তার এই দুঃখটা ঘুচত। সুহাস তার বন্ধু হতে পারত।..... আচ্ছা, সুহাস নাকি ডায়েরি লিখত? কবিতা লিখে রাখত

ডায়েরিতে? কেমন কবিতা লিখত সুহাস? তমালের ভীষণ কৌতূহল হল। সুহাসের ডায়েরি আজ সে কি চাইবে ইন্দ্রানীর কাছ থেকে?

ইন্দ্রানী ঘরে ঢুকলেন। তাঁর কপালে অল্প ঘামের রেখা। আজ একটা অফ-হোয়াইট শাড়ি পরে আছেন ইন্দ্রানী। সেই শাড়ির পাড়ে হালকা জরির কাজ। স্লিভলেস ব্লাউজ। শাড়ির রং-এরই। এত বয়সেও খুব ঝকঝকে ফর্সা ইন্দ্রানী। মাথার চুলে রুপোলি রেখা। তমালের মনে হ'ল, ইন্দ্রানী যথেষ্ট সুন্দরী। আবার তার মনে হ'ল, ওঁকে ঠিক এখনকার সুচিত্রা মিত্র-র মতো দেখতে। ইন্দ্রানীও কি গান গাইতে পারেন? কিন্তু সেটা এখন জিজ্ঞেস করা উচিত নয়। যিনি স্বামী হারিয়েছেন। কিছুদিন আগে হারিয়েছেন সুহাসের মতো ছেলেকে। যাঁর মেয়ে বড় হয়েও বড় হয়নি। প্রতিবন্ধী হয়ে জন্ম থেকে শুয়ে আছে বিছানায়। তিনি আর কী গান গাইবেন? গান তো উঠে আসে হৃদয়ের আনন্দ থেকে। ইন্দ্রানীর মনে তো আনন্দ নেই। শুধু দুঃখের ভার। কিন্তু গানের উৎস কি শুধু আনন্দ? দুঃখ-বেদনাও কি গানের উৎস নয়? কলেজে পড়া একটা কবিতার লাইন মনে পড়ল তমালের। ইংরেজ কবি শেলির কবিতা। স্কাইলার্ক পাখিয়ে নিয়ে কবিতা লিখেছিলেন শেলি। বি.এ. সিলেবাসে ছিল। একটা লাইন তার বেশ মনে আছে—Our sweetest songs are those that tell of saddest thoughts। পরম বেদনা থেকেই তো উঠে আসে সুমধুর সঙ্গীত। ইন্দ্রানী কিছু একটা বলছিলেন। তমাল প্রথমে শুনতে পায়নি।

—কিছু বলছেন মাসিমা? —সে জিজ্ঞেস করল।

—খুকুর শরীরটা কদিন থেকে খারাপ যাচ্ছে। আজ সকালে একটু জ্বরও আছে।

—তাই নাকি? ডাক্তার দেখিয়েছেন?

—হ্যাঁ। আমাদের পাড়ারই ডাক্তার। বয়স্ক। অনেকদিন থেকে আমাদের দেখছেন উনি। খুকুর ধাত উনি জানেন। ওষুধ দিয়েছেন।

—মাসিমা খুকুকে তো আমি এখনও দেখিনি। ওর ঘরে যাওয়া হয়নি। এখন.....

—হ্যাঁ। এসো।..... এসো খুকুকে দেখবে। ওকে পরিষ্কার জামা-কাপড় পরিয়ে দিয়েছি আমি।

ইন্দ্রানীর সঙ্গে তমাল এল পাশের ঘরে। সিঙ্গল খাটের বিছানা। ধবধবে সাদা চাদরের ওপর শুয়ে আছে খুকু। তমাল তাকে দেখে চোখ ফেরাতে পারছিল না। তার মনে হ'ল, সে যেন হুবহু আর এক ইন্দ্রানীকে দেখছে! খুকুর মতো বয়সে ইন্দ্রানীকে কি এরকমই দেখতে ছিলেন? ইন্দ্রানীর মতোই ঝকঝকে ফর্সা খুকুর গায়ের রং। সেই তীক্ষ্ণ নাক। পাতলা ঠোঁট। ছোট, একফালি কপাল। মুখশ্রী অপূর্ব।

—এইমাত্র ওষুধ খেল তো। ও এখন একটু ঘুমোচ্ছে। —বললেন ইন্দ্রানী।

—ও। —তমাল দেখছিল খুকুকে। সত্যিই একেবারে হুবহু মায়ের মতো দেখতে মেয়েটাকে। একটা চাদর দিয়ে ঢাকা রয়েছে ওর শরীর। ওর বয়স কত? ইন্দ্রানী

যেন বলেছিলেন, সুহাসের থেকে প্রায় পাঁচ বছরের ছোট খুকু। সুহাস মারা গেছে একুশ বছর বয়সে। তাহ'লে খুকুর বয়স কি ষোলো? কিন্তু ওর কষ্টটা আসলে কী? খুকুর প্রতিবন্ধকতাটা আসলে কী?..... এই ঘরের চারপাশে তাকাল তমাল। তেমন কিছু আসবাবপত্র নেই এ-ঘরে। আয়তনে ঘরটা ছোট। একটা সিঙ্গল খাট। যাতে শুয়ে আছে খুকু। এছাড়া ঘরের আর একপাশে একটা ছোট টেবিল। সেখানে জলের বোতল, গ্লাস, একটা ট্রেতে চামচ জাতীয় কিছু জিনিসপত্তর। ওষুধের শিশি। আর একপাশে একটা ছোট বুককেস। তাতে কিছু বইপত্তর। ঘরে দুটো চেয়ারও ছিল।

—এখানে বসতে পারো। —বললেন ইন্দ্রানী। তমাল বসল। ইন্দ্রানীও। খুকুর দিকে তাকিয়ে ছিল তমাল। যদি প্রতিবন্ধী না হ'য়ে সুস্থ, স্বাভাবিক হ'ত খুকু। তাহ'লে এক সুন্দর কিশোরী হ'য়ে ও ঘোরাফেরা করত চোখের সামনে। কিশোরী?..... তমাল ভাবল। ষোলো বছরের, একটা মেয়েকে কি কিশোরী বলা যাবে? ওকে 'টিন-এজার' বলাই তো ভাল। চোখ দুটো মুদে খুকু শুয়ে আছে। ওর মুখ দেখলেই অবশ্য বোঝা যায় ও অসুস্থ।

—ওর কষ্টটা ঠিক কী মাসিমা?

—জ্বরের কথা বলছ?

—নাহ,.....ওর এই যে ডিসএবিলিটি.....?

—ও বুঝেছি।..... ইন্দ্রানী একটু ভেবে নিলেন। যেন কী বলবেন, কীভাবে বলবেন তা ভাবলেন।

—প্রথমে বুঝিনি যে ওর ডিসএবিলিটি আছে। যখন খুব ছোট্ট তখন তো শুয়ে থাকত। তবে পা দুটো যেন নাড়াত না। চুপচাপ শুয়ে থাকত। হাতদুটো অবশ্য নাড়তে পারত। আমি প্রথমে অতটা বুঝিনি। ওর বাবার চোখেই অসংগতিটা ধরা পড়েছিল। যে শুয়ে শুয়ে ও হাতদুটো নাড়ছে। কিন্তু পাদুটো নাড়াচ্ছে না। ডাক্তারকে বলা হ'ল, আমাদের পাড়ারই এক ডাক্তার। উনি ভালভাবে দেখলেন মেয়েকে। দেখে বেশ গম্ভীর হয়ে গেলেন উনি। বললেন যে, প্রতিবন্ধীদের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ কোনও ডাক্তারকে দেখাতে হবে। ওঁর মনে হয়েছিল, খুকুর দু-পায়ে ডিসএবিলিটি আছে।

—তখন ওকে একজন অরথোপেডিসিয়ানের কাছে নিয়ে গেলেন?

—হ্যাঁ। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের অনেক ডাক্তারের সঙ্গে সুহাসের বাবার পরিচয় ছিল। উনি নিয়ে গেলেন একজন অরথোপেডিসিয়ানের কাছে। আমি মেয়েকে নিয়ে ওঁর সঙ্গে গেলাম।

—ডাক্তার কী বললেন?

—ডাক্তার অনেকরকম পরীক্ষা করেছিলেন। তারপর বলেছিলেন যে, খুকুর

কোমর থেকে মারাত্মক ডিসএবিলিটি আছে। এটা ওর জন্মগত।

—তার মানে সেই ছোটবেলা থেকে ও শুধু বিছানাতে শুয়েই আছে? হাঁটতে পারেনি কোনওদিন?

—নাহ, হাঁটতে পারেনি কোনওদিন। এই নিয়ে ওর বাবার মনে খুব দুঃখ ছিল। মানুষটা শুধু বলতেন—কার পাপে আমাদের এমন সর্বনাশ হল? আমরা তো কোনওদিন কারোর ক্ষতি করিনি। চিরকাল চেষ্টা করেছি সৎভাবে বেঁচে থাকতে। কোনও মানুষকে ঠকাতে চাইনি। অন্যায়ভাবে পয়সা রোজগার করতে চাইনি। তবুও এমন দুর্ভাগ্য আমাদের হ'ল কেন? খুকুর বাবা প্রায়ই এসব বলতেন। তখন ওঁকে আমি কী বলতাম জানো?

—কী? —জিজ্ঞেস করল তমাল।

—আমি বলতাম কারোর পাপে কিংবা নিজেদের পাপে আমাদের খুকুর এরকম হয়েছে এটা ভাবা অন্যায়। এটা স্রেফ মিসফরচুন। দুর্ভাগ্য। সেটা আমাদের মেনে নিতে হবে। কোনও কোনও মানুষের জীবনে এরকম হয়। প্রথম থেকেই সেইসব মানুষদের জীবন ভুলভাবে শুরু হয়। তার মানে সেই মানুষই যে দায়ী তা নয়। এই যে আমাদের কিংবা বলতে পারো এখন তো আমার একার জীবনে যে এত দুঃখ, এর জন্যে আমি কাকে দায়ী করব? সব দুঃখ আমাকে মেনে নিতে হয়েছে। অন্তত মেনে নেবার চেষ্টা করছি। চরম দুঃখ ঈশ্বর আমাকে দিয়েছেন বলে তো আর জীবন থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারি না? বেঁচে থাকতে তো হবেই। যতক্ষণ না নিজের মতো করে মৃত্যু আসছে। এই জীবন কত সুন্দর। এত দুঃখ পেয়েও আমার মনে হয় জীবন আজও সমান সুন্দর।..... নাহ আমি মৃত্যুর কথা কোনওদিন ভাবি না।,

—আপনি তাহলে ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন?

—বিশ্বাস?..... ঈশ্বর?..... ইন্দ্রানী থেমে গেলেন। চশমার ভেতর দিয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টিতে তাকালেন তমালের দিকে। হাসলেন মৃদু।

তারপর বললেন—শিবমন্দির, কালীমন্দির কিংবা শনিঠাকুরের মন্দিরে প্রতিদিন কত মানুষ যায়। মহিলারাও যায়। তাদের মধ্যে আমাদের মতো বয়স্ক মহিলাদের সংখ্যাই হয়ত বেশি। ওঁরা একরকমভাবে ঠাকুর-দেবতায় বিশ্বাস করেন। দেবতার নামে উপোস করেন। আরও অনেকরকম কৃচ্ছ্রসাধনও হয়ত করেন। আমি কিন্তু তাঁদের দলে নেই। আমি মন্দিরে যাই না। লক্ষ্মীপুজোর দিন, শিবরাত্রির দিন কিংবা নীলষষ্ঠির দিন সারা জীবনে কোনওদিন উপোসও করিনি।

—তাহ'লে একটু আগে যে আপনি বললেন ঈশ্বর আপনাকে চরম দুঃখ দিয়েছেন। সে কথার মানেই বা কী? মানুষের জীবন দুঃখময় তো হতেই পারে। তার জন্যে ঈশ্বরকে দায়ী করব কেন?

তমালের কথার মধ্যে যে ঝাঁঝ ছিল সেটা ইন্দ্রানী অনুভব করেছেন। তিনি মৃদু হাসলেন। বললেন—বুঝতেই পারছি তুমি ঈশ্বর মানো না.....।

—আমার কথা হচ্ছে না। —তমাল বলল। —আপনি মানেন? কেন মানেন?

—দেখো বাবা, কেন মানি তা বলতে পারব না। তবে একটা সত্য যেন আমি অনুভব করি।

—কী সেই সত্য?

—মানুষের জীবনে কোনও একটা শক্তি কাজ করে। হাজার চেষ্টা করলেও মানুষ সেই শক্তির প্রভাব এড়াতে পারে না। এই যে আমার জীবনে পরপর এত মৃত্যু, দুঃখ;—এসবের জন্যে আমি সেই শক্তিকেই দায়ী করি।

—আপনি তাহলে ভাগ্যের কথা বলতে চাইছেন? ফেটালিজম?

—হয়তো তাই।..... তুমি এসব নিয়ে খুব পড়াশোনা কর মনে হচ্ছে।

—খুব হয়তো করি না। পড়াশোনাতে আমি ভাল একটা কিছু করতে পারিনি। অর্ডিনারি বি.এ.। অনার্স ছিল না। কিন্তু আমি নানারকম বাইরের পড়াশোনা করার চেষ্টা করি। নানা পত্র-পত্রিকা পড়ি। লাইব্রেরি থেকে ইচ্ছেমতো বই এনে পড়ি।

—তুমি যে পড়াশোনা করো। নানা ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করো। সেটা তোমার মুখ দেখলেই বোঝা যায়।

—হবে হয়তো। —তমাল লজ্জা পায়। তাকিয়ে থাকে বিছানায় ঘুমন্ত খুকুর দিকে। খুকুর মাথার চুল অবশ্য খুব ছোট করে ছাঁটা। একেবারে যাকে বলে বয়কাট। সেজন্যেই একেবারে বালকের মতো লাগছে খুকুকে। ও কি কথা বলতেও পারে না? নিজের মনের ভাব প্রকাশ করবার ব্যাপারেও কি খুকু প্রতিবন্ধী? সেটাও তো জিজ্ঞেস করতে হয় ইন্দ্রানীকে। কিন্তু তার আগে উনি নিজেই বলতে শুরু করলেন। অনেক দিন পর হয়তো তমালের মতো সমব্যথী একজন শ্রোতা পেয়ে ইন্দ্রানী নিজের দুঃখের কথা বলতে চান।

—শুধু শারীরিকভাবেই নয়, মানসিকভাবেও যে খুকু প্রতিবন্ধী সেটাও জানা গেল কিছুদিন বাদে।

—কীরকম? —তমাল জিজ্ঞেস করল।

—সেটাও ধরা পড়েছিল ওর বাবারই চোখে।..... তখন প্রায় একবছর বয়স ওর। ওর বাবাই লক্ষ্য করেছিল যে, ও কথা বলতে শিখছে না, নিজের মনের ভাব প্রকাশ করার কোনও প্রবণতা যেন ওর মধ্যে আসছে না। শুধু একটাই শব্দ ও মুখ দিয়ে প্রকাশ করত। বিশেষত খিদে পেলে.....।

—সেটা কীরকম?

—সেই শব্দটা হ'ল—জে..... জে..... জে..... জে.....। খিদে পেলে, কোনও কিছুতে বিরক্ত হ'লে বা মনে ফুর্তি হ'লে খুকু ঐ একটা শব্দই বের করত মুখ দিয়ে। যদিও

তার প্রকাশভঙ্গি সবক্ষেত্রে একরকম নয়। ও কখন কী বলতে চাইছে সেটা আগে এ বাড়িতে আমি আর ওর বাবা ছাড়া কেউ বুঝত না।

—সুহাস বুঝত না?

—নাহ, ঠিক বুঝত না।..... তবে সুহাস ওর বোনটাকে খুব ভালবাসত। নিজের হাতে বোনকে খাইয়ে দিত। ওর পাশে ঘুমোত। আর আমি স্পষ্ট বুঝতে পারতাম খুকু তার দাদার সেই ভালবাসাকে বুঝতে পারছে।

—বুঝতে পারত?

—হ্যাঁ। বুঝতে পারত। স্নেহ, ভালবাসা, আশীর্বাদ এসব বোধহয় প্রতিবন্ধীরাও বুঝতে পারে। আমি কতদিন দেখেছি সুহাস আর খুকু পাশাপাশি শুয়ে ঘুমোচ্ছে। আর খুকু এক হাত দিয়ে জড়িয়ে আছে সুহাসকে।

—তাই নাকি?..... সত্যিই আশ্চর্য?..... তমাল বলল। —আচ্ছা ঐ কথাটা শেষ করলেন না মাসিমা?

—কোন্ কথাটা বাবা?

—ঐ যে খুকু শুধু শারীরিক প্রতিবন্ধী নয়। ও যে মানসিক প্রতিবন্ধী সেটাও ধরা পড়ল যখন.....

—হ্যাঁ। মনে পড়েছে।..... ওকে আবার দেখানো হ'ল ডাক্তার। এবার একজন সাইকিয়াট্রিস্ট।

—সাইকিয়াট্রিস্ট?

—হ্যাঁ। মনোরোগ-বিশেষজ্ঞ। বেশ বড় ডাক্তার। তিনি নানাভাবে পরীক্ষা করলেন খুকুকে। এবং কনফার্মও করলেন যে খুকুর মেনটাল ডিসএবিলিটি আছে।

—আশ্চর্য দুর্ভাগ্য আপনার মাসিমা.....। জীবনে এত আঘাত তার পরও যে আপনি হাসতে পারছেন.....।

—আর তাঁর কথা একবার ভাবো? তিনি তো আরও কঠিন সব দুঃখ পেয়েছেন। একের পর এক আঘাত। কিন্তু তবুও তো তিনি ভেঙে পড়েননি! শুধু সৃষ্টি করে গেছেন! কী বিশাল বেঁচে থাকা! সত্যিই যেন ঈশ্বরের মতো।

—কার কথা বলছেন মাসিমা?

—রবীন্দ্রনাথ!

ঠিক এইসময় খুকুর ঘুমটা যেন ভাঙল। প্রথমে পাতলা চাদরের নীচ থেকে শীর্ণ এবং ফর্সা হাতদুটো বেরিয়ে এল খুকুর। মৃদু আড়মোড়া ভাঙল সে। তারপর ধীরে ধীরে চোখ খুলল। আকাশে মেঘ সরে গিয়ে সূর্যের আলো ঈষৎ দৃশ্যমান হ'লে মানুষের যেমন ভাল লাগে, সেরকমই এক ভাল লাগার অনুভূতি বোধ করল তমাল। সে এবার খুকুকে ভাল করে দেখল। সত্যিই খুকুর মুখশ্রী অপরূপ। তার মায়ের মতোই খুকুর তীক্ষ্ণ এবং টিকটিকে নাক, চোখদুটো ভাসা-ভাসা, যেন ঈষৎ

কুয়াশা-জড়ানো দৃষ্টি। পাতলা ফিনফিনে ঠোঁট। ইস্ এই সুন্দর মেয়েটা যদি আর পাঁচজনের মতো সুস্থ এবং স্বাভাবিক হত; হেঁটে-চলে বেড়াতে পারত চোখের সামনে; তাহ'লে কী ভালই না লাগত!..... ইন্দ্রানী এগিয়ে গিয়ে খুকুর কপালে হাত রাখলেন। মুহূর্তের প্রতিক্রিয়ায় খুকু আবার চোখ বুজল। কিছুক্ষণ খুকুর কপালে হাত রেখে উত্তাপ অনুভব করার পর ইন্দ্রানী তমালের দিকে তাকিয়ে উদ্ভাসিত মুখে বললেন—এখন আর জ্বর নেই খুকুর। ডাক্তারের ওষুধ কাজ দিয়েছে!

—তাই নাকি? বাহ ভাল। —তমাল বলল। —আমিও চাই খুকু তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে উঠুক।

ঠিক সেই মুহূর্তে কী আশ্চর্য! খুকুর চোখ তমালের দিকে ঘুরল। তমাল আর ইন্দ্রানীর দিকে নিজের ঊর্ধ্বাঙ্গ একটু যেন পাশ ফেরার মতো বাঁকাল সে। তমালের দিকে তাকিয়ে ছিল খুকুর দুই চোখ। তমালের মনে হ'ল, প্রতিবন্ধী কিশোরীর সেই দৃষ্টিতে নরম স্নিগ্ধতা!

—তোমার উপস্থিতি ওর ভাল লাগছে। —ইন্দ্রানী ফিস্‌ফিস্ করলেন।

—ওকি আমাকে আলাদা করে চিনতে পারছে? হয়ত ওর দাদা সুহাস ভাবছে আমাকে?

—সেটা হতেও পারে। তবে আমার ধারণা, মুখে প্রকাশ করতে না পারলেও খুকু আজকাল অনেক কিছু বুঝতে পারে।

—আপনি কী বলতে চাইছেন ওর মেন্টাল ডিসএবিলিটি কমছে?

—সেটা বলতে পারব না তমাল।..... মেন্টাল ডিসএবিলিটি আদৌ কমে কিনা তা জানাও নেই। আমি শুধু সেই ডাক্তারের কথাগুলো মনে রেখেছি।

—কী কথা মাসিমা?

—ডাক্তার বলেছিলেন, যদি বাড়ির পরিবেশ ভালো থাকে; মানে ওর সামনে চিৎকার-চেঁচামেচি না হয় তাহ'লে দেখবেন ও ভালো থাকবে। ওর চোখ-মুখের এক্সপ্রেশন দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন ও ভালো আছে। তারপর আরও বলেছিলেন ডাক্তার—

—কী?

—যত দিন যাবে, যৌবন আসবে ওর শরীরে, হরমোনাল চেঞ্জ ঘটবে, তখন ধীরে ধীরে ওর ইমপ্রুভমেন্ট হতে পারে। ক্রমশ ও ওর নিজের পদ্ধতিতে ওর আপনজনদের সঙ্গে কম্যুনিকেট করার চেষ্টা করবে।. ... তুমি ওর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করে দেখো না? ইন্দ্রানী তমালের দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

তমাল ভাবছিল সে কী কথা বলবে।..... কী কথা বলা যায়?..... ভাবতে ভাবতে তমাল এগিয়ে এল। খুকুর কপালে আলতোভাবে হাত ছুঁইয়ে বলল—তুমি ভাল হয়ে ওঠো খুকু। আমরা চাই তুমি ভাল হয়ে ওঠো, ভাল থাকো।

খুকু কি বুঝতে পারল তমালের কথা? ইন্দ্রানী দেখলেন, তমালের হাতের স্পর্শ পেয়ে যেন বা পরম আবেশে খুকু চোখ বুজল। তমাল তার হাত এখনও সরায়নি খুকুর কপাল থেকে। খুকু চোখ বুজিয়েই আছে। এবার ইন্দ্রানী দেখলেন, তমালও দেখল, খুকুর মুদে থাকা দুই চোখ থেকে গড়িয়ে নামছে বিন্দু বিন্দু জল। তমাল নিজের ভেতরে বিচিত্র এক ভালো লাগার স্বাদ অনুভব করল। একেই কি বলে মানসিক যোগাযোগ? খুকু কি তমালের শুভেচ্ছা বুঝতে পেরেছে?.....

উচ্ছ্বসিত স্বরে ইন্দ্রানী বললেন—আমি বলছি তোমাকে খুকুর ভালো লেগে গেছে। সবাইকে কিন্তু ও পছন্দ করে না। আমার কত বান্ধবী এসেছে এ বাড়িতে। দু-চারজন আত্মীয়স্বজনও এসেছে। তাদের অনেকেই খুকুকে দেখে অনেক ভাল ভাল কথা বলতে চেয়েছে। কিন্তু আমার মেয়ে তাদের অনেককেই পছন্দ করেনি। মুখ দিয়ে ওর আওয়াজ বেরিয়েছে— জে..... জে..... জে.....। আমি বুঝতে পারি সেই শব্দের অর্থ।

—সেই শব্দের অর্থ কী? —তমাল তখনও খুকুর কপাল স্পর্শ করে আছে।

—নানা পরিস্থিতিতে নানা অর্থ। তবে যে লোকজন পছন্দ হবে না খুকুর, তখন সে যদি বলে জে..... জে..... জে..... জে..... তাহলে বুঝতে হবে সে বলতে চাইছে, আমি পছন্দ করছি না এই মানুষদের। আমাকে পাশ ফিরিয়ে দাও। আমি দেয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে থাকব। যতক্ষণ না তা করছি, ও চেঁচাতেই থাকবে— জে..... জে..... জে..... জে.....। বাইরের মানুষ খুকু সত্যিই পছন্দ করে না। শুধু তোমার ক্ষেত্রেই দেখছি অদ্ভুত। ও চুপচাপ শুয়ে আছে। ও কাঁদছে! মানুষ কখন কাঁদে? দুঃখ পেলে কাঁদে। আবার আনন্দ পেলেও কাঁদে। আমি নিশ্চিত, ঐ যে ওর চোখ দিয়ে নিঃশব্দে অশ্রু বেরিয়ে আসছে এটা ওর আনন্দের কান্না.....। —এই কথা বলে ইন্দ্রানী খুকুর দিকে ঈষৎ ঝুঁকে পড়লেন। নিজের শাড়ির আঁচল দিয়ে পরম মমতায় মুছে দিচ্ছিলেন খুকুর চোখের জল। তমালের কীরকম লজ্জা করল। সে নিজের হাত সরিয়ে নিল খুকুর পাণ্ডুর কপাল থেকে। ইন্দ্রানী তাকালেন তমালের দিকে।

—একটা অনুরোধ করব?

—কী মাসিমা?

—তুমি নিজের হাতে একটু ফলের রস খাইয়ে দেবে খুকুকে? কাল থেকে ও ভাল করে কিছু খায়নি। এখন ওর জ্বর ছেড়েছে। মানসিকভাবেও বেশ ভাল বোধ করছে ও। এখন একটু ফলের রস খাবে। আমার ধারণা, তুমি খাওয়াতে চাইলে ও খাবে।

—বলছেন যখন আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি.....।

—দাঁড়াও। ফলের রস নিয়ে আসি। —ইন্দ্রানী বেরিয়ে গেলেন।

পিরিচে ফলের রস নিয়ে এলেন ইন্দ্রানী। আর একটা চামচ। পারবে কি তমাল? চামচ দিয়ে ফলের রস খুকুর মুখ ঢেলে দিতে পারবে? তাকে কখনও কাউকে কিছু খাওয়াতে হয়নি। ছোটবেলায় তার জ্বর হত। মাঝে মাঝেই জ্বর হত। তিন-চার মাস অন্তর যেন নিয়ম করে জ্বর হত। ধূম জ্বর। এত জ্বর উঠে যেত যে তা নামাবার জন্যে মাথায় জলপটি দিতে হত। তখন, তমালের মনে আছে, মা তাকে ফলের রস খাওয়াতেন।

—দেখো, খুকু তোমার দিকে কেমন তাকিয়ে আছে! —ইন্দ্রানী বললেন। তমাল তাকিয়ে দেখছে। সত্যিই তমালের উপস্থিতিতে খুকুর মুখের ভাব, চোখের রং যেন পালটে গেছে। কীরকম উজ্জ্বল দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে আছে তমালের দিকে। বুকের গভীরে মৃদু এক ভালোলাগার অনুভব বোধ করছে তমাল। সত্যিই কি তার উপস্থিতি খুকুর মনে আনন্দ দিচ্ছে? কথা বলতে পারে না খুকু। কিন্তু সব বুঝতে পারে? আচ্ছা, কথা বললে ও কি বুঝতে পারে? ইন্দ্রানী খুকুর শিয়রের কাছে গিয়ে ওর মাথাটা পরম স্নেহে তুলে ধরলেন। তমালকে বললেন—তুমি চামচ করে ফলের রস ওর মুখে ঢেলে দাও। দেখি ও নেয় কি না। তমাল চামচে ফলের রস ঢেলে দিতে গেল খুকুর মুখে। আর কী আশ্চর্য? খুকু ঠিক হাঁ করল। তমালের দেওয়া ফলের রস গ্রহণ করল সে। ইন্দ্রানী উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে উঠলেন—তুমি ফলের রস দেওয়ায় খুব খুশি হয়েছে খুকু। দেখো দেখো কীরকম বারবার হাঁ করছে! অর্থাৎ চাইছে!..... ওহ কি আনন্দ আমার! তোমাকে খুকুর খুব ভালো লেগে গেছে। তমাল তুমি রোজ আসবে। তোমার সঙ্গ পেলে খুকু আনন্দ পাবে। আমার মনেও আর কষ্ট থাকবে না। সারাদিন মেয়েটা একা একা বিছানায় পড়ে থাকে। সুমি তো কিচেনে থাকে। ওকে আর কী সঙ্গ দেবে? মাঝে মাঝে সুমিকেও ওর ভালো লাগে না। কাউকে ভালো না লাগলে আমি বুঝতে পারি। খুকু মুখ ঘুরিয়ে নেয়। মুখ ব্যাজার করে থাকে। মাঝে মাঝে যখন খুকু রেগে যায় মুখ দিয়ে বিশ্রি শব্দ করে।..... একমাত্র তোমার ক্ষেত্রেই দেখলাম অন্য। ভেবে অদ্ভুত আনন্দ হচ্ছে আমাব। খুকু তোমাকে অ্যাকসেপ্ট করেছে! আমার অনুরোধ তুমি মাঝে মাঝে এসো তমাল। খুকুর কাছে বসে থাকো। ওকে সঙ্গ দাও। ও বড় একা তমাল। ওর মতো দুর্ভাগ্য আমাদের কারোর নয়। যাকে ওর পছন্দ হয় সে যদি ওকে সঙ্গ দেয় তাহলে ও আনন্দে থাকবে। বলা যায় না হয়ত ওর অবস্থা ইমপ্রুভ করবে.....।

—ইমপ্রুভ করবে? তার মানে কি ও আমাদের মতো কথা বলতে পারবে?

—তা হয়তো পারবে না। অতটা আশা করা ঠিক হবে না। কিন্তু ডাক্তার আমাকে বলেছিলেন.....

—কী বলেছিলেন ডাক্তার?

—যদি ওর মনে আনন্দ থাকে, তাহলে ক্রমশ আরও ভালোভাবে ও নিজের

মনের ভাব প্রকাশ করতে পারবে। আরও স্পষ্টভাবে। সেটাই বা কম কী? মানুষের সঙ্গে মানুষের কম্যুনিকেশনটাই তো আসল ব্যাপার তাই না? ওর মনে নানা কারণে প্রতি মুহূর্তে যে আবেগের জন্ম হচ্ছে, সেইসব আবেগকে ও যদি আমাদের কাছে কিছুটা প্রকাশ করতে পারে, তাহলে ওরও লাভ, আমাদেরও লাভ.....। তমাল ভাবছিল এই কথাটা ইন্দ্রানী বড় ভালো বলেছেন।..... মানুষের সঙ্গে মানুষের কম্যুনিকেশনটাই আসল ব্যাপার। ঠিকই তো। মানুষ তো আর গাছ নয়। যে বছরের পর বছর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকবে। অথচ নিজেদের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান ঘটার কোনও সুযোগ নেই। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে হ'লে তাকে চারপাশের অন্যান্য মানুষের সঙ্গে কম্যুনিকেট করতে হবে।

পারল তমাল। ধীরে ধীরে, সাবধানে সে সবটুকু ফলের রস খাওয়াতে পারল খুকুকে। নির্বিঘ্নে খেল খুকু। জ্বরটা ছেড়ে গেছে তো। তাই খিদেও পেয়েছিল ওর। খাওয়ার পর খুকু তার সুন্দর, ভাসা-ভাসা, বড় বড় চোখে তমালের দিকে তাকাল। বুকের গভীরে আবার যেন ভাললাগার অনুভব বোধ করল তমাল। যেন খুকু বলতে চাইছে—তুমি খুব ভাল। তুমি রোজ আমার কাছে আসবে তো? চেঁচিয়ে কিছু প্রকাশ করতে তমালের কীরকম লজ্জা করল আবার। সে মনে মনে বলল—আসব খুকু। আমি আবার আসব। তোমাকে খাইয়ে দেব আবার। তুমি ভাল থেকো।

ইন্দ্রানী বললেন—খুকুর চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছে। ও এখন ঘুমোবে। চলো আমরা পাশের ঘরে যাই।..... খুকুর দুই চোখ মুদে আছে। ইন্দ্রানী পাতলা চাদরটা ওর গলা অব্দি টেনে দিলেন। খুকু ঘুমিয়ে পড়েছে।

পাশের ঘরে এসে ঘড়ির দিকে খেয়াল করল তমাল। বেলা বারোটা বাজে। এবার ফিরতে হবে তাকে।

ইন্দ্রানী জিজ্ঞেস করলেন—তুমি তো গ্র্যাজুয়েট তাই না?

—হ্যাঁ মাসিমা।

—চাকরি-বাকরির চেষ্টা করছ নিশ্চয়ই।

—হ্যাঁ করছি। পাবলিক সার্ভিস কমিশন থেকে সরকারি চাকরির জন্যে যে পরীক্ষা নেওয়া হয়, এ বছর সেই পরীক্ষায় বসব ভাবছি। এখনও চার মাস দেরি পরীক্ষার। প্রিপারেশন চালাচ্ছি।

—তুমি খুব ভাল তমাল। তুমি ঠিক একটা চাকরি পেয়ে যাবে। জানো তো আমার সুহাসেরও চাকরির সব ঠিক হয়ে গিয়েছিল?

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। সিমেনস্ বলে একটা কোম্পানি আছে না? ওখানে চাকরি হয়েছিল ওর জয়েন করার কথা ছিল। কিন্তু তারপর তো সব অন্যরকম ঘটল.....। ইন্দ্রানী মুখ নিচু করে কয়েক মুহূর্ত বসে রইলেন। নাহ, কাঁদছেন না। কথায় কথায় ইন্দ্রানী কাঁদেন না। প্রকাশ্যে একেবারেই কাঁদেন না। হয়তো নির্জনে কাঁদেন।

—তোমাকে খুব পছন্দ হয়েছে খুকুর। এটা ভেবে ভালো লাগছে। তুমি আসবে তো আমাদের বাড়ি? তোমার সঙ্গ পেলে খুকু ভালো থাকবে।

--হ্যাঁ মাসিমা। আসব।..... একটা কথা বলব?

—কী?

—আপনি বলেছিলেন সুহাস ডায়েরি লিখত। কবিতা লিখত। কিন্তু ছাপাত না। আপনি ওর কয়েকটা ডায়েরি দেবেন? আমি পড়ে দেখব। আমি সুহাসকে বুঝতে চেষ্টা করব মাসিমা। ওর সঙ্গে আমি কীরকম যেন একাত্মতা বোধ করি।

ইন্দ্রানী কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন তমালের দিকে। তারপর ফিস্‌ফিস্ করে বললেন—তোমার সঙ্গে আমাদের আগে থেকে আলাপ হ'ল না কেন গো? তুমি যদি সুহাসের বন্ধু হতে তাহলে হয়ত ও নিজেকে ওভাবে পুড়িয়ে দিতে পারত না। তোমার টানে, বন্ধুতার টানেই ও বেঁচে থাকত।..... এবার অবশ্য ইন্দ্রানী নিজেকে সংবরণ করতে পারলেন না। তাঁর দুই চোখে অশ্রুর আভাস। নিজেকে আড়াল করতেই যেন তিনি উঠে গেলেন। খানিক বাদে যখন ফিরে এলেন তখন ইন্দ্রানীর হাতে দুটো ডায়েরি। তমালকে ডায়েরি দুটো দিলেন ইন্দ্রানী।

বললেন—ওর বইপত্তরের মধ্যে খুঁজে আমি এরকম দুটো ডায়েরি পেয়েছি। কিছু কিছু পড়েছিও। তুমিও পড়ে দেখতে পারো।

—পড়ে আবার আমি ফেরত দিয়ে দেব মাসিমা।

—ইচ্ছে হ'লে রাখতেও পারো। আমি তোমাকে ডায়েরিগুলো দিয়েই দিলাম। আমি ওগুলো নিয়ে আর কী করব? সুহাসের স্মৃতি আমাকে প্রতি মুহূর্তে পোড়াচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে জ্বলে যাচ্ছি আমি।..... সুহাস নেই। ওর অনেক স্মৃতি আমার চারপাশে ছড়িয়ে আছে। ছড়িয়ে থাকবে। ডায়েরি দুটো নাহয় আমি তোমাকে দিলাম। —ইন্দ্রানী হাসলেন। ম্লান হাসি।

১১

সভাকক্ষ নিঃশব্দ। শুধু শীতাতাপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের এক চাপা আওয়াজ। সবাই উদগ্রীব। রিজিওন্যাল ম্যানেজার এখনই মিটিং শুরু করবেন। শৈবাল মিটিং আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করবার আগে একবার এজেন্ডা-নোটস্-এ চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিল। ঠিক কীভাবে শুরু করবে সেটাও ভাবছিল। তার জুরিসডিকশনে ব্যাঙ্কের যতগুলো শাখা আছে, তাদের ম্যানেজারদের ডাকা হয়েছে আজ এই মিটিং-এ। এরকম মিটিং মাসে দুবার করার কথা। পনেরো দিন অন্তর। গতবারের মিটিং কী কারণে যেন করা হয়নি। সুতরাং এক মাস বাদে আজ আবার বসা হচ্ছে। মূলত আলোচনা হবে নানা শাখা-ব্যাঙ্কগুলোতে ক্রেডিট-রেসিও-র পরিমাণ বাড়ছে না কমছে সেটা রিভিউ করার

জন্যে। এজেন্ডা-নোটস দেখে নিয়েছে শৈবাল। মিটিং-এ যাদের আসবার কথা প্রত্যেকেই এসে গেছে। আলোচনা শুরু করতে যাবে শৈবাল। এমন সময় চেনা সুরে গান বেজে উঠল। শৈবালের মোবাইল-ফোন বাজছে। সভাকক্ষে উপস্থিত সবাই তাকিয়ে আছে তার দিকে। শৈবাল তাড়াতাড়ি পকেট থেকে যন্ত্রটা বের করল। সুইচ টিপতে পর্দায় আলো জ্বলে উঠেছে। একটা নম্বরও ভেসে উঠেছে। সুধার নম্বর। শৈবালকে ফোন করছে সুধা। শৈবাল কি কেটে দেবে ফোন-কলটা? এখন তো মিটিং শুরু করতে হবে। এখন সে একঘর লোকের সামনে কী কথা বলবে সুধার সঙ্গে? কিন্তু কল্‌টা কেটে দিয়েও কোনও লাভ নেই। শৈবাল জানে। সুধা ভীষণ নাছোড় মহিলা। একটু একগুঁয়ে এবং জেদী। শৈবাল যতবার কেটে দেবে কল্‌টা সুধা ততবারই ফিরতি রিং করে যাবে। সেক্ষেত্রে কী মিটিং চলাকালীন মোবাইল বন্ধ রাখবে? সেটা করাও ঠিক হবে না। কারণ শৈবালের মতো একজন ব্যস্ত এগজিকিউটিভের পক্ষে অফিস-চলাকালীন মোবাইল বন্ধ করে রাখাটাও সমীচীন নয়। চেনা গানের সুর বেজেই যাচ্ছে। সুধার সঙ্গে কথা বলতে হলে আড়ালে যেতে হবে। শৈবাল আর সময় নষ্ট না ক'রে উপস্থিত সবায়ের দিকে তাকিয়ে একবার বলল—এক্সিউজ মী! তারপর সভাকক্ষের বাইরে নির্জন করিডোরে চলে গেল। ইউনিফর্ম-পরনে একজন পিয়ন ট্রেতে অনেকগুলো জলের গ্লাস নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে সভাকক্ষের দিকেই আসছিল। স্বয়ং আর.এম.-কে সামনে দেখে সে শশব্যস্ত হয়ে বলল—নমস্কার স্যার! শৈবাল সেটা শুনেও শুনল না। মোবাইল-ফোনের সুইচ টিপে সে জিজ্ঞেস করল—হ্যালো?

—অসময়ে ফোন করলুম বোধহয়। —সুধারই স্বর। নির্ভার। দুশ্চিন্তামুক্ত যে এখন সুধা সেটা তার স্বর শুনেই শৈবাল বুঝেছে।

—এখন একটা মিটিং শুরু করতে যাচ্ছি।..... কিছু দরকার?

—দরকার ছাড়া বোধহয় ফোন করতে নেই?

—আহ সুধা।..... আই অ্যাম জাস্ট গোয়িং টু স্টার্ট আ মিটিং উইথ মাই ম্যানেজারস.....। —শৈবালের স্বরে বিরক্তি ফুটে উঠেছিল।

—ঠিক আছে। আমি ফোন কেটে দিচ্ছি। সরি টু হ্যাভ ডিস্টার্বড্ ইউ। —রাগতভাবে বলল সুধা। তারপর সত্যিই ও-প্রান্ত থেকে কেটে দিল যোগাযোগ।

এই এক দোষ সুধার। সে সময় অসময় বোঝে না। সব নারীই বোধহয় একটু খামখেয়ালী হয়। সব নারীই বোধহয় চায় যে, সে যখন যা চাইবে, পুরুষকে তা মানতে হবে। বাধা কিংবা আপত্তি পেলেই সে রাগ করবে। অভিমান করবে। তারপর অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে, সাধ্য-সাধনা করে তার সেই অভিমান ভাঙতে হবে। নারী ও পুরুষের মধ্যে এ এক চিরকালীন খেলা। অন্য সময়ে এই খেলা শৈবালেরও ভাল লাগে। দুজন নারীর সঙ্গেই তাকে এই খেলা খেলতে হয়। একজন তার স্ত্রী—অনিতা। আর একজন তার.....তার কী? মেয়েছেলে? সোজাসুজি দেখতে

গেলে হয়ত তাই। সুধার সঙ্গে সম্পর্কের মূল আকর্ষণ হল—শরীর। কিন্তু এটা বোধহয় বলা ঠিক হবে না যে, সুধা শুধুই শরীর-সর্বস্ব। তার চরিত্রের নানা পরত আছে। সে তো খুব সাধারণ মেয়ে নয়। সুধা কবিতা পড়ে। শৈবাল যদিও কবিতাকে, বিশেষত তথাকথিত আধুনিক কবিতাকে খুব ভয় পায়। এ ছাড়া সুধা বেছে বেছে আর্ট-ফিল্ম দেখে। তার পাল্লায় পড়ে শৈবাল সেরকম ফিল্ম দু-একটা দেখেছে। কলকাতা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে নন্দনে দেখেছিল। একটা স্পেনের ছবি। বেশ নগ্নতা ছিল। এক সুন্দরী মেয়ে কথায় কথায় ব্রা-এর হুক খুলে তার প্রেমিককে আহ্বান করছিল শরীরের খেলায়। সেটা দেখতে বেশ ভালই লেগেছিল শৈবালের। মেয়েদের, বিশেষত ইউরোপিয়ান তন্বীর নগ্নতা দেখতে পাওয়া তো সৌভাগ্যের ব্যাপার। বয়স নির্বিশেষে সব পুরুষেরই তা ভাল লাগে। কিন্তু অন্য আর একটা ফিল্মের মাথামুন্ডু বোঝেনি শৈবাল। সেটা ছিল সত্যিকারের আর্ট-ফিল্ম। যা দু-চক্ষের বিষ শৈবালের। ফিল্মের আবার আর্ট, নন-আর্ট কী? সব চলচ্চিত্রই শিল্প। কোনওটা ভালো শিল্প। কোনওটা খারাপ শিল্প। যদিও সেই বিদঘুটে, বিদেশি ছবিটা দেখে সুধা বলেছিল যে দারুণ ছবি। চারটে অস্কার পেয়েছিল ছবিটা। এছাড়া মাঝে মাঝে গ্রুপ-থিয়েটারও দেখে সুধা। কোনও কোনওদিন একা দেখে। কোনও কোনওদিন শৈবালকেও যেতে হয়। অতএব সুধা একজন আঁতেঁল মহিলা। এ ব্যাপারে কোনও ভুল নেই। সেই কারণেই বোধহয় খেয়ালি। একটু এলোমেলো। তার এই খামখেয়ালিপনা আরও বেড়েছে এ কারণে যে, সে ধরাবাঁধা জীবনের আওতার বাইরে। একসময় তার সংসার ছিল। এখন সুধা সংসারের নয়। তার খামখেয়ালিপনা যেন দিনদিন বাড়ছে।

কিন্তু এখন শৈবাল কী করবে? রাগ করে সুধা নিজের মোবাইল-ফোনের কানেকশান বন্ধ করে দিয়েছে। কী মুশকিলেই না পড়া গেল। এদিকে মিটিং শুরু হবে। তাই সবাই হা-পিত্যেশ করে বসে আছে। এখনই আলোচনা শুরু করা দরকার। ব্যাপারটা খারাপ দেখাচ্ছে। তবু কয়েক মুহূর্ত ব্যয় করে সুধার মান ভাঙানো উচিত।

সুতরাং আবার সুধার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করতে শৈবাল বাধ্য হল। আজকের মিটিং-এর চেয়ারম্যান সে। সে যখন শুরু করবে, তখনই মিটিং শুরু হবে। আর তার মতো ব্যস্ত মানুষের মোবাইলে পরপর ফোন আসতেই পারে। সুতরাং মিটিং শুরু হতে একটু দেরি হলেই বা ক্ষতি কী?

সুধার মোবাইল বাজছে। কিন্তু সুধা ধরছে না। নিজের মোবাইলের স্ক্রিনে শৈবালের নাম্বার সুধা দেখেছে। তাও ধরছে না। এরকমই হওয়ার কথা। একবার সুধার অভিমান হলে তা ভাঙতে অনেক সময় লাগে।

ফোন বেজে বেজে একসময় কেটে গেল। এখন উপায়? সুধা তো ইচ্ছে করে ফোন ধরছে না। কিন্তু শৈবালেরও জেদ চেপে গেছে। সে আবার সুধার নাম্বারে ডায়াল করল। এবারও ফোন বাজছে। শৈবাল মনে মনে বলছিল, সুধা প্লিজ—কথা বল। আই অ্যাম ইন আ হারি। কথা বলো সুধা.....!

এটা কি টেলিপ্যাথি? ওপ্রান্ত থেকে ভেসে এল সুধার কণ্ঠস্বর—হ্যাঁ.....কী বলছ?

—সুধা কিছু মনে কোরো না। আমি আসলে একটা মিটিং শুরু করতে যাচ্ছি। আমি পরে তোমার সঙ্গে কথা বলছি।

.....আমি কি আর কিছু বলেছি? তুমি মিটিং-এ আছো শুনেই তো আমি লাইন অফ্ করে দিলুম।

—নাহ, তুমি রাগ করেছ।

—আহা, বুড়ো খোকা!..... কনডাক্ট দ্য মিটিং অ্যাটেনটিভলি। এই কথা বলে সুধা নিজেই লাইন কেটে দিল। শৈবাল এখন নিশ্চিন্ত। তাকে যখন 'বুড়ো খোকা' বলে সম্বোধন করল সুধা, তখন সে খুব একটা অভিমান করেনি। মিটিং শেষ হলেই শৈবাল আবার সুধাকে ফোন করবে।

বেশ খুশি মনেই শৈবাল মিটিং শুরু করল। একেবারে গোড়ায় সভাপতি হিসেবে একটু বক্তৃতা। আজকের মিটিং-এর উদ্দেশ্য কী সেটা ব্যাখ্যা করা। ক্রেডিট রেশিও এবং অন্যান্য কাজকর্মের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের অভিমত কী সেটাও জানাতে হল উপস্থিত অফিসারদের। তারপর এক একটা ব্রাঞ্চ থেকে রিপোর্ট নেবার পালা। মধ্যিখানে আধ ঘন্টার ব্রেক লাঞ্চ-প্যাকেটের সদব্যবহারের জন্য। চা-বিস্কুট মিটিং চলাকালীনই দুবার পরিবেশিত হয়েছে। বেলা বারোটায় শুরু হয়েছিল শৈবালের মিটিং। শেষ হল চারটে নাগাদ। অতক্ষণ বসে বসে নানা রিপোর্ট-পাঠ আর সেই সংক্রান্ত বাগ-বিতন্ডা শোনা। মিটিং শেষ হতে নিজেকে বেশ বিধ্বস্ত মনে হচ্ছিল শৈবালের। সে নিজের চেম্বারে ঢুকে আর্দালিকে জানাল যে, আর কোনও ভিজিটরের সঙ্গে সে আজ মিট্ করবে না। সে এখন কিছুক্ষণ একা থাকতে চায়। জরুরি কয়েকটা ফাইল আছে টেবিলে। সে এখন কাজ করতে চায়। আর্দালি যেন ক্যান্টিন থেকে এক কাপ ব্ল্যাক-কফি নিয়ে আসে।

নিজের চেম্বারে ঢুকে প্রথমে টয়লেটে ঢুকল শৈবাল। বেশ কিছুক্ষণ তলপেটে চাপ অনুভব করছিল। হালকা হল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে টাইয়ের নট্ আলগা করে নিল। বেরোবার সময় আবার টাইট করে নিলেই চলবে। পকেট থেকে চিরুনি বের করে চুলটা গুছিয়ে নিল একটু। তারপর টয়লেটের বাইরে এসে রিভলভিং চেয়ারে নয়, নরম সোফায় গা এলিয়ে দিল। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত যন্ত্র তো চলছিলই। তার সঙ্গে মাথার ওপর ঘুরছে পাখা। আরাম লাগছিল শৈবালের। খানিক বাদেই আর্দালি কালো কফি নিয়ে এল। কফির কাপে চুমুক দিয়ে একটা সিগারেট ধরাল শৈবাল। এভাবে রিল্যাক্স করতে করতেই শৈবালের মনে পড়ল এখনই সুধার মোবাইলে যোগাযোগ করা দরকার। এখন তার লোকেশান কোথায় হতে পারে? নিশ্চয়ই তার অফিসে। এক ইনটেরিয়র ডেকরেশন সংস্থায় কাজ করে সুধা। হঠাৎ কী এমন হল যে, শৈবালকে অফিসে ফোন করে বসল? কোনো অসুবিধের মধ্যে পড়েনি তো মেয়েটা? তার একমাত্র ছেলে পড়ে দার্জিলিং কনভেন্টে। ছেলেরও

অসুখ-বিসুখ করতে পারে। হঠাৎ বিপদে পড়লে সুধা কার সঙ্গে যোগাযোগ করবে? শৈবালের সঙ্গে ছাড়া? এরকম ভাবতে ভাবতে শৈবাল সত্যিই সুধার জন্যে প্রকৃত উদ্বেগ বোধ করল। সুধার মোবাইল প্রথমে এনগেজড় সঙ্কেত দিল। তারপর খানিক বাদে শৈবাল শুনল রিং হচ্ছে। একটু দেরি করে রেসপন্ড করল সুধা। সে বুঝেছে, শৈবালই ফোন করছে।

—হ্যাঁ। বলো.....। —নিরাবেগ স্বর সুধার।

—এখন আমি ফ্রি হয়েছি। মিটিং শেস। কথা বলতে পারব। এবার বলো তো দেখি হঠাৎ জরুরি তলব করেছিলে কেন?.... এনি ট্রাবল?

—নো ট্রাবল।

—বাপ্পা ভাল আছে?

—বাপ্পা ভাল আছে।

—তাহ'লে?

—তুমি কি মনে করো আমার সঙ্গে তোমার শুধু দরকারের সম্পর্ক?

—না রে বাবা!..... আজ তোমার মেজাজ এত খেপচুরিয়াস হয়ে আছে কেন?

--তুমি আমার কথা একটুও ভাবছ না তাই। আমি একেবারে একা থাকি এটা কি তুমি জানো না? তিনদিন তোমার কোনও খবর নেই। আমার খোঁজ নেওয়ার দরকার মনে করলে না?

—সুধা—প্লিজ ডোন্ট মিস আনডারস্ট্যান্ড মি। আমি তো আসলে কলকাতাতেই ছিলাম না। তুমি জানো অফিসের কাজে আমি মুর্শিদাবাদ গিয়েছিলাম। সেখান থেকে মালদা। কয়েকটা ব্যাঙ্কে ইনসপেকশনের কাজ ছিল। গতকাল ফিরেছি। আজ সকালেই গুরুত্বপূর্ণ মিটিং। যোগাযোগটা করব কখন বলো?

—কেন? রাতের দিকে মোবাইলে একটা ফোন করা যেত না? বাইরে থেকে তুমি কাউকে ফোন করোনি? নিজের বউকেও না? এটা কি আমাকে বিশ্বাস করতে হবে?

—আচ্ছা বাবা অন্যায় হয়ে গেছে। মাফ চাইছি।

—অন্যায়ের খেসারত দিতে হবে তোমায়! —সুধার স্বরে লঘুতা।

—খেসারত?

—হ্যাঁ মশাই। খেসারত।

—সেটা কী?

—এখুনি চলে আসতে হবে আমার এখানে।

—এখুনি?..... তোমার অফিসে?

—আজ্ঞে না।..... বাড়িতে।

—তুমি আজ অফিস যাওনি?

—নাহ।..... ছুটি নিয়েছি। আজ একটা স্বপ্ন দেখেছি। বিশ্রি স্বপ্ন। ঘুমটা সেই

যে চটকে গেল আর ঘুম এল না। শরীর ম্যাজম্যাজ করছিল। মাথাও ধরেছিল বেশ। তাই আর অফিস গেলুম না।

—কিরকম স্বপ্ন দেখেছ গো সুধা?

—ফোনে এতসব কথা বলা যায় না কি? তুমি চলে এস। এখনই। আজ রাতে আমার এখানেই কাটাবে।

—আজ রাতে?

—কেন? অসুবিধে আছে?

—পরপর দুদিন বাড়ি ছিলাম না। গতকাল ফিরেছি রাতে। সকাল হতেই আবার অফিস চলে এসেছি। এখনও বউ-ছেলের সঙ্গে ভাল করে কথাই বলা হয়নি। আবার আজকে রাতে বাড়িতে থাকব না। ব্যাপারটা খারাপ দেখাবে না?..... হঠাৎ রাতে বাড়িতে থাকব না। কারণই বা কী দেখাব?

—ও..... তার মানে আমি তোমার হাতের পুতুল? যখন তোমার দরকার হবে তখন আমার কাছে আসবে। আমি তোমাকে শরীরী সুখ দেব। আমার ইচ্ছে বলে কিছু থাকবে না? তুমি কি ভাবো আমাকে? তোমার রক্ষিতা?

—ওহ সুধা! ডোন্ট বি সো হ্যারস। মাইন্ড ইওর ল্যাংগোয়েজ।

—আমি কিছু ওজর-আপত্তি শুনতে চাই না। টু নাইট ইউ মাস্ট স্টে উইথ মি। ও. কে.?

শৈবাল উত্তর দিল না। হঠাৎ সুধাকে এত টাফ মনে হচ্ছে কেন? ও তো এরকম নয়। এটা তো ঠিক শৈবাল দু-নৌকোয় পা রেখে চলেছে। একদিকে সংসার সামলাচ্ছে। অন্যদিকে সুধার সঙ্গে এই অবৈধ জীবন। সুধা সেটা বোঝে না তা নয়। দুটো জীবন কীভাবে চালু রাখবে এ ব্যাপারে শৈবালের নানা প্যাঁচ-পয়জার, মিথ্যের আশ্রয় নেওয়া এসব সুধা সবই জানে। মাঝে মাঝে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মিথ্যাচার করতে গিয়ে শৈবাল যে বেশ টেনশনে ভোগে এটাও সুধা বোঝে। তাহ'লে আজ হঠাৎ এরকম অযৌক্তিক আবদার কেন করছে সুধা?

—কী হল? আজ রাতে আসছ তো? থাকছ তো?

—হ্যাঁ আসছি।

—কটার মধ্যে?

—সন্ধে ছটার মধ্যে।

—থ্যাঙ্ক ইউ। —সুধা ঝট্ করে কানেকশন কেটে দিল। শৈবাল চুপচাপ ভাবল কিছুক্ষণ। আজকের মানসিক লড়াইতে সুধাই জিতল। শৈবাল বেশ জোর দিয়ে, স্পষ্টভাবে বলতে পারল না যে, আজ সুধার বাড়িতে রাত কাটাতে তার অসুবিধে আছে। কেন সে এ কথাটা বলতে পারল না? কী বলবে অনিতাকে? কোন চুলোয় কনফারেন্স করতে যাবে সে? অনিতা যদি সন্দেহ করে? শৈবাল অনুভব করল সে নিজের জীবনকে এক জটিলতার গাড্ডায় ফেলে দিয়েছে। একদিকে অনিতাকে

দিনের পর দিন বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে বলতে হয় তাকে। অন্যদি.ক সুধার আবদার সামলাতে হয়। এরকম কতদিন চলবে? সুধার সঙ্গে তার এই গোপন সম্পর্কের পরিণতি কী? অফিসে শৈবালের তিনটে টেলিফোন। একটা অফিসের মধ্যে ইনটারকম লাইন। অন্য একটা পি.এ.-র মাধ্যমে। আর একটা ফোনে সরাসরি যোগাযোগ করা যায়। সেই ফোনটা টেবিলের দিকে একটু ঝুঁকে টেনে নিল শৈবাল। নিজের বাড়ির নম্বরে ডায়াল করল। বানিয়ে আর একটা মিথ্যে কী বলা যায় সেটা ভাবছে শৈবাল। বিপ্ বিপ্ বিপ্ করল টেলিফোন। তারপর যোগাযোগ হল। অনিতাই ধরল ফোনটা।

—হ্যালো?.....

—আমি বলছি। —শৈবাল বলল। —একটা কথা আছে।

—কী কথা গো? —অনিতার স্বরে উদ্বেগ। কৌতূহলও।

—আমাকে আজ বিকেলের ফ্লাইটেই দিল্লি যেতে হবে।

—দিল্লি? কেন গো? তুমি তো পরপর তিনদিন বাড়ি ছিলে না। গতকালই ফিরলে। আজ আবার দিল্লি? কবে ফিরবে?

—আগামিকাল.....বিকেলের দিকে।

—তুমি কদিন বাড়িতে ছিলে না বলে আজ অনেকরকম রাঁধলুম। তুমি রাতে খাবে বলে। তুমি আজ বাড়িতে খাবে না?

—কী করে খাবো বলো? আমার ফ্লাইট তো সাড়ে পাঁচটায়।

—তাহ'লে রান্নাগুলো নষ্ট হবে।

—নষ্ট হবে কেন? তুমি আর তমু খেয়ে নেবে।

—আমি আজ খাব না। এবেলা আমার উপোস। আজ বেস্পতিবার। এদিন বিকেলে আমার উপোস জানো না? গুরুদেবের নির্দেশ।..... বেস্পতিবার একবেলা উপোস। আর শনিবার সারাদিন।

—অত উপোস করো কেন অনিতা? কী আর এমন বয়স তোমার? এর মধ্যেই বুড়ি পিসিমাদের মতো.....

—এই যাহ! ওরকম বলতে নেই। যবে থেকে গুরুদেবের কাছে দীক্ষা নিয়েছি, এই দুদিন আমাকে উপোসে থাকতে হয়।

—তোমার এই দিনরাত গুরুদেব গুরুদেব, উপোস আর উপোস আমার শুনতে ভাল লাগে না অনিতা। এসব বয়স্ক মহিলারা করে। আগেকার দিনের বয়স্ক মহিলারা। তুমি তো একালের মেয়ে। এখনকার মেয়েরা ওসব করে না।

—এই প্লিজ ওরকম বোলো না। দীক্ষা যখন নিয়েছি। তুমি ঠাকুর দেবতা মানো না তাই ওরকম বলছ। শুধু মেয়েরা কেন, অনেক পুরুষও উপোস করে। ভক্তি করে ঠাকুর-দেবতাকে। কত মানুষ গুরুদেবের আশ্রমে আসে দেখি তো.....।

—যাকগে ছেড়ে দাও। তোমার যা মন চায় করো। তোমার কোনও কাজে আমি

তো বাধা দিইনি।

—অনেক সৌভাগ্য করলে তোমার মতো স্বামী পাওয়া যায়। —বলে অনিতা। আর শৈবালের বুকের মধ্যে গুরগুর করে ওঠে একটা হাসি। অনিতার কাছে সে হল আদর্শ স্বামী? এত বোকা আর সরল তার বউ! দিনের পর দিন সে প্রতারণা করছে তার সঙ্গে সেটা ধরার ক্ষমতাও নেই অনিতার। আরও একটা জিনিসের অভাব অনিতার মধ্যে। পুরুষ হিসেবে শৈবালের যে একটা চাহিদা আছে অনিতার কাছে, সেটা সে ধর্তব্যের মধ্যেই আনে না। তার শারীরিক চাহিদার ব্যাপারে অনিতা পুরোপুরি উদাসীন। সে কারণেই তো শৈবালকে বেছে নিতে হয়েছে আর একটা অবৈধ জীবন। আর একটা মিথ্যের জীবন। বিশেষত যখন সুযোগ এসেছে। সুধার সঙ্গে আলাপ খুবই কাকতালীয় তাই না? স্বামীহারা একজন নারী তার কাছে সাহায্য চেয়েছে। সে সাহায্য করেছে। বিনিময়ে. ...

—কী ব্যাপার? তুমি চুপ হয়ে গেলে কেন?..... হ্যালো?

—হ্যাঁ বলো।..... শুনছি।

—আর কী বলব? তোমাকে কি আজ দিল্লি যেতেই হবে?

—যেতেই হবে।

—তাহ'লে আগামীকাল সন্ধে নাগাদ বাড়ি ফিরবে?

—হ্যাঁ।

—সাবধানে থেকো। আমি তো সর্বক্ষণ ঠাকুরকে ডাকব। তোমার কিন্তু খুব খাটুনি যাচ্ছে। অফিস খাটিয়ে নিচ্ছে খুব। তোমার কদিন রেস্ট দরকার।

—তমু কোথায়? —শৈবাল ইচ্ছাকৃতভাবেই প্রসঙ্গান্তরে যেতে চায়।

—ও তো নিজের ঘরে আছে। কী একটা পড়ছে। কথা বলবে?

—হ্যাঁ ডাকো।

কিছুক্ষণের নীরবতা। লাইন সচলই থাকে।

—হ্যাঁ বলছি বাবা। —তমালের গলা।

—অফিসের যা কাজের চাপ তোমার সঙ্গে তো কথা বলাই হয় না.....।

—তুমি নাকি আজ বাড়ি আসছ না?

—ইভনিং ফ্লাইটে দিল্লি যাব। অফিসের কাজ।

—ও.....।

—তোমার প্রিপারেশান কেমন হচ্ছে?

—হচ্ছে মোটামুটি।

—অপরেশ স্যারের কাছে পড়তে যাচ্ছো না?

—গত রবিবার তো উনি ব্যস্ত ছিলেন। আমাকে নিয়ে বসতে পারেননি। আবার আগামী রবিবার যাব।

—হ্যাঁ যাবে। শোনো একটা এইম নিয়ে এগোতে হবে। তোমার বয়স বেড়ে

যাবে হু হু করে। একটা চাকরি তো তোমাকে পেতে হবে? যত দিন যাচ্ছে চাকরির মার্কেট কিন্তু খুব খারাপ হচ্ছে। আমাদের ব্যাঙ্কেও লোক নেওয়া হবে। পরীক্ষা হবে। পুজোর আগেই। ঐ পরীক্ষাও তোমাকে দিতে হবে। তোমাকে কমপিটিশনের মধ্যে আসতে হবে। কমপিটিশানকে তুমি ভয় পাও। এটা ঠিক নয়।

তমাল নিরুত্তর। টেলিফোনের মধ্যে সাঁ সাঁ সাঁ শব্দ।

—যা বললাম শুনলে? তমু?

—হ্যাঁ শুনেছি। —তমালের স্বরের শীতলতা শৈবালকে কি স্পর্শ করে?

—তোমার মা-কে দাও ফোনটা।

—হ্যাঁগো কী বলছ?

—তাহ'লে ঐ কথা রইল? আমি আজ ইভনিং ফ্লাইটে দিল্লি.....

—হ্যাঁ। ঠিক আছে। সাবধানে থেকো। ঠাকুর তোমায় ভালো রাখবেন। আমি সর্বক্ষণ ঠাকুরকে ডাকব।

টেলিফোন কেটে দেয় শৈবাল। সে অনুভব করে তীব্র এক বিরক্তিতে তার মন ছেয়ে আছে। কী যে অনিতা সবসময় ঠাকুর ঠাকুর করে। বলে না—জন্ম মৃত্যু বিবাহ—সবই মানুষের কপাল। কথাটা ঠিক। শৈবালের স্ত্রী-নির্বাচন সঠিক হয়নি। অনিতার মতো এরকম সেকেলে মানসিকতার, ক্রেডিবল মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হওয়াটা যে খুব যথাযথ হয়েছে তা বলা যাবে না। বরং সুধার মতো আধুনিক-মনস্ক, তীক্ষ্ণধী মেয়ের সঙ্গে যদি তার বিয়ে হত?..... একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শৈবাল। জীবনে সবকিছু কি মনের মতো হয়। মানুষ চায় এক। পায় আর এক।..... কিন্তু এটা কী ঠিক করছে সে? অনিতা তাকে বিশ্বাস করে বলে দিনের পর দিন তাকে মিথ্যে বলছে। প্রতারণা করছে তার সঙ্গে। শুধু অনিতার সঙ্গে কেন? ছেলের সঙ্গেও তো সে প্রতারণা করছে। মিথ্যে বলছে ছেলেকেও। যদি কোনওদিন এরা বুঝতে পারে শৈবাল তাদের এতকাল মিথ্যে বলেছে। অফিসের কাজের বাহানা দিয়ে রাত কাটিয়েছে একটা বেশ্যার সঙ্গে?..... হ্যাঁ, বেশ্যা ছাড়া সুধা আর কী? এক উচ্চ-মার্গের বেশ্যা। হাজব্যান্ডকে হারানোর পর অন্য এক পুরুষকে বিয়ে করতে পারত সুধা। নতুন করে আবার জীবন শুরু করতে পারত। ছেলে তো খুবই ছোট। সে নিশ্চয়ই নতুন বাবাকে মেনেও নিতে পারত। কিন্তু জীবনের সেই মসৃণ, সুস্থ, সহজ রাস্তায় গেল না সুধা। শৈবালের সঙ্গে অবৈধ জীবন বেছে নিল। কেন বেছে নিল? নেহাতই স্বার্থের খাতিরে! সুধা বুঝেছে শৈবালের হাতে ক্ষমতা আছে। প্রতিপত্তি আছে। শৈবাল নিজের প্রভাব খাটিয়ে তাকে ব্যাঙ্ক থেকে সহজ কিস্তিতে ঋণের ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছে। চাকরিক্ষেত্রে অনেক ঝুঁকি নিয়েছে সুধার জন্যে।..... আচ্ছা সুধার বদলে যদি কোনও পুরুষ তার কাছে সুধার মতো সাহায্যপ্রার্থী হত, তাহ'লে কি তার জন্যে শৈবাল এতটা করত? নিশ্চয়ই করত না। এটা তো খুব স্পষ্ট যে সুধার আকর্ষণেই শৈবাল অফিসে নিজের পদমর্যাদাকে ব্যবহার করে এতটা করেছে। আরও করবে হয়ত।

শুধুই সুধার শরীরের আকর্ষণে। কিন্তু সেই আকর্ষণের শিকার হয়ে যাচ্ছে না তো শৈবাল ক্রমশ? সুধা তাকে আজকাল ডোমিনেট করতে চায়। মাঝে মাঝে অযৌক্তিক আবদার করে। যেমন আজকে। শৈবাল আজ সুধার আবদারে 'না' বলতে পারল না কেন? এভাবে অনিতার কাছে, ছেলের কাছে মিথ্যে বলে কেন সে রাত কাটাতে যাচ্ছে সুধার সঙ্গে? কেন আবার? সুধার শরীরের নেশায়। শরীরটা যেমন সুধার সম্পদ। তেমনই তার ধারাল কথাবার্তা, লাস্য, হাস্যরসবোধ সুধার অন্যতম পুঁজি। কোনও নারীর ক্ষেত্রে শরীরের সঙ্গে বৈদগ্ধ্য যদি যুক্ত হয়; তাহলে সেই নারীর আকর্ষণ অগ্রাহ্য করা কোনও পুরুষের পক্ষেই বোধহয় সম্ভব নয়।

নিজের ঘূর্ণি চেয়ারে বসে মৃদুমন্দ দোল খেতে খেতেই শৈবাল সুধার নগ্ন শরীরটা কল্পনা করল। বিছানায় তার উথালপাতাল কামের প্রকাশ কল্পনা করল। আর ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়ল। আজ সে সুধার অপরূপ শরীরকে প্রাণভরে ভোগ করবে। কলিং-বেল বাজাল শৈবাল। তার চেম্বারের দরজা ফাঁক হল। মুখ বাড়াল আর্দালি।

—কিছু বলছেন স্যার?

—ড্রাইভারকে গাড়ি লাগাতে বলো। আমি বেরোব।

—ইয়েস স্যার।

বাইরে এসে চারপাশে একনজর তাকিয়ে শৈবালের মনে হ'ল, আজকের বিকেলটা বড় মনোরম। পরিষ্কার আকাশ। মৃদু বাতাস। রাস্তাঘাটে মানুষজন হাঁটছে নির্বিঘ্নে। নির্বিবাদে বয়ে চলেছে জীবন। গাড়ির চালক কোথায় যেতে হবে জিজ্ঞেস করায় শৈবাল তাকে টালিগঞ্জের দিকে যেতে বলল। সেখান থেকে কবরডাঙা। তবে টালিগঞ্জে পৌঁছে গাড়ি ছেড়ে দেবে শৈবাল। সেখান থেকে অটো ধরবে। তার অপরাধের কোনও চিহ্ন সে রাখতে চায় না।

১২

মোহিত চৌধুরীর দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সরব হওয়ার ব্যাপারটা যে পার্টি ভালোভাবে নেয়নি, সেটা বুঝতে বেশি সময় লাগেনি অপরেশের। প্রথম আঘাত তিনি পেয়েছিলেন যেদিন পাড়ার লাইব্রেরিতে রবীন্দ্র-জয়ন্তী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অপমানিত হলেন বিশ্রীভাবে। তারপর ক্রমশ তিনি বুঝতে পারলেন যে, পার্টির কাছে তাঁর গুরুত্ব কমছে। দলের স্থানীয় শাখায় তাঁর একটা বিশেষ পদ ছিল। তিনি সাংস্কৃতিক বিভাগের সদস্য-সচিব ছিলেন। নানারকম সাংস্কৃতিক কাজকর্মের আয়োজন করতেন অপরেশ। বিশেষ বিশেষ দিন পালন করা। কম্যুনিস্টদের কাছে যা আদর্শ দিন হিসেবে গুরুত্ব পায়। যেমন, মে ডে। বিশ্ব শান্তি দিবস। সাম্রাজ্যবাদ শক্তির বিরুদ্ধে কালা-দিবস পালন। এইসব বিশেষ দিনে কী কী সাংস্কৃতিক কর্মসূচি নেওয়া

হবে; তা কমিটির অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে বসে মিটিং করে ঠিক করার দায়িত্ব ছিল অপরেশের। এসব কাজে অপরেশ আনন্দও পেতেন বেশ। তিনি পড়ুয়া মানুষ। দিনের মধ্যে অনেকটা সময়ই বই পড়ে কাটান। তাঁর বাড়িতে নিজস্ব বইয়ের সংগ্রহও রীতিমতো বিস্ময়কর। ইতিহাস, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে অনেক দুষ্প্রাপ্য বই তাঁর সংগ্রহে আছে। সাহিত্যের বইও আছে। তবে তুলনায় অল্প। আর বই কেনাও অপরেশের এক প্রিয় নেশা। বক্তৃতা দিয়ে অপরেশ লোক জড়ো করতে পারেন ভালোই। এক সময় রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করতেন। তাঁর বক্তৃতা শুনতে নিমেষের মধ্যে ফাঁকা তেমাথা কিংবা চৌমাথা মানুষের মাথায় ভরে যেত। এছাড়া অপরেশের লেখার হাতও খারাপ নয়। স্থানীয় পত্র-পত্রিকায়, পার্টির ইস্তাহারে তিনি অনেক প্রবন্ধ লিখতেন। এরকম যোগ্য ব্যক্তিকে সাংস্কৃতিক বিভাগের দায়িত্ব দিয়ে পার্টি কোনও ভুল করেনি।

কিন্তু মোহিত চৌধুরীর দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার পর থেকে অপরেশ বুঝতে পারলেন, তাঁর আগের গুরুত্ব যেন রাতারাতি কমে এল। ঐতিহাসিক মে দিবস পালন করার জন্যে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে তা আলোচনা করার জন্যে অপরেশ কমিটির একটা মিটিং ডাকলেন। স্থানীয় পার্টি-অফিসের তিনতলা বাড়ি। একতলার একটি ঘরে সাংস্কৃতিক কমিটির মিটিং ডাকা হত। নির্দিষ্ট দিনে সন্ধে ছটা নাগাদ সেখানে পৌঁছে অপরেশ দেখেছিলেন, মিটিং-এ কেউ আসেনি। এরকম আগে কখনো হয়নি। তবুও অপরেশ ভেবেছিলেন, হয়ত কোনও কম্যুনিকেশন গ্যাপ হলেও হতে পারে। প্রায় ঘন্টাখানেক সেই ঘরে অপেক্ষা করার পরও যখন কেউ এল না, তখন অপরেশ বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। মে দিবসের আর মাত্র দুদিন বাকি ছিল। মিটিং ডাকতেই সেবার দেরি হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং বেশ চিন্তিত ছিলেন অপরেশ। কর্মসূচি কীভাবে পালন করা হবে সেটা আলোচনা না করে নিলে খুবই মুশকিল। পার্টির মিটিং-এ তাঁকে জবাবদিহি করতে হবে। সেদিনই পার্টি-অফিসের দোতলায় স্থানীয় নেতা সুজিত মন্ডলের ঘরে ছুটলেন অপরেশ। স্থানীয় শাখা অফিসে সুজিত মন্ডলই ছিলেন প্রধান নেতা। কিন্তু সুজিতের ঘরে গিয়ে শুনলেন তিনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করছেন। অপরেশ একজন পুরনো সদস্য। রুদ্ধদ্বার বৈঠকের মাঝেই তিনি সুজিতের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। যদিও তিনি সেই বৈঠকে আমন্ত্রিত নন। এরকম ভেবেই অপরেশ সভাকক্ষের বন্ধ দরজা ঠেলে ঢুকতে যাবেন, বাধা পেলেন। জিতেন নামের এক ছোকরা তাঁকে বাধা দিল—মিটিং চলছে। এখন ভেতরে যাবেন না।

—একি জিতেন? তুমি আমাকে এসব বলছ? আমি সুজিতবাবুর সঙ্গে একটা কথা বলেই চলে আসব।

—নাহ অপরেশদা, বারণ আছে। আপনার যদি তেমন কিছু জিজ্ঞেস করার থাকে, আমাকে বলুন না? আমি সুজিতদাকে বলব। ওঁর কোনও কিছু বলার থাকলে

আমার মাধ্যমে তা জানাবেন।

—রাতারাতি সব নিয়ম পালটে গেল নাকি? —অপরেশের বেশ রাগ হয়েছিল। কিন্তু উপায়ই বা কী? মে দিবসের ব্যাপারটা কীভাবে পালন করা হবে সে ব্যাপারে সুজিত মন্ডলের সঙ্গে আলোচনা তো করা দরকার? জিতেনের মাধ্যমেই তিনি প্রশ্নটা জানালেন সুজিতকে। এক মিনিটও গেল না। জিতেন সভাকক্ষের মধ্যে ঢুকল আর বেরিয়ে এল।

—কী হল? কী বললেন সুজিতবাবু?

—আপনাকে চলে যেতে বললেন সুজিতদা।

—মানে?

—উনি বললেন মে দিবস কীভাবে পালন করা হবে সে ব্যাপারে মিটিং হয়ে গেছে। আপনাকে ওসব নিয়ে আর ভাবতে হবে না।

—সে আবার কী? —অপরেশ সত্যিই কিছু বুঝতে পারছিলেন না। তিনি মিটিং করলেন না। অথচ সব ঠিক হয়ে গেল? তার মানে কী.....

হ্যাঁ। তার মানে অপরেশ যা ভেবেছিলেন তাই। তাঁকে ক্রমশ নানাভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হ'তে লাগল যে, তাঁর ওপর পার্টির আস্থা নেই। তিনি যেন বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে গেলেন। অন্য সদস্যরা তাঁকে যেন এড়িয়ে যেতে লাগল। কয়েকজন মিলে হয়ত কিছু আলোচনা করছে। অপরেশকে দেখেই সবাই চুপ করে যেত। যেন তিনি শুনে ফেললে আলোচিত বিষয়ের বিশেষ গোপনীয়তা নষ্ট হয়ে যাবে। এভাবেই চলছিল। অপরেশ ক্রমশ একা আর বিচ্ছিন্ন বোধ করতে লাগলেন। নিজেকে তিনি যাবতীয় রাজনৈতিক কার্যকলাপ থেকে গুটিয়ে নিলেন। তারপর একসময় পার্টির মিটিং-এ যাওয়াই ছেড়ে দিলেন। তাঁর পড়াশোনা বাড়ল। কিন্তু রাজনীতি থেকে তিনি ক্রমশ দূরে সরে এলেন। আরও দুঃখ পেয়েছিলেন তিনি এটা ভেবে যে, নেতারা তাঁকে ভুল বুঝল। তিনি ভেবেছিলেন, মোহিতের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হওয়া পার্টির স্বার্থেই প্রয়োজন। মোহিতের দু-নম্বরি কাজকর্মে সাধারণ মানুষের চোখে পার্টির ভাবমূর্তিই নষ্ট হচ্ছে। সেই ভাবমূর্তির যাতে আরও ক্ষতি না হয়, সে কারণেই তিনি মোহিতের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সভায় মুখ খুলেছিলেন। কিন্তু পরে বুঝেছিলেন, মোহিতের হাত অনেক লম্বা। তিনি পার্টির জেলাস্তরের নেতাদের ভুল বুঝিয়েছিলেন। অপরেশের বিরুদ্ধে অনেক লাগানি-ভাঙানি করেছিলেন। ফলে নেতারা অপরেশের প্রতি রুষ্ট হয়েছিলেন।

দীর্ঘ তিন বছর সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে দাড়িয়েছিলেন অপরেশ। পার্টির তেমন কোনও খোঁজখবর রাখেননি। কিন্তু কিছুদিন আগে হঠাৎ একদিন বাড়িতে একটা ফোন পেয়ে তিনি বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

একদিন ছুটির দিন বিকেলের দিকে ফোনটা এসেছিল।.....

অপরেশ প্রথমে ফোন ধরেননি। ধরেছিলেন তাঁর স্ত্রী। ওপ্রান্ত থেকে যে ব্যক্তি

টেলিফোন করেছিল, সে অপরেশকে চাওয়ায় স্ত্রী তাঁকে রিসিভার বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। হ্যালো বলায় অপরেশ যার স্বর শুনেছিলেন তাতে বেশ অবাকই হয়েছিলেন।

—অপরেশদা কেমন আছেন? —ওপ্রান্ত থেকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। গলার স্বর শুনে ব্যক্তিকে চিনেছিলেন অপরেশ; কিন্তু ঐ ব্যক্তি যে তাঁকে ফোন করবে তা আশা করেননি বলেই তাঁকে অনিশ্চয়তার সঙ্গে জিজ্ঞেস করতে হয়েছিল—কে বলছেন?

—আমাকে চিনতে পারছেন না? আমি দীপক মহান্তি বলছি।

—ও আচ্ছা। দীপকবাবু?..... কী ব্যাপার?..... পার্টির আঞ্চলিক স্তরে অবশ্য ইতিমধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয়েছিল। অপরেশ প্রকাশ্যে মোহিত চৌধুরীর দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার ঠিক দেড় বছরের মাথায় মোহিত সাসপেন্ড হয়েছিলেন। হয়ত পার্টি বুঝেছিল, সত্যিই মোহিত দুর্নীতিগ্রস্ত। তাহ'লে অপরেশ তাঁর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ভুলটা কী করেছিলেন? পার্টি তার ওপর বিরূপ হল। আবার পরে মোহিতের বিরুদ্ধে অ্যাকশনও নিল। তার মানে কি পার্টির নেতৃবৃন্দ বুঝেছিলেন যে, অপরেশ যা করেছিলেন ঠিকই করেছিলেন। মুহূর্তে এতসব কথা জলের স্রোতের মতো বয়ে গিয়েছিল দ্রুত, অপরেশের মনে। দীপক মহান্তির থেকে অপরেশ পার্টিতে অনেক সিনিয়র সদস্য। তবে দীপকের ভাবমূর্তিও ভাল। সে বরাবরই পার্টির হোলটাইমার। সর্বক্ষণের কর্মী। অপরেশের কানে এসেছিল যে, মোহিতকে সরিয়ে সেই পদে দীপক মহান্তি এসেছে। এবং সেই কারণেই দীপকের পায়াও যে ভারী হয়েছে তা বুঝেছিলেন অপরেশ যখন তিনি দেখেছিলেন যে দীপক একদিন অপরেশের কাছে মার্কসবাদ বিষয়ে অনেক প্রাথমিক পাঠ নিয়েছেন, সেই দীপকই রাস্তাঘাটে তাঁকে কদাচিৎ দেখলে কথা বলতেন না; মুখ ঘুরিয়ে চলে যেতেন। তাহলে এতদিন পর দীপক আবার যেচে তাঁকে ফোন করছেন কেন?

—আগে কেমন আছেন বলুন অপরেশদা?

—ভালই তো আছি। খারাপ থাকব কেন?

—আপনার সঙ্গে আমাদের একটু দরকার আছে।

—আমার সঙ্গে?..... দরকার?

—হ্যাঁ।..... একটু কথাবার্তা বলতে হবে আপনার সঙ্গে। অপরেশ চুপ করেছিলেন। দীপকদের প্যাঁচের অন্ত নেই। এটা আবার কী ধরনের প্যাঁচ?

—হ্যালো?..... অপরেশদা শুনছেন?

—শুনছি।

—আপনার বাড়িতে আমরা একটু যাব।

—তোমরা আমার বাড়িতে আসবে?

—হ্যাঁ।..... আগামী রবিবার সকালে ফ্রি আছেন?

—আগামী রবিবার?..... সকালে?..... কখন?

—এই ধরুন বেলা দশটা নাগাদ। আমরা দু-তিনজন যাব আর কী।

—কী ব্যাপারে ঠিক বুঝতে পারছি না।

—অরণি সান্যালের নির্দেশেই আমরা আপনার কাছে যাব। দীপকের কথার গুরুত্ব তখন বুঝেছিলেন অপরেশ। অরণি সান্যালের নাম তো আর অপরেশের কাছে অজানা নয়। দীর্ঘদিন তিনি জেলাস্তরে পার্টির সর্বময় কর্তা। এই লোকটির বয়স যে খুব বেশি তা নয়। অপরেশের থেকে বেশ ছোট। অপরেশের এখন পঞ্চান্ন চলছে। অরণি তাঁর থেকে সম্ভবত দশ বছরের ছোট। কিন্তু তা হ'লে কী হবে? জেলা নেতৃত্বের দায়িত্ব অরণিকে দেওয়া হয়েছে প্রায় সাত-আট বছর আগে থেকে। অপরেশ তাঁকে অল্প অল্প চেনেন। দেখেছেন নানা সভায়, অনুষ্ঠানে। পার্টির আঞ্চলিক অফিসে মাঝে মাঝে মিটিং করতে আসতেন অরণি। তখনও দেখেছেন। বেশ ধারাল এবং তীক্ষ্ণ চেহারা অরণির। শ্যামবর্ণ। রোগা চেহারা। সবসময়েই চোস্ত পাজামা এবং পাঞ্জাবি পরে থাকেন। একমাথা কোঁকড়া চুল। মুখ ঝকঝকে, পরিষ্কার। আগে যখন দেখেছেন তাঁকে অপরেশ, তখনই অরণির মাথায় বিন্যস্ত চুলে রুপোলি রেখা। কথাবার্তাও খুব ধারাল অরণির। অপরেশ যা শুনেছেন অরণি খুবই শিক্ষিত। অর্থনীতির অত্যন্ত ভাল ছাত্র। নিঃসন্দেহে বলা যায় পার্টির নিচুতলার সদস্যদের মধ্যে অনেক গোপন বিরোধ, দলাদলি থাকলেও সারা জেলা জুড়ে বিশাল এক সংগঠনকে অরণি নিজের দক্ষতায় মোটামুটি ধরে রাখতে পেরেছেন।

দীপক মহান্তির কথায় সেই অরণির উল্লেখ শুনে অপরেশ বিষয়ের গুরুত্ব বুঝেছিলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বলতে হয়েছিল—ঠিক আছে। এসো তোমরা রবিবার সকাল দশটা নাগাদ।

যে রবিবার অপরেশের কাছে পড়তে এসে তমাল ফিরে গিয়েছিল। তমাল দেখেছিল অপরেশের বাড়ির সামনে কয়েকটা স্কুটার। কারা এসেছিল এবং কী ব্যাপারেই বা অপরেশ সেদিন সকালে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন অপরেশ সেটা না বুঝেই তমালকে ফিরে যেতে হয়েছিল। সেদিনই আসলে দীপক মহান্তি আরও দুজনকে নিয়ে এসেছিলেন অপরেশের বাড়ি। বহুদিন পর পার্টির কয়েকজন সদস্যকে কাছে পেয়ে অপরেশ উগরে দিয়েছিলেন তাঁর মনের জমে থাকা ক্ষোভ। একজন একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন তিনি। আপাদমস্তক কম্যুনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী মানুষ। বরাবরই ভীষণ গুরুত্ব দিয়ে এসেছেন যাবতীয় মূল্যবোধকে। ব্যক্তিগত জীবনে, ভোগবাদকে একেবারেই প্রশ্রয় দেন না। নিজের বাবার আদর্শের কথা মনে রেখে কখনও স্কুলের ক্লাসে পড়ানো ছাড়া জীবনে একটাও প্রাইভেট টুইশান করলেন না। সেই অপরেশ যখন মোহিত চৌধুরীর দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেন তখন তাঁকে চূড়ান্তভাবে অপমান করা হল? প্রকাশ্য সভায় পরিকল্পিতভাবে নিচুতলার কর্মীদের দিয়ে পচা ডিম ছুড়ে মারা হ'ল তাঁর গায়ে? তাঁকে রাস্তাঘাটে দেখে পরিচিতজনেরা মুখ ঘুরিয়ে

চলে যেত। সেইসব অপমান কোনওদিন ভুলতে পারবেন অপরেশ? ক্রমশ তিনি খুব একা আর বিষণ্ণ হ'য়ে গেছেন। কেঁচোর শরীরে আচমকা নুনের ছিটে লাগলে যেমন, তেমনই কুঁকড়ে গেছেন নিজের ভেতরে।

—সেই তোমরাই আবার অনেক পরে মোহিত চৌধুরীকে দুর্নীতির দায়ে সাসপেন্ড করলে। তাহলে পরোক্ষে কী প্রমাণিত হল? আমিই ঠিক ছিলুম? তা সত্ত্বেও আমার কাছে এসে ক্ষমা চাওয়া হল না.....। —অপরেশ দীপকদের বলছিলেন।

—কে বলল আমরা অনুতপ্ত নই? তাহ'লে আজ আপনার এখানে আমরা এলুম কেন? আপনি জানবেন আমরা যে নিজের ইচ্ছেতে-এসেছি তা নয়। স্বয়ং অরণিদা-র নির্দেশে এসেছি। এটাই কি প্রমাণ করে না যে, আপনার প্রতি একসময় যে ব্যবহার করা হয়েছে তাতে আমরা, আমাদর পার্টি অনুতপ্ত? —দীপক মহান্তি বললেন।

—সে না হয় বুঝলুম। কিন্তু আমি ভাবছি.....

—কী?

—কী ব্যাপার নিয়ে তোমরা এতদিন বাদে আমার কাছে এসেছ? তাই আমি ভাবছি। তোমরা তো খোশগল্প করতে আসার লোক নয় হে। তোমাদের আমি কি কম চিনি?

—আবার সেই আপনার ব্যাঁকা ব্যাঁকা কথা। এতদিন পর বাড়িতে এলুম, একটু চা-টাও তো অফার করবেন না কি? —হাসতে হাসতে বলেছিলেন দীপক। সঙ্গের দুজন ছোকরা হাসছিল। এদের একজনকে চেনেন অপরেশ। একসময় স্কুলে তাঁর ছাত্র ছিল। আর একজনকে চিনতে পারলেন না। এরা সব পার্টিতে পরে এসেছে। নেতা দীপক মহান্তির ল্যাং-বোট।

—ওগো শুনছ? —অপরেশ লঘু স্বরে হাঁক পেড়েছিলেন।

—হ্যাঁ বলো? —অপরেশের স্ত্রী আঁচলে হাত মুছতে মুছতে এসেছিলেন।

—দীপক এসেছে। এরা সব এসেছে। চা-টা কিছু দাও?

—হ্যাঁ। দেব তো। চায়ের জল এই চাপালুম। —স্ত্রী কিচেনে ফিরে যাচ্ছেন, ঠিক সেই সময় ডোর-বেল বেজেছিল। তখনই অপরেশের বাড়িতে এসেছিল তমাল। তাকে দেখে স্ত্রী একটু ধন্দে পড়েছিলেন। তমালকে অপেক্ষা করতে বলে ছুটে গিয়েছিলেন অপরেশকে তমালের আসার খবর জানাতে। অপরেশ কপাল কুঁচকে একটু ভেবেছিলেন। তারপর স্ত্রীকে বলেছিলেন—আজ তো এরা এসেছে। এখন আর ওকে পড়াতে পারব না। বলো ব্যস্ত আছি। পরের রবিবার এই সময় আসতে বলে দাও।..... তমালকে সেরকমই বলেছিলেন অপরেশের স্ত্রী। তমাল কিছুই বুঝতে না পেরে চলে গিয়েছিল সেদিন।

চা-মিষ্টি পর্ব শেষ হবার পর দীপক বলেছিলেন—আপনি কি আমাদের একেবারে বয়কট করেই চলবেন অপরেশদা?

—আমি বয়কট করেছি? না কি তোমরা আমাকে বয়কট করেছ। পার্টির ইমে
যাতে পাবলিকের কাছে খারাপ না হয় তার জন্যে আমি একজনের দুর্নীতির বিরুদ্ধে
মুখ খুলে রাতারাতি তোমাদের চক্ষুশূল হয়ে গেলাম। তোমরা আমাকে কীভা
অপমানটাই না.....

—থাক অপরেশদা, থাক। —দীপক মহান্তি ডান হাত এমনভাবে তুলেছিলে
যে, থামতে বাধ্য হয়েছিলেন অপরেশ। —পুরনো কথা আর তুলবেন না প্লিজ
তারপর গঙ্গার জল অনেক বয়ে গেছে। যার বিরুদ্ধে আপনি প্রকাশ্যে মুখ খুলেছিলে
তিনি আর এখন আমাদের মধ্যে নেই। তাঁকে পার্টি বের করে দিয়েছে। কিন্তু ত
সত্ত্বেও আপনি চুপচাপ বসে গেলেন কেন? আপনি তো বরাবর রাজনীতি ক
মানুষ। থিয়োরেটিসিয়ান হিসেবে আপনাকে আমরা যথেষ্ট গুরুত্ব দিতাম। তা সত্ত্বে
আপনি অভিমান করে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিলেন এটা কি ঠিক হল? একজ
কম্যুনিস্ট কি একা একা বাঁচতে পারে?

—এসব কী বলছ দীপক? সেই ঘটনার পর থেকে দিনের পর দিন আমা
নানাভাবে হেনস্তা করা হয়েছে। আমাকে..... উত্তেজিতভাবে অনেক কথা বল
যাচ্ছিলেন অপরেশ। কিন্তু দীপক আবার তাকে থামিয়ে দিলেন।

—ভুল বোঝাবুঝির পালা এখন শেষ অপরেশদা। আপনাকে নিয়ে আলোচ
হয়েছে আমাদের মধ্যে। শুধু লোকাল লেভেলে নয়। ডিস্ট্রিক্ট লেভেলেও আলোচ
হয়েছে। ভাল শিক্ষক হিসেবে, একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে আপনারও এক
পাবলিক ইমেজ আছে। পার্টির মধ্যে যারা সুবিধেবাদী তাদের আমরা আইডেনটিফা
করেছি অপরেশদা। আমাদের মধ্যে এখন একটা সংস্কার প্রক্রিয়া চলছে। রিফর্ম-সিস্টে
আমরা এখন খারাপ এলিমেন্টসদের আইসোলেট করে দিতে চাই। তার বদ
আপনাদের আরও অ্যাকটিভেট করতে চাই। আপনি আবার আগের মতো অ্যাকটি
হোন অপরেশদা। আমাদের আঞ্চলিক কমিটির প্রতি সপ্তাহে সপ্তাহে যে মিটিংগু
হয়, সেখানে আপনি নিয়মিত আসুন।..... কি আসবেন তো?

—তুমি একজন নেতা। আমার বাড়ি বয়ে এসে যখন অনুরোধ করছ ত
নিশ্চয়ই যাব! পার্টিকে আমি ভালবাসি। আমার রক্তে রাজনীতি আছে দীপক। আ
একজন পোলিটিকাল বিয়িং। একা একা থাকতে এই ক বছর সত্যিই খুব অসুবি
হয়েছে দীপক। তোমাদের এই অনুরোধের জন্যে ধন্যবাদ।

—হ্যাঁ অপরেশদা। মিসআনডারস্ট্যান্ডিং আমাদের মধ্যে হতেই পারে। সে
নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে মিটিয়ে ফেলাই উচিত। .....ও হ্যাঁ..... আর এক
কথা? — যেন হঠাৎ মনে পড়েছে এভাবে বললেন দীপক।

—কী কথা?

—আপনাকে অরণি দা ডেকেছেন। ওঁর অফিসে দেখা করতে বলেছে

তাড়াতাড়ি। আগামী সোমবার সন্ধের দিকে আসুন। সাতটা নাগাদ।

—কোথায় দেখা করব? আমাদের এখানকার অফিসে?

—নাহ তা কেন? ওঁর অফিসে। উনি ওয়েট করবেন আপনার জন্যে। আমাদের রিজিওন্যাল হেডকোয়ার্টারে।

—অরণি সান্যাল নিজে আমার সঙ্গে কথা বলবেন?..... কী ব্যাপারে বল তো?

—সেটা ওঁর সঙ্গে দেখা হলেই বুঝতে পারবেন। তবে এটুকু বলতে পারি দুশ্চিন্তার কিছু নেই। —হেসে বলেছিলেন দীপক মহান্তি।

তবুও দুশ্চিন্তা যে একেবারে হয়নি অপরেশের এমন নয়। রাজনীতিতে পোড় খাওয়া মানুষ তিনি। প্যাঁচ-পয়জার একেবারে যে বোঝেন না তা নয়। দীপকদের এটা কোনও নতুন চাল নয় তো? কী এমন ভি.আই.পি. তিনি হয়ে গেলেন যে, অরণি সান্ন্যালের মতো উঁচু দরের নেতা তাঁকে ডেকে পাঠাবেন? বিশেষত যখন দীর্ঘ তিন বছর তিনি চুপচাপ বসে আছেন। পার্টির কাজকর্মের সঙ্গে একেবারেই জড়িত নয়।

দীপক মহান্তিও একজন মাঝারি মাপের নেতা। তার কথাই বা অগ্রাহ্য করেন কীভাবে? অপরেশ সোমবার স্কুল ছুটির পর গেলেন অরণি সান্যালের সঙ্গে দেখা করতে। ঠিক সন্ধে সাতটার সময়।

অরণি ছিলেন। একেবার একা। যেন অপেক্ষা করছিলেন অপরেশের জন্যেই। সাধারণত এরকম হয় না। সন্ধের দিকে অরণি কোনও না কোনও মিটিং নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। কিংবা মিটিং না থাকলেও তাঁর ঘরে অনেকে থাকে। নানা বিষয়ে আলোচনা হয়। কিন্তু সেদিন সত্যিই একা ছিলেন। সন্ধে নেমেছিল। ঘরের বড় আলো নেভানো ছিল। টেবিল-ল্যাম্প জ্বলছিল। কিছু একটা লেখালেখি করছিলেন অরণি। অপরেশকে দেখে বলেছিলেন—আসুন অপরেশবাবু। বসুন। চা চলবে তো?

চা-পর্ব শেষ হওয়ার পর প্রায় আধঘন্টা অরণি এবং অপরেশের মধ্যে যা কথাবার্তা হয়েছিল তা এরকম :—

—আশা করি দীপক আপনাকে কিছু কথা অলরেডি বলেছে?

—হ্যাঁ বলেছে। কিন্তু আমি কয়েকটা ব্যাপার আপনার কাছে পরিষ্কার করে নিতে চাই অরণিবাবু!

—বলুন?..... নিশ্চয়ই বলবেন।

—মোহিত চৌধুরীর দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমি যখন প্রকাশ্যে মুখ খুলেছিলুম তখন আপনি তো একই পদে ছিলেন। আমাদের এলাকা দেখাশোনো করার দায়িত্ব ছিল আপনার। আপনি আমার কাছে সব শুনতে চাইলেন না কেন? তার বদলে আমাকে নানা ভাবে অপদস্থ করা হয়েছিল।

—হ্যাঁ। এই অভিযোগ আপনি করতেই পারেন। আসলে কি জানেন তো?

আমাদের দলের মধ্যে হায়ার-আরকি আছে। মোহিতের গ্রুপটা তখন আপনাদের এলাকার কমিটিতে স্ট্রং ছিল। আমি যখন ব্যাপারটা নিয়ে খোঁজখবর নেওয়া শুরু করি, তখন তারা আমাকে জানিয়েছিল যে, মোহিতের বিরুদ্ধে অভিযোগ সব বোগাস। আপনি ম্যালাফাইডি ইনটেনশান নিয়ে চেঁচামেচি করছেন। আমাদের সংগঠন অনেক বড়। আমরা সরাসরি সকলের কাছে যেতে পারি না। নানা মাধ্যম দিয়ে আমাদের খবরগুলো নিতে হয়। সেই মিডিয়ামগুলো আমার সঙ্গে তখন কো-অপারেট করেনি। আপনার ব্যাপারে মিসরিপ্রেজেন্ট করা হয়েছিল। আর আপনিও একটা ভুল করেছিলেন।

—আমি ভুল করেছিলুম?

—হ্যাঁ। কারোর বিরুদ্ধে যদি অভিযোগ থাকে তা জানানোর একটা পদ্ধতি আছে আমাদের দলে। অভিযোগগুলো নিয়ে আমরা নিজেরাই যদি প্রকাশ্যে চেঁচামেচি করি তাহলে পাবলিকের কাছে এবং মিডিয়ার কাছে ভুল মেসেজ চলে যায়। সেটা আমাদের সংগঠনের পক্ষে ভাল নয়।

—কিন্তু আমার ক্ষেত্রে একটা টেকনিক্যাল অসুবিধে ছিল। সেটাও মানতে হবে আপনাকে।

—কী?

—মোহিত চৌধুরী নিজেই ছিল নেতা। তার নানা করাপশানের ব্যাপারে আমি তাকে অনেকবার সতর্ক করতে চেয়েছি। কিন্তু সে আমাকে পাত্তা দেয়নি। অগ্রাহ্য করেছে আমাকে বারবার। তখন বাধ্য হয়ে আমি এক্সপ্লোড করেছিলুম।

—আপনি একজন সিনিয়র মেম্বার। অনেকদিন রাজনীতি করছেন। অনেকের থেকে ভাল বোঝেন রাজনীতি। কিন্তু তবুও আমি বলব আপনার প্রোটেস্ট জানানোর পদ্ধতি আমাদের পছন্দ হয়নি। বিশেষ একজন ব্যক্তির সমালোচনা করতে গিয়ে আপনি পার্টিরও অনেক সমালোচনা করে ফেলেছিলেন। যা আমাদের পছন্দ হয়নি। আপনি অন্যভাবেও প্রতিবাদ করতে পারতেন।

—কীভাবে?

—গোপন চিঠির মাধ্যমে আমাকে জানিয়ে। ইন ফ্যাক্ট এভাবেই কিন্তু পার্টিতে করাপশানের ইনফরমেশনগুলো আমাদের কাছে আসে। মোহিত চৌধুরীর ব্যাপারে আপনি যে ওভাবে ভোকাল হয়েছিলেন তাতে আমরা খুব একটা মুভড্ হইনি। তারপর যখন মোহিতের ব্যাপারে আমাদের কাছে চিঠিপত্রে নানারকম অভিযোগ আসতে শুরু করল তখন আমরা রিয়েলি নড়েচড়ে বসলাম।..... কারোর বিরুদ্ধে অভিযোগ ক্রমাগত কানে এলে আমরা আমাদের পদ্ধতিতে তদন্ত করি এটা নিশ্চয়ই আপনি জানেন। সেই তদন্ত-রিপোর্টে দেখা গেল, মোহিত চৌধুরীকে দুর্নীতিগ্রস্ত বলার যথেষ্ট কারণ আছে। তার জীবনযাত্রায় অনেক গন্ডগোল আছে। সে ইদানীং য

সম্পত্তির মালিক তাতে তার প্রতি সন্দেহ হওয়া দোষের নয়। যাক অত বিশদে আমি যেতে চাইছি না। দলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মোহিতকে আমরা সাসপেন্ড করেছি। শুধু মোহিত কেন? আরও অনেককেই আমরা রিমুভ করছি। তার কারণ কী জানেন? তার কারণ হল, আমরাও চাই পার্টির ভাবমূর্তি পাবলিকের কাছে ট্র্যানসপারেন্ট থাক। অনেক বড় সংগঠন আমাদের। অনেক সমর্থক। নানা সম্প্রদায়ের মানুষ নিয়ে আমাদের কারবার। পার্টির নানা স্তরে নানা ধরনের মানুষ আছে। ভাল মানুষ, একনিষ্ঠ সমর্থক যেমন আছেন, তেমনি দু-নম্বরি মানুষও আছে। আমাদের সংগঠনে নীচে থেকে ওপরে শুদ্ধিকরণ শুরু হয়েছে। ঘেয়ো, পচা লোকদের আমরা চিহ্নিত করছি ও বাদ দিচ্ছি। একটু সময় লাগছে। তবে ইতিমধ্যে মোহিতের মতো অনেক মানুষকেই আমরা তাড়িয়ে দিয়েছি।..... অরণি থামলেন। অনেকক্ষণ একটানা কথা বলেছেন। সিগারেটের প্যাকেট টেনে নিলেন। সিগারেট ধরালেন। অফার করলেন অপরেশকে। অপরেশ সবিনয়ে প্রত্যাখান করলেন। তিনি ধূমপান করেন না।

—পার্টির সামগ্রিক শুদ্ধিকরণের কথা ভেবেই আমরা মনে করছি যে আপনাদের আরও অ্যাকটিভ হওয়ার প্রয়োজন আছে। তাই আমি আপনাকে অনুরোধ করব আগে কী হয়েছিল ভুলে যান। আবার আসুন আমাদের সঙ্গে।

—দেখুন অরণিবাবু আমি কয়েকটা কথা বলতে চাই। আপনি আমার সম্বন্ধে কতটা জানেন আমি নিজে ঠিক জানি না।..... ছাত্রবয়স থেকেই আমি কিন্তু রাজনীতি করছি। আমি আমার পার্টিকে ভালোবাসি। কিন্তু গত তিন বছর যেভাবে আমাকে অপমান করা হল, আমাকে বুঝিয়ে দেওয়া হল যে, আমি অপাঙ্‌ক্তেয়; তাতে আমার এরকম ধারণা হয়েছে যে, আপনারা দুর্নীতি কিংবা অন্যায়ের প্রতিবাদ চান না। নিরঙ্কুশ এবং প্রশ্নহীন বশ্যতা চান। তাই আমি.....

—আর বলবেন না। অপরেশদা—প্লিজ—আমি বুঝেছি আপনাকে। এটা ঠিক আপনার সঙ্গে আমাদের ট্রিটমেন্টে কিছু গন্ডগোল হয়েছে। যারা সে ব্যাপারে ইন্ধন জুগিয়েছে তাদের আমরা আইডেনটিফাই করেছি। কিছু লোককে রিমুভ করেছি। আরও অনেককে রিমুভ করা হবে। তার সঙ্গে বিগত বছর তিন আপনার কার্যকলাপও আমরা লক্ষ্য করে যাচ্ছি। আপনি নানা ছোট পত্রিকায় যেসব লিখেছেন তাও আমি পড়েছি। আমি, বলা যেতে পারে আমরা, সন্তুষ্ট। আপনার রাজনৈতিক চেতনা খুব স্বচ্ছ। ব্যক্তিগত জীবনে আপনি আপাদমস্তক সৎ। শিক্ষক হিসেবে ছাত্রসমাজ, বিশেষত নতুন প্রজন্মের কাছে আপনার একটা ইমেজ আছে। তাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে—

অরণি থামলেন। নাটকীয়ভাবে। ছোট হয়ে আসা সিগারেট গুঁজে দিলেন অ্যাশট্রেতে।

—আমাকে আবার অ্যাকটিভ হতে হবে এই তো? আমাদের লোকাল ইউনিটের

মিটিংগুলোতে যেতে হবে।..... এই তো? দীপক আমাকে বলেছে সবকিছু। আমি রাজি। আমার মনে কিছু অভিমান ছিল। তা থাকার কারণও হয়ত ছিল। আমি মনেপ্রাণে কম্যুনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী। তা বলে হিউম্যান সেন্টিমেন্টকে অস্বীকার করব কীভাবে? আমি হয়তো কিছুটা সেন্টিমেন্টাল। যাহোক। সব ভুল বোঝাবুঝির শেষ। ভাল লাগল যে, আপনি নিজে আমাকে ডেকে এত কথা বললেন। এর পর আমার আর কোনও অভিমান নেই। আমি নিয়মিত আমার লোকাল ইউনিটের সঙ্গে যোগাযোগ রাখব।

—শুধু যোগাযোগ রাখা নয়। আপনাকে কিছু বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হবে। অরগানাইজেশনকে স্ট্রেনদেন করতে হবে। আপনাদের এলাকার লোকসভার সীটে যিনি এম.পি. ছিলেন মারা গেলেন হঠাৎ। ওটা আমাদের সিট ছিল। এবারও তা ধরে রাখার চেষ্টা করা হবে। উপনির্বাচন হবে ঐ সিটে। কয়েকটা পোলিং স্টেশনে কিছু ঘাটতি আছে আমাদের। ঐসব এলাকায় আমাদের সংগঠন একটু দুর্বল। ওসব জায়গাগুলোতে বারবার যেতে হবে। মিটিং করতে হবে। ছোট ছোট মিটিং। মানুষকে বোঝাতে হবে মানুষ কেন আমাদের ভোট দেবেন। —অরণি থামলেন। হাসলেন। মৃদুভাবে।

অপরেশ বললেন—আপনার এই আদেশ পালন করার ব্যাপারে আমার দিক থেকে কোনও ঘাটতি থাকবে না।

—আদেশ বলবেন না। অপরেশবাবু। বলুন আমার অনুরোধ। আর একটা কথা আপনাকে জানানোর আছে। একটা বিশেষ কথা.....।

—কী?

—আপনাদের এলাকায় লোকসভার আসনে যে উপনির্বাচন হবে তাতে আপনাকে আমরা প্রার্থী করতে চাই।

—আমাকে? —নিজের কানকে যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না অপরেশের।

—হ্যাঁ আপনাকে। শিক্ষাবিদ হিসেবে, সংস্কৃতি-মনস্ক একজন ব্যক্তি হিসেবে আপনার যা ইমেজ তাতে আমরা অন্য কোনও প্রার্থীর কথা আর বিবেচনা করছি না। আমাদের সিদ্ধান্ত আপনাকে জানানো হল। আপাতত আর কিছু আমার বলার নেই।.....

যেন পাখির মতো উড়তে উড়তে বাড়ি ফিরেছিলেন অপরেশ। লোকসভার আসনে তিনি প্রার্থী হবেন? এটা কোনওদিন তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি।..... এম.পি. হবেন তিনি? এম.পি.? মেম্বার অব পারলামেন্ট? এর আগে কোনও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি অপরেশ। ছোটখাটো কোনও নির্বাচনেও না। পৌরসভার নির্বাচনে ওয়ার্ড-কমিশনারের পদের জন্যেও লড়েন নি নির্বাচন। একেবারে সরাসরি লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী হবেন তিনি? এটা কি তাঁকে নিয়ে পার্টির একধরনের

ফাটকা খেলা নয়?

সেদিন রাতে ঘুম এল না। স্ত্রীকে দিয়েছেন খবরটা। তিনি উল্লসিত। অপরেশ বামপন্থী হতে পারেন। হাজার হাজার বামপন্থীদের মতো তিনিও ঠাকুর-দেবতা মানেন না। মূর্তিপুজোয় বিশ্বাস করেন না। অনেক কট্টর বামপন্থীর মতো অপরেশও মনে করেন রিলিজিয়নও হ'ল এক ধবনের পাওয়ার-গেম। যা সমাজে বরাবর আছে। থেকেও যাবে হয়তো। সে কারণেই নিজের ধর্মভীরু স্ত্রী সেদিন খবরটা শোনার পর যখন উৎফুল্লভাবে বললেন—এতদিন বাদে ঠাকুর মুখ তুলে চাইলেন। আমি কিন্তু এবার সত্যনারায়ণের সিন্নি দেব; তখন অপরেশ মৃদুভাবে বললেন—এখনই এত ইমোশনাল হওয়ার দরকার নেই। আগে নোমিনেশন সাবমিট করি। এলাকা কিন্তু অনেক বড়। কয়েক লাখ ভোটার। সবাই তো আর আমাকে ভোট দেবে না? অনেকে চেনেই না আমাকে। খুব খাটতে হবে এই কমাস।..... দেড় মাস। মানুষের কাছে যেতে হবে। তাদের বোঝাতে হবে যাতে তারা আমাকে ভোট দেয়।

—তোমাদের দলে তো শুনেছি প্রার্থী নয়, প্রতীককে ভোট দেয় মানুষ?..... ফট্ করে বলেছিলেন অপরেশের ধর্মপ্রাণা স্ত্রী। অপরেশ তাকিয়ে ছিলেন স্ত্রীর দিকে। এখনই যে কথাটা বললেন তাঁর স্ত্রী, তা সত্যিই ঠিক। অপরেশের ব্যক্তিগত পরিচয় এখানে খুব বড় ব্যাপার নয়। তাঁর পক্ষে যে প্রতীক সেটাই হ'ল আসল। কিন্তু তবুও.....। তবুও অপরেশকে খাটতে তো হবেই। আগামী দিনগুলোতে তাঁর নিঃশ্বাস ফেলবার সময় থাকবে না। পরিশ্রম করতে হবে। ভোটার তালিকা নিয়ে বসতে হবে। বুঝতে হবে কোন্ কোন্ এলাকায় তাঁর দল দুর্বল। সেখানে যেতে হবে বারবার। রাস্তার মোড়ে মোড়ে মিটিং করতে হবে। সেদিন থেকেই অপরেশ স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন। সংসদের সভায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতার সুযোগ! ভাবা যায়? যে কোনও মূল্যে এই নির্বাচন তাঁকে জিততে হবে। যে কোনও মূল্যে। সুযোগ বারবার আসে না। হয়তো একবারই আসে।

১৩

ইন্দ্রানীর কাছ থেকে সুহাসের যে ডায়েরি এনেছিল তমাল, পড়ল কদিন ধরে। সুহাস যে নিয়ম করে প্রতিদিন ডায়েরি রাখত তা নয়। মাঝে মাঝে সে লিখে রাখত নিজের মনের কথা। অনিয়মিতভাবে। যেমন মার্চ মাসে তিনদিন নানা তারিখে ডায়েরি লেখা হয়েছে। এপ্রিল মাসে হয়নি। মে মাসে হয়নি। আবার জুন মাসে দুদিন। এরকম আর কী। একটা বাঁধানো, মোটা ডায়েরিতে ছাড়া-ছাড়া ভাবে প্রায় দু-বছরের নানা কথা লেখা আছে। যখন যা মনে হয়েছে সুহাসের লিখে রেখেছে।

নিজের অভিজ্ঞতার কথা। চারপাশে যা ঘটছে সে ব্যাপারে তার প্রতিক্রিয়ার কথা। মাঝে মাঝে তার বোন, খুকুর কথা। আর যখন ইচ্ছে হয়েছে স্বরচিত কবিতাও লিখেছে সুহাস ডায়েরিতে। কবিতা, বিশেষত, আধুনিক কবিতা তেমন পড়ে না তমাল। বোঝে না বলে পড়ে না। কী যে সব লেখে কবিরা, কীসের সঙ্গে কীসের তুলনা করে কবিরা মাথায় ঠিক ঢোকে না তমালের। কিন্তু সুহাসের কবিতাগুলো পড়ে বেশ ভাল লাগল তমালের। কেন যে এসব কবিতা ছাপতে দেয়নি সুহাস! তমাল ভাবল। সুহাস যদি মন দিয়ে কবিতাটা লিখে যেত, তাহলে তার ধারণা, সে খ্যাতি পেত। অবশ্য এখন এসব ভেবে কিছু লাভ নেই। অনেককিছু হওয়ার সম্ভাবনা হয়ত ছিল সুহাসের। কিন্তু কিছু হওয়ার আগেই সে অভিমানে, হতাশায়, অপমান-বোধে নিজেই ছেড়ে চলে গেল এই পৃথিবী। সুহাস এখন ছবি হ'য়ে গেছে।

ডায়েরি লেখা হয়েছে সাধু ভাষায়। কিন্তু কবিতার ভাষা চলিত। তমাল আগাগোড়া পড়ে ফেলল সুহাসের ডায়েরি। দুদিন ধরে। একবার নয়। কিছু কিছু জায়গা বারবার পড়ল। ডায়েরিটা পড়ে আসলে তমাল বুঝতে চাইছিল সুহাসের মানসিকতা। কিছু কি বুঝল সে? হ্যাঁ, বুঝল বইকি। তমালের বারবার মনে হচ্ছিল, সুহাসের ভাবনাচিন্তার সঙ্গে তার ভাবনাচিন্তার অনেক মিল আছে। ইস্! সুহাসের সঙ্গে যদি তার আগে দেখা হ'ত। তাহ'লে সুহাস তার বন্ধু হতে পারত। তমালের কোনও বন্ধু নেই। সুহাসেরও তো বন্ধু ছিল না। ডায়েরির এক জায়গায় সে লিখেছে—'বড় একাকীত্ব অনুভব করি। আমার কেন যে কোনও বন্ধু নাই। ইস্কুলে আমার কোনও বন্ধু ছিল না। কলেজেও আমার কোনও বন্ধু ছিল না। কাহারও কাহারও সহিত বন্ধুত্ব পাতাইতে গিয়া দেখিয়াছি বৃথা চেষ্টা। আমার মানসিকতার সহিত যেন কাহারও মেলে না। কেন মেলে না? কে জানে? কে বলিতে পারে? আমি কি সকলের থেকে আলাদা? এই যে আমি কাহারও সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে পারি না তাহা আমারই দোষ-ত্রুটি নয়তো? অনেক ভাবিয়া দেখিলাম, আমাকে বোধহয় একা থাকিতে হইবে। একেবারে একা থাকিয়া যাইব? তা কেন? বাড়িতে তো আমার বন্ধু আছে। মা আমার বন্ধু। বোন আমার বন্ধু। ওহ খুকু যদি কথা বলিতে পারিত! ও কথা বলিতে পারে না, তাও আমি উহার মনোভাব সব বুঝিতে পারি। ও আমাকে খুব ভালোবাসে। ও মাকেও খুব ভালোবাসে। কতভাবে তাহা জানাইয়া দেয়। সারাদিন বিছানা শুইয়া থাকিয়া, রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া খুকু আমাদের জন্য এত ভালবাসা কোথা হইতে পায়?'

রাস্তায় বেরনোর পর কোনও একদিনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা লিখেছে সুহাস। তমাল সেই অভিজ্ঞতার কথা বারবার পড়ছিল। সুহাস যা লিখেছে তা হল এরকম :—

'একদিন রাস্তা দিয়া যাইতেছি। সময়টা হ'ল দুপুর। টালিগঞ্জ থানার কাছাকাছি

পি.এস.সি. অফিসে গিয়াছিলাম চাকরির আবেদনপত্র জমা দিতে। কাজটি করিয়া ফুটপাত দিয়া হাঁটিয়া আসিতেছি। দুপুর। তাই চারপাশে যেন তেমন ভিড় নাই। একটু ফাঁকা ফাঁকা। আকাশ মেঘলা ছিল। রোদের তাপ না থাকায় হাঁটিতে খারাপ লাগিতেছিল না। হঠাৎ সামনে একজন বুড়া মানুষ আসিয়া দাঁড়াইলেন। আমাকে বলিলেন—বাবা আমার কথা কি শুনবেন?..... আমি থতমত খাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনি কে? কী বলতে চান? উনি বলিলেন—আমার দুঃখের কথা শোনাতে চাই।

—আপনার দুঃখের কথা? আমাকে শোনাতে চান কেন?

—কারণ, তোমার মুখ দেখে আমার মনে হয়েছে তুমি মানুষ খুব ভাল।

বৃদ্ধ মানুষটির মুখে এই কথা শুনিয়া আমার মনে হইল ইনি বোধহয় সত্যিই দুঃখী। এঁর কথা আমার শোনা উচিত। আমি তাঁকে বলিলাম আমি শুনিব তাঁহার কথা। তিনি আমাকে বলিলেন—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি কথা হয় বাবা? চলুন ঐ চায়ের দোকানে যাই। বেঞ্চে বসি। সকাল থেকে এক কাপ চা খাইনি বাবা। আমি বলিলাম—তাই চলুন।

ফুটপাতের চায়ের দোকানের বেঞ্চে আমরা বসিলাম। বৃদ্ধের মুখ সত্যিই বেশ শুকনো দেখাইতেছিল। শুকনো এবং শীর্ণ। পরনে একটি মলিন ধুতি। একটি মলিন শার্ট। সেই শার্টের জায়গায় জায়গায় রিপু করা। আমি চায়ের দোকানের লোকটিকে এক কাপ চা ও দুইটি বিস্কুট দিতে বলিলাম। আমি তো চা পান করি না। রাস্তায় দোকানে বসিয়া চা নেওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। মানুষটি খুব তৃপ্তি করিয়া বিস্কুট দুইটি খাইল। উহার খাওয়া দেখিয়া আমার মনে হইল, উনি সত্যিই খুব ক্ষুধার্ত। আমি ওঁকে জিজ্ঞাসা করিলাম—একটা কেক খাবেন? উনি ঘাড় নাড়িলেন। একটি বাপুজি কেকের প্যাকেট কিনিয়া দিলাম। উনি তাহাও গোগ্রাসে খাইলেন। তারপর ধীরে ধীরে চায়ের গ্লাসে চুমুক দিতে লাগিলেন। আর শুনাইতেছিলেন নিজের কথা। উনি যা বলিয়াছিলেন তাহা এই।..... ওঁর স্ত্রী বহুদিন আগে গত হইয়াছেন। উনি পেশায় ছিলেন স্কুল-শিক্ষক। কয়েক বছর হইল অবসর নিয়াছেন। কিন্তু কী কারণে যেন এখনও পেনশন পান না। একমাত্র ছেলেকে অনেক কষ্টে মানুষ করিয়াছেন। স্ত্রী নাই। নিজের হাতে রান্না করিয়া, ছেলেকে খাওয়াইয়া, স্কুলে পাঠাইয়া, তারপর নিজেও স্কুলে গিয়াছেন। এভাবে দিনের পর দিন। বছরের পর বছর কাটিয়াছে। ছেলে মানুষ হইয়াছে। ডাক্তার। ছেলের বিবাহ দিয়াছেন। কিন্তু বৃদ্ধবয়সে ছেলে ও বৌমা ওঁকে ঠিকমতো খাইতে দেয় না। উহাদের মুখে অনেক গঞ্জনা সহ্য করিতে হয়। পেনশনের টাকাটা এখনও মেলে নাই। তাই সবকিছুর জন্যে ছেলের দয়ার উপর নির্ভর করিতে হয়। জীবনের প্রতি ওঁর বিতৃষ্ণা আসিয়া গিয়াছে। ছেলে-বৌমার গঞ্জনা আর অত্যাচার সহ্য করিতে পারেন না। তাই সকাল বেলাতেই বাড়ি হইতে

বাহির হইয়া পড়েন। ভিক্ষা চান। দয়াপরবশ হইয়া কেহ না কেহ কিছু দেয়। যেমন আজ। এইসব বলিয়া বৃদ্ধ নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিলেন। আমি সহানুভূতি বোধ করিয়া পকেট হইতে দশ টাকার নোট বাহির করিলাম। বৃদ্ধের হাতে গুঁজিয়া দিলাম। বৃদ্ধ আমাকে আশীর্বাদ করিলেন। তারপর দ্রুত চলিয়া গেলেন। রাস্তার ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গেলেন। পরে আমার মনে হইয়াছিল যে, ঐ বৃদ্ধ কি সব সত্যি কথা বলিলেন? কে জানে? হয়ত এরকম দুঃখের গল্প ফাঁদিয়া ভিক্ষা করিতে উনি অভ্যস্ত। তারপরই মনে হইল, মিথ্যে গল্প উনি বানাইতে পারেন। কিন্তু এটা তো ঠিক উনি অভাবগ্রস্ত। কেহ কি ইচ্ছা করিয়া রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করে? ওঁকে সাহায্য করিয়া আমি কিছুমাত্র ভুল করি নাই।'

একের পর এক সুহাসের ডায়েরির পৃষ্ঠ তমাল পড়ে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে নিজের খেয়ালে দু-একটা কবিতা লিখে রেখেছে সুহাস। কবিতার ভাষা অবশ্য চলিত। ডায়েরির ভাষা কেন যে সাধু তা তমাল বলতে পারবে না। আজকালকার কোনও ছেলে সাধুভাষায় লেখে নাকি? তমাল অবাক হয়েছিল। হাসিও পেয়েছিল তার। পরে অবশ্য মনে হয়েছে, সাধুভাষায় আমরা আজকাল আর লিখি না। প্রাচীন লেখকদের সাধুভাষায় রচনা তেমন পড়িও না। কিন্তু সুহাসের ডায়েরি পড়তে পড়তে তমালের মনে হচ্ছিল, সাধুভাষায় লেখা হয়েছে বলে বেশ লাগছে পড়তে। কেমন একটা অন্য স্বাদ। এই ডায়েরি সুহাস নির্জনে লিখে রাখত। কোনওদিন কাউকে দেখায়নি। এমনকি মা ইন্দ্রানীকেও না। সুহাসের মৃত্যুর পর ইন্দ্রানী এই ডায়েরি খুঁজে পেয়েছেন। নিজে কিছুটা পড়েছেন। তারপর তমালকে দিয়েছেন পড়তে।

তমালের মনে হচ্ছিল, সুহাসের ডায়েরির প্রতিটি শব্দ তার হৃদয়ের আলোয় উদ্ভাসিত। হৃদয়ের আলো? হ্যাঁ, হৃদয়ের আলো। সুহাসের হৃদয় ছিল বড় নির্মল, পবিত্র, ঝকঝকে। তার হৃদয়ে কোনও কলুষ ছিল না। সেই হৃদয় থেকে যে আলো বিচ্ছুরিত হ'ত তাও বড় নির্মল এবং পবিত্র। সুহাসের লেখা ডায়েরির রচনাগুলো সেই অম্লান হৃদয়ের অভূতপূর্ব আলোয় কেমন উজ্জ্বল আর রহস্যময় লেগেছিল তমালের। সুহাস ডায়েরির পাতায় মাঝে মাঝে যে কবিতা লিখে রেখেছে সেগুলোও তাব হৃদয়ের আলোয় ঝলমলে। বুকের গভীরে যে কথাগুলো জমে ছিল, তাদেরই সুহাস প্রকাশ করেছে তার কবিতায়। একটা কবিতার নাম—'তুমি, আমার জীবন'। কবিতাটা হল এই—

> আরও একটু সহজ হ'য়ে এসো—
> তুমি, আমার জীবন।
> প্রতিদিন দাউদাউ আগুনের মধ্যে আমার বেঁচে থাকা;
> প্রতিদিন অসম্ভব মিথ্যের বিরুদ্ধে আমার পাঞ্জা কষা;
> প্রতিদিন হেঁটমুন্ডু উর্ধ্বপদ

আমাকে ঝুলে থাকতে হয় একটা অন্ধকার টানেলে!
আগুনের তীব্র হলকায় পুড়ে যাচ্ছে আমার পালক
তুমি আরও একটু সহজ হয়ে এসো—জীবন।
নক্ষত্র তোলপাড় আকাশের নীচে
একটা নৌকোর অবাধ ভেসে যাওয়ার মতন সহজ,
ভাইয়ের নরম গালে যুবতী দিদির আতপ্ত চুম্বনের মতন সহজ,
পরিশ্রান্ত পুরুষের সামনে শাঁখা-পরা দুই কালো হাতে
মোটা চালের ভাত সানকিতে সাজিয়ে দেওয়ার মতন সহজ
হয়ে এসো আমার জীবন..........

তমালের বেশ ভাল লাগল কবিতাটা পড়ে। আজকালকার কবিতা সে পড়তে তেমন উৎসাহিত বোধ করে না। কারণ ঐসব কবিতা পড়ে সে আসলে কিছু বুঝতে পারে না। এক একটা কবিতায় কী যে লেখে কবিরা সে ঠিক ধরতে পারে না। তাই কবিতা পড়ে না। মাঝে মাঝে অবশ্য রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ে। বুঝতে অসুবিধে হয় না। সুহাসের কবিতা পড়েও বুঝতে অসুবিধে হ'ল না। সুহাস চেয়েছে জীবন আরও সহজ হয়ে উঠুক। তমালও তো তাই চায়। জীবন খুব সহজ হোক। মানুষ ভাল থাকুক। পৃথিবী থেকে হিংসা, অসূয়া, ষড়যন্ত্র, রক্তপাত—এসব চিরদিনের মতো নির্বাসিত হোক, তমালও চায়। সুহাসের সঙ্গে তার ভাবনার অনেক মিল আছে। তমাল নিজেকে তেমন প্রকাশ করতে পারে না। লিখতেও পারে না। ডায়েরি লেখার অভ্যাস তার নেই। সুহাসের ছিল। সুহাস কবিতা লিখতে পারত। কী সুন্দর সব কবিতা। আর একটা কবিতা হল এই—

সমুদ্র আয়না অনন্তের।
আর এই যে ইতস্তত ছড়ানো ছোট ছোট দ্বীপ;—
এখানেই আমাদের ঘর-গেরস্থালি।
এখানে আছে দিন আর রাতের যুদ্ধ,—রাতের সঙ্গে দিনের যুদ্ধ।
প্রতিদিন পাথর ভেঙে ভেঙে যাত্রাপথ করে নিতে হয় আমাদের।
আছে রক্তপাত! উদ্যমের হর্ষ! শাণিত বল্লমের ফলায়
চকচকে মাছ!
দিনের শেষে যখন শান্ত হয়ে আসে সব কোলাহল,
ঘুম নেমে আসে চোখের পাতায়।
তখন অনুভব করি রক্তের সমুদ্রে অনন্তের ঢেউ
কেবলই উঠছে আর নামছে!
শুরু হয় বাতাসের চঞ্চলতা, অস্থিরতা ও জাগরণ.....

এইসব কবিতা পড়ে তমালের বারবার মনে হচ্ছিল, সুহাস যদি বেঁচে থাকত

আর নিয়মিত কবিতা লিখত। তাহলে সে একজন ভাল কবি হ'তে পারত।

সুহাস ডায়েরির পাতায় লিখে রেখেছে তার প্রতিবন্ধী বোন খুকুর কথাও। 'খুকু, আমার বোন, কোনওদিনই বোধহয় স্বাভাবিক মানুষের মতো কথা বলিতে পারিবে না। চলাফেরা করিতে পারিবে না। কী কষ্ট উহার? কেন এত কষ্ট? ও কি কোনওদিন কোনও পাপ করিয়াছে? জন্মের পর থেকে সে বিছানায় শুইয়া আছে। আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়াও সে কোনওদিন হাঁটে নাই। চোখ ভরিয়া দেখে নাই বাইরের পৃথিবী কত সুন্দর, সেই হতভাগ্য আর কী পাপ করিবে? নিষ্পাপ, নির্দোষ, কোমল একটা জীবন। কী সুন্দর দেখিতে খুকুকে! উহার চোখ, মুখ, নাক সবকিছু আমার মায়ের মতন। আমার মাকেও তো কী সুন্দর দেখিতে। যখন খুব ছোট ছিল তখন তো খুকু কিছুই বুঝিতে পারিত না। কিছুই বোঝাইতে পারিত না। কিন্তু এখন ও বেশ বড় হইয়াছে। এখন কি ও অনেক কিছু বুঝিতে পারে? আমার ইদানীং অদ্ভুত এক খেয়াল হইয়াছে। খুকুকে প্রায়ই আমি সঙ্গ দিয়া থাকি। বিশেষত যখন আমি বাড়িতে থাকি। উহার বিছানার পাশে বসিয়া উহার সঙ্গে কত কথা বলি। উহার চোখের ভাব দেখিয়া মনে হয় ও কিছু বলিতে পারে না বটে কিন্তু বুঝিতে পারে। যদি কথা বলিতে পারিত কী ভালই না হইত। আমার অলস দিনগুলো কাটিয়া যাইত খুকুর সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে। আমার মনে এক গোপন ইচ্ছা আছে। যাহা আমি মাকেও কোনওদিন বলি নাই। তাহা হইল, যখন আমি একটি চাকরি পাইব, টাকা উপার্জন করিব, তখন খুকুকে খুব বড় কোনও ডাক্তারকে দেখাইব। যদি তিনি খুকুর চিকিৎসা করেন। ও কিছুটা অন্তত ভালো হইয়া যায়। এরকম তো হইতেও পারে। আজকাল চিকিৎসা শাস্ত্রে কত উন্নতি হইয়াছে। শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী কোনও মানুষকে কি কিছুটা ভালো করিবার কোনও ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই? আজ না হউক, একদিন নিশ্চয়ই হইবে। খুকু কিছুটা ভাল হইয়া উঠিতেও পারে। বাহিরে না যাইতে পারুক। এ-ঘর ও-ঘর যাইতে পারিবে। কথা না বলিতে পারুক, ইশারায় নিজের মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারিবে।..... আচ্ছা খুকু তো মূক ও বধির? সত্যিই কি ও মূক ও বধির? ও নিশ্চয়ই শুনিতে পায় না? কিন্তু সেদিন এক অদ্ভুত কান্ড ঘটিল। সত্যিই অদ্ভুত কান্ড। আমি অবাক হইয়া গিয়াছিলাম।

ব্যাপারটা হইল এরকম। আমি আজকাল কবিতা পড়িতেছি খুব। কবিতা লিখিতেছিও। কবিতা রচনায় যে এত আনন্দ আছে আমি আগে বুঝি নাই। কয়েকটি কবিতা ডায়েরির পাতায় লিখিয়া রাখিয়াছি। এখনও ছাপাইতে দিই নাই কোথাও। পত্রিকায় পাঠাইলেই কি ছাপা হইবে? হয়ত আমার রচনাগুলো কবিতা হয় নাই। যে সব পত্রিকায় কবিতা ছাপা হয় সেগুলিতে পাঠাইলে সম্পাদকরা হয়ত ফেরত দিবেন। আরও কবিতা লিখি। তারপর না হয় পাঠাইব। চাকরির চেষ্টা করিতেছি।

মাঝে মাঝে কবিতা লিখিতেছি। খুকুকে সঙ্গ দিতেছি। এভাবেই আমার দিনগুলি কাটিয়া যাইতেছে। আমার তো তেমন কোনও বন্ধু নাই। মা আমার বন্ধু। খুকু আমার বন্ধু। শুধু কবিতা লিখি না অবশ্য। কবিতা পড়িও। কবিতা অবশ্য বরাবরই পড়ি। যখন কলেজে পড়িতাম, হস্টেলে থাকিতাম, তখনও কবিতার বই কিনিতাম। কবিতা পড়িতাম। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ ইহাদের কবিতা আমার ভাল লাগে। আরও কয়েকজনের কবিতা ভাল লাগে। যেমন বিনয় মজুমদার, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, ভাস্কর চক্রবর্তী। সেদিন খুকুর বিছানার পাশে বসিয়া এক অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করিলাম। ভাস্কর চক্রবর্তীর শ্রেষ্ঠ কবিতা কিছুদিন আগে প্রকাশ হইয়াছে। আমি এক কপি কিনিয়াছি। সেই বই পড়িতে পড়িতে একটা কবিতা পাওয়া গেল। যা আমি আগে পড়ি নাই। কবিতাটির নাম—'ছোটো বোন'। কবিতাটি পড়িয়া এত ভাল লাগিল যে, মনে হইল খুকুকে শোনাই। ও কিছু বুঝিবে না। তবুও শোনাই। খুকুর বিছানার পাশে বসিয়া কবিতাটি আবৃত্তি করিলাম। ছোট কবিতা। তা এরকম :—

আমি কি পাহারা দেব
ছোটো বোন ঘুমায় যখন

দুপুরে, আকাশ নীল
শরীরের, শান্ত কলরব
আমি কি ঘুমোব পাশে
ছোটো বোন ঘুমায় যখন

আমি যখন ছ লাইনের কবিতাটি আবৃত্তি করিলাম খুকু আমার মুখের দিকে তাকাইয়া ছিল। বড় বড় দুই চোখ মেলিয়া তাকাইয়া ছিল। তারপর আমি যখন থামিলাম। খুকু চোখ বুজিল। তারপর আমি দেখিলাম! কী দেখিলাম! খুকুর মুদে থাকা দুই চোখ দিয়া জলের ধারা গড়াইতেছে! খুকু কাঁদিতেছে! আমার মনে হইল ও কবিতাটি শুনিয়া কাঁদিতেছে। কিন্তু এ কি সম্ভব? খুকু যেমন কথা বলিতে পারে না। তেমন শুনিতেও হয়তো পায় না। তাহলে? ঐ ছোট্ট, বেদনাময় কবিতাটি কি সত্যিই খুকু বুঝিতে পারিয়াছে? তাহা না হইলে ওর চোখ দিয়া অশ্রু বাহির হইতেছে কেন? আমি খুকুর দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া ওর কপালে একটা হাত রাখিলাম। হাত বুলাইয়া দিলাম ওর মাথায় কিছুক্ষণ। খুকু চোখ মুদিয়া ছিল। একসময় হঠাৎ চোখ খুলিল। জলভরা দুই চোখে তাকাইল আমার মুখের দিকে। আমার মনে হইল, খুকু যেন বলিতেছে—দাদা, কবিতাটি আমি শুনিয়াছি, বুঝিয়াছি। এ কবিতা আমাদের। তোমার কবিতা। আমারও কবিতা। দাদা আর একবার পড়ো—'আমি কি ঘুমোব

পাশে ছোটো বোন ঘুমায় যখন'। এই পৃথিবীতে বিচিত্র ব্যাপার কত ঘটিতে পারে। খুকুর ক্ষেত্রেও হয়ত তাহা ঘটিতেছে। খুকু হয়ত কথা বলিলে শুনিতে পায়। কিংবা বুঝিতে পারে। একদিন হয়ত ও কথাও বলিতে পারিবে। মা স্কুলের কাজ হইতে বাড়ি ফিরিলে খুকুর কথা বলিলাম। মা বলিলেন—তুমি যা ভাবছ তা হয়তো সত্যি হ'তেও পারে। ঈশ্বর হয়তো একদিন আমাদের কথা শুনবেন। খুকু ভাল হয়ে উঠবে।

আর একটি বস্তু খুকুর খুব প্রিয় ছিল। সেটি হইল একটি আশ্চর্য টেবিল-ল্যাম্প। আমি পার্ক স্ট্রিটের একটি দোকান হইতে কিনিয়াছিলাম। অদ্ভুত জিনিসটি। দেখিলে মনে হইবে একটি ছোট গাছ। যাহার মাথা ভরিয়া ছোট ছোট ঘন পাতার সমাবেশ সেই পাতার মধ্যে আসলে বিন্দু বিন্দু আলো বসানো আছে। সুইচে প্লাগ দিয়া ল্যাম্পটি জ্বালিলে মনে হইবে গাছটির মাথা জ্বলিতেছে। আলো হইয়া দাঁড়াইয়া আছে গাছটি বিশেষত রাতে, আঁধার ঘরে ল্যাম্পটি জ্বলিলে অপূর্ব দেখিতে লাগে। খুকু ওটি দেখিতে খুব পছন্দ করে। অন্ধকার ঘরে ওটি জ্বালাইয়া দিলে সে হাঁ করিযা তাকাইয়া থাকে। বিস্ময়ে তাহার চোখের পলক পড়ে না। আমি প্রতিদিন ঐ আলো জ্বালাইয়া দিতাম খুকুর ঘরে সন্ধ্যার পর। কিন্তু একদিন দুর্ভাগ্যবশত এক কান্ড ঘটিল। আমাদের বাড়ির কাজের মেয়ে সুমি ল্যাম্পটি পরিষ্কার করিতে গিয়া ওটি ভাঙিয়া ফেলিল উহার অসতর্ক হাত লাগিয়া ল্যাম্পটি মাটিতে পড়িয়া ভাঙিল। উহার দন্ডটি কাচের ছিল। ঝাঁকড়া পাতাগুলিও কাচের ছিল।

জিনিসটি ভাঙিয়া যাইবার পর আমি অনেকদিন চাঁদনি চকের দোকানটিতে ঐ ধরনের আরও একটি ল্যাম্পের খোঁজ করিয়াছি। কিন্তু পাই নাই। দোকানের বিক্রেতা ভদ্রলোক বলিয়াছেন ঐ ল্যাম্প এখন আর মার্কেটে অ্যাভেলেবল নয়। অর্ডার দিয়াছেন। আর আসে নাই। হয়তো তাড়াতাড়ি পাওয়া যাইবে।"

ডায়েরির এই অংশ পড়ে তমাল চুপচাপ ভাবছিল। সে মনে করার চেষ্টা করছিল খুকুর ঘরে কোনও টেবিল-ল্যাম্প দেখেছে কী না। মনে পড়ল না। খুকুর ঘরে কী কী আছে তা চোখ বুজিয়েও বেশ মনে করতে পারে তমাল। খুকুর ঘর খুব ছোট এবং ছিমছাম। ইন্দ্রানী খুব বেশি আসবাবপত্র সেখানে রাখেননি। একটা সিঙ্গল খাট। যেখানে খুকু রাতদিন শুয়ে থাকে। একটা কিংবা দুটো চেয়ার। তাকে কিছু কিছু জিনিস। কিন্তু..... নাহ..... টেবিলল্যাম্প নেই। একটা বুককেস। তাতে কিছু বইপত্র। হয়ত সুহাসের প্রিয় কবিতার বইগুলোও আছে। সেভাবে দেখা হয়নি। একদিন দেখবে তমাল। সুহাসের প্রিয় বইগুলো উল্টেপাল্টে সুহাসের না-থাকা আঙুলের স্পর্শ নেবে। কিন্তু খুকুর ঘরে কোনও টেবিলল্যাম্প নেই। এ ব্যাপারে তমাল নিশ্চিত। বোনের জন্যে সুহাসের আর টেবিলল্যাম্প কেনা হয়নি। তার আগে সে জীবনের প্রতি, পৃথিবীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে চিরকালের মতন। এবার তমালকে চেষ্টা করে দেখতে হবে। চাঁদনি চকের কোন দোকান থেকে

সুহাস খুকুর জন্যে টেবিলল্যাম্পটি কিনেছিল? তমালকে খুঁজে দেখতে হবে। সে একদিন সেখানে যাবে। শুধু খুকুর জন্যে টেবিলল্যাম্প খুঁজতে যাবে।.....

এরপর তমাল সুহাসের ডায়েরিতে আরও একজন মেয়ের কাহিনি পড়েছিল। সে হল পর্ণার কাহিনি। সুহাসের পর্ণাদি।..... আবার সেই সাধুভাষা। এ এক অদ্ভুত খেয়াল ছিল সুহাসের। সত্যিই অদ্ভুত। আজকাল সাধু ভাষায় কেউ তো লেখে না। কেনই বা লিখবে। সাধু থেকে চলিতে উত্তরণ তো বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে এক ঐতিহাসিক ব্যাপার। সাধু ভাষা পড়তে ভাল লাগে। বঙ্কিমচন্দ্রের বা রবীন্দ্রনাথের সাধু ভাষা কী ঐশ্বর্যময়! তবে একথাটাও মনে হয় যে, ভাষাকে যেন গয়না পরানো হয়েছে। এক রূপসী নারীকে অলঙ্কারে সাজিয়ে দিলে একরকম দেখাবে। আর আটপৌরে শাড়িতে, নিরাভরণ অবস্থায় অন্যরকম দেখাবে। সাধু আর চলিত ভাষা তো তাই। কিন্তু কেন সুহাস সাধু ভাষা ব্যবহার করেছে তার ডায়েরিতে, এ গবেষণায় গিয়ে লাভ কী তমালের? এটা সুহাসের একটা খেয়াল হতে পারে। শুধু ডায়েরি লিখতেই সে সাধু ভাষা ব্যবহার করেছে। যে দু-একটা কবিতা নিজের ডায়েরিতে লিখে রেখেছে সুহাস, সেগুলো তো চলিত ভাষাতেই লেখা। মানুষের কত কী শখ থাকে। সুহাসের ছিল সাধু ভাষায় ডায়েরি লেখার শখ। তমাল শুধু এটাই ভাবে যে, সাধু ভাষাও বেশ লিখত সুহাস। ডায়েরি থেকে সে জানতে পেরেছিল পর্ণার কাহিনি। সুহাসের পর্ণাদি। এই পাড়ারই বাসিন্দা সেই মেয়েটা। সুহাসের থেকে নিশ্চয়ই বড়। কারণ, সুহাস তাকে দিদি ডাকত। ডায়েরিতে বারবার উল্লেখ আছে—পর্ণা-দি।

"আমাদের বাড়ি হইতে কয়েকটা বাড়ি পরেই পর্ণাদিরা থাকত। পর্ণাদি আমার থেকে বড়। সুন্দরী। লম্বা। ফিকে গোলাপের মতন রং। মুখ, চোখ সবই নিখুঁত। এই পাড়ায় রূপসী বলিয়া পর্ণাদির খ্যাতি ছিল। কলেজে যখন পড়িত পর্ণাদি, তখন থেকেই আমার সাথে তাহার আলাপ। কলেজে বোধহয় পর্ণাদি আর্টস পড়িত। সম্ভবত বাংলায় অনার্স। আমি পর্ণাদিকে ছোটবেলা হইতে দেখিতেছি। এই পাড়ার উঠতি বয়সের সকল যুবক বোধহয় পর্ণাদির পাণিপ্রার্থী ছিল। আমি অনেক দিন দেখিয়াছি, পর্ণাদি রাস্তা দিয়া হাঁটিয়া যাইতেছে আর পাড়ার যুবকগণ যাহারা কোনও না কোনও রকে বসিয়া থাকিত, আড্ডা দিত, বিড়ি-সিগারেট টানিত, তাহরা মুগ্ধ (হয়তো বা লোলুপ) দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া আছে। কিন্তু একথা বলিতেই হইবে, পর্ণাদির বেশ ব্যক্তিত্ব ছিল। সে কাহারও দিকে তাকাইত না। ঘাড় সোজা রাখিয়া রূপের বিভায় চারিপাশ আলোকিত করিয়া গম্ভীরভাবে হাঁটিয়া যাইত। আমি কোনওদিন দেখি নাই রকের যুবকেরা পর্ণাদির দিকে টিটকারি ছুড়িয়া দিতেছে। পর্ণাদির ব্যক্তিত্বের সামনে যুবকেরা সে সাহস পাইত না।

আমার সঙ্গে পর্ণাদির আলাপ পাড়ার লাইব্রেরিতে। আমি তখন ক্লাশ ইলেভেনে।

বিজ্ঞান লইয়া পড়িতাম ঠিকই। আবার গল্পের বইও পড়িতাম। নিজে যত না পড়িতাম আসলে মায়ের জন্যে লাইব্রেরিতে যাইতে হইত বই আনিতে। মা গল্পের বইয়ের পোকা। গল্প পড়েন। উপন্যাসও। কিন্তু সবথেকে পড়িতে ভালবাসেন প্রবন্ধের বই। মা আমাকে বইয়ের তালিকা দিতেন। সেই তালিকায় নানা প্রবন্ধের বইয়ের নাম লেখা থাকিত। বুদ্ধদেব বসু, অম্লান দত্ত, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, অশোক মিত্র, এইসব দিকপাল লেখকদের নাম মায়ের দেওয়া বইয়ের তালিকা হইতে জানিতে পারিয়াছি। কিছু কিছু বই আমিও পড়িতাম। বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গ নিঃসঙ্গতা ও রবীন্দ্রনাথ লাইব্রেরি হইতে মায়ের জন্যে আনিয়াছিলাম। আমিও পড়িয়াছি। শঙ্খ ঘোষের একটি বই পড়িয়া আমার খুব ভাল লাগিয়াছিল। বইটির নাম—সৃষ্টি ও নির্মাণ। এই বইটি আমি পড়িয়াছিলাম দ্বাদশ শ্রেণিতে। অনেককিছুই বোধগম্য হয় নাই। কিন্তু পড়িয়াছিলাম। ভাল লাগিয়াছিল। ঐ বইটি আমাকে পড়িতে বলেন মা।

যা বলিতেছিলাম। পর্ণাদির সঙ্গে আমার আলাপ হয় পাড়ার লাইব্রেরিতেই। একদিন বইয়ের স্লিপ পাঠাইয়া অপেক্ষা করিতেছি। পর্ণাদিকে দেখিলাম। সেও বই লইতে গিয়াছিল। স্লিপে পছন্দমতন বইয়ের নাম লিখিয়া পাঠাইবে, কিন্তু তাহার মনে পড়িয়াছিল পেন আনিতে ভুলিয়া গিয়াছে। আমার দিকে তাকাইয়া পর্ণাদি বলিল—পেনটা একবার দেবে ভাই। আমি দিলাম। পর্ণাদি পেন ব্যবহার করিয়া আমার দিকে তাকাইয়া হাসিল। ফিরত দিল পেন। পর্ণাদির হাসি কী সুন্দর! আমার বুকের মধ্যে যেন জলতরঙ্গের বাজনা বাজিয়া উঠিল। পেনটি ফিরত দিবার সময় পর্ণাদি জিজ্ঞেস করিয়াছিল—তুমি তো আমাদের পাড়ায় থাকো? প্রতিবেশী? আমি ঘাড় নাড়িয়াছিলাম। সেই প্রথম আলাপ। তারপর আলাপ জমিয়া গেল। এরপর থেকে রাস্তাঘাটে আমাকে দেখিলে পর্ণাদি হাসিত। আমিও হাসিতাম। পর্ণাদির হাসি দেখিলেই আমার বুকের মধ্যে জলতরঙ্গের সুর বাজিয়া উঠিত। সেই সুরের ঝঙ্কার আমি নিজের বুকের মধ্যে নিঃশব্দে অনুভব করিতাম। তা শুধু ছিল আমারই অনুভব। তা প্রকাশ করিবার নয়। কাহাকেও বলিবার নয়।

আমি আন্দাজ করিয়া তখনই লাইব্রেরিতে যাইতাম। যখন পর্ণাদি যাইত। কোনও কোনও দিন এমনও হইয়াছে, আমি সন্ধ্যা নামার পরও নিজের বাড়ির দোতলায় জানলায় দাঁড়াইয়া থাকিতাম। মা জিজ্ঞেস করিতেন—লাইব্রেরি যাবি না খোকা? বইগুলো পড়া হয়ে গেছে। পাল্টে নিয়ে আয়। আমি বলিতাম—যাবো মা। খানিক বাদেই যাব। আসলে জানলাতে দাঁড়াইয়া আমি দেখিতাম পর্ণাদি আসিতেছে কিনা। পর্ণাদিকে আসিতে দেখিলেই আমি বাড়ি হইতে বাহির হইতাম। ধীরে ধীরে হাঁটিতাম। ততক্ষণে পর্ণাদি আমাকে পেছন হইতে দেখিতে পাইয়াছে। সে ডাকিত—

—সুহাস এই সুহাস। লাইব্রেরি যাচ্ছো?

—হ্যাঁ পর্ণাদি।

—চলো, একসঙ্গে যাওয়া যাক।

আলাপ হইবার দু-তিন দিন পরই পর্ণাদি আবিষ্কার করিয়াছিল যে, আমার হস্তাক্ষর সুন্দর। তাই বই লইবার শ্লিপ আমাকে দুটি লিখিতে হইত। একটি নিজের। অন্যটি পর্ণাদির। —তোর হাতের লেখা কী সুন্দর রে সুহাস! তাহ'লে আমি আর বইয়ের শ্লিপ লিখি কেন? আমারটাও তুই লেখ।

পর্ণাদি যেসব বই লইত সেসব তাহার পড়ার বই। গল্পের বই নয়। পর্ণাদি বাংলায় অনার্স পড়িত। নানা বিষয়ে সমালোচনা সাহিত্যের নানা বই খুঁজিত সে। বৈষ্ণব পদাবলীর সমালোচনা। রবীন্দ্রনাথের কবিতার সমালোচনা। এরকম নানা বই। একদিন পর্ণাদি আমাকে অনুরোধ করিল অন্যরকম। কিছু কিছু বই লাইব্রেরি হইতে নেওয়ার একটি ছোট কাগজে পৃষ্ঠাসংখ্যা লিখিয়া দিত। তারপর আমাকে বলিত—সুহাস আমাকে ঐ পাতাগুলো থেকে বিষয়টা টুকে দিবি। তোর এত ভাল হাতের লেখা। এক একটা বই থেকে এরকম নোটস্ নিতে হবে আমায় কত আর জেরক্স করব বল তো? আমার হ্যান্ডরাইটিং বাজে। তুই যদি আমাকে সময় করে কপি করে দিস।

—হ্যাঁ। পর্ণাদি। তুমি পেজ-মার্ক দিয়ে দিলে আমি সেগুলো থেকে নোটস্ টুকে দেব।..... পর্ণাদির জন্যে সেই কাজটি করিতে পারিয়া আমার খুবই তৃপ্তি হইত। অন্তত এই কাজটি লইয়া তাহার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলা যাইবে। তাহার হাসিমুখ দেখা যাইবে। আমার বুকের গভীরে গোপনে জলতরঙ্গ বাজিতে থাকিবে। সারাদিন আমাকে আর বিষণ্ণ থাকিতে হইবে না। যখনই মন খারাপ লাগিবে আমি পর্ণাদির হাসিমুখ মনে করিবার চেষ্টা লইব। বুকের মধ্যে জলতরঙ্গের টুং টাং শুরু হইবে। আমার সব কাজে উৎসাহ আসিবে। আমার সারা দিন ভাল কাটিবে।

একদিন দেখিলাম সন্ধের দিকে পর্ণাদি এক যুবকের মোটর-সাইকেল হইতে গলির মোড়ে নামিল। যুবকটি উহাকে নামাইয়া দিয়া, হাত নাড়িয়া চলিয়া গেল। আমি একটি দোকানের আড়াল হইতে লক্ষ্য করিলাম। পর্ণাদি যেদিক হইতে আসিতেছিল আমি সেদিকেই যাইতেছিলাম। কিন্তু কী কারণে যেন আমি দোকানের আড়ালেই দাঁড়াইয়া রহিলাম। উহার মুখোমুখি হইতে চাহিলাম না। এই ঘটনার পর হইতে পর্ণাদির লাইব্রেরি আসা বন্ধ হইয়া গেল। সম্ভবত তাহার বি.এ. (পার্ট টু) পরীক্ষা দেওয়াও শেষ হইয়াছিল। তবে আর পর্ণাদি কেনই বা লাইব্রেরিতে যাইবে? তবে আমি ঐ যুবকের সঙ্গে পর্ণাদিকে রাস্তাঘাটে প্রায়ই দেখিয়াছি। তখন আমার কলেজের প্রথম বর্ষ। একদিন কলেজ হইতে ফিরিবার সময় দেখিয়াছিলাম, পর্ণাদি আর ঐ যুবক ফুটপাত ধরিয়া পাশাপাশি হাঁটিতেছে। দুজনে কথা বলিতেছে। হাসিতেছে। আর কোনওদিকে তাহাদের ভ্রুক্ষেপ ছিল না। আমি যে বাসে জানলার ধারের একটি আসনে বসিয়াছিলাম, সেই বাসটি তখন সিগন্যালের রক্তচক্ষু মান্য করিয়া

দাঁড়াইয়াছিল। আমি যতক্ষণ দেখা যায় উহাদের দেখিয়াছিলাম। পর্ণাদির পাশে যুবকটিকে বেশ মানাইয়া ছিল। পর্ণাদি যেমন সুন্দরী। যুবকটিও তেমনই সুন্দর। দীর্ঘকায়। ছিপছিপে চেহারা। খেলোয়াড়দের মতন। যুবকটি কি খেলোয়াড় ছিল? কে জানে? হবেও-বা। যুবকও গৌরবর্ণ। একমাথা কোঁকড়ানো চুল। হাঁটিতে হাঁটিতে সে সিগারেট টানিতেছিল। তাহার কী একটা কথায় পর্ণাদি হাসিতেছিল। তারপর একসময় তাহারা চোখের বাহিরে চলিয়া গেল।

বছরখানেক পর কানে আসিল পর্ণাদির বিবাহ। আমরা পাড়ার প্রতিবেশী। সুতরাং বিবাহ-অনুষ্ঠানে আমাদেরও নিমন্ত্রণ করা হইল। একদিন সন্ধ্যার দিকে পর্ণাদির বাবা আমাদের বাড়িতে আসিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন। যে যুবকটির সঙ্গে পর্ণাদিকে রাস্তাঘাটে দেখিতাম তাহার সঙ্গেই কি পর্ণাদির বিবাহ হইতেছে? নিমন্ত্রণ-পত্রে দেখিলাম পাত্রের নাম হল, রূপেন।..... রূপেনের সহিত পর্ণার শুভবিবাহ সুসম্পন্ন হইতে চলিয়াছে। আমার কৌতূহল রহিয়া গেল। সেই যুবকের নাম কি রূপেন?

বিবাহের দিন মায়ের সঙ্গে আমিও নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলাম। সন্ধ্যা লগনে ছিল বিবাহ। বর আসিয়া গিয়াছে। একটি ঘরে ফুলে সজ্জিত সিংহাসনে বসিয়া আছে। আমি দেখিয়াই চিনিলাম। সেই যুবক। উহারই নাম রূপেন? পর্ণাদি নানা অলঙ্কারে সাজিয়া আর একটি ঘরে বসিয়াছিল। তখনও বিবাহ শুরু হয় নাই। আরও অনেক সুসজ্জিতা রমণী পর্ণাদিকে ঘিরিয়াছিল। কী অপরূপ দেখাইতেছিল পর্ণাদিকে! যেন এই রূপ পৃথিবীর নয়। পৃথিবীর মালিন্য যেন পর্ণাদির ঐ রূপকে স্পর্শ করিতে পারিবে না কোনওদিন। হায় তখন কি জানিতাম পর্ণাদি রূপেনকে স্ব-ইচ্ছায় বিবাহ করিয়া কী ভুল করিয়াছে? পর্ণাদি নিজেও কি জানিত?

সেদিন নিমন্ত্রণ খাইয়া বাড়ি ফিরিয়া কেন জানি না নির্জনে, নিঃশব্দে খুব কাঁদিয়াছিলাম। আমার বিছানায় আমি একা শুই। বালিশে মুখ গুঁজিয়া অনেক রাত অব্দি কাঁদিয়াছিলাম। তারপর একসময় কান্না থামিল। আমি মনে মনে প্রার্থনা করিলাম পর্ণাদি এবং রূপেনের জন্যে। বলিয়াছিলাম—ঈশ্বর উহারা যেন সুখে থাকে।.....

তারপর বহুদিন কাটিল। পর্ণাদির কোনও খবর পাই নাই। নিশ্চয়ই উহারা সুখেই ছিল। খোঁজ পাইলাম বহুদিন পর। এই সেদিন। প্রায় পাঁচ বছর পর। একদিন বিডন স্ট্রিট দিয়া হাঁটিতেছি। কে যেন আমার নাম ধরিয়া ডাকিল। নারীকণ্ঠ। আমি ফিরিয়া তাকাইলাম। রাস্তার ওপারে বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়াইয়া ছিল পর্ণাদি। আমাকে হাত নাড়িয়া ডাকিতেছিল।.....

আমি রাস্তা পার হইয়া পর্ণাদির সামনে দাঁড়াইলাম। পর্ণাদি বলিল—সুহাস চিনতে পারছ? এত রোগা হয়ে গেছ কেন?

—হ্যাঁ পর্ণাদি। চিনতে পারব না কেন? আপনি কেমন আছেন?

—আমি? —পর্ণাদি হাসিল। ফিকে, ম্লান হাসি। —আমাকে দেখে কী মনে হচ্ছে?..... পর্ণাদিকে দেখিয়া একটু অন্যরকম লাগিতেছিল এটা ঠিক। প্রসাধন ও সাজগোজের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে যেন পর্ণাদির। তাহার পরনে ছিল জিনস্ ট্রাউজার। আর একটি শার্ট। লাল রং-এর শার্ট। ঠোঁটে চড়া লিপস্টিক। মাথার চুল ছিল চূড়া করিয়া বাঁধা। হাতে শাঁখা, পলা, সোনার চুড়ি কিছুই নাই। ডান হাতের কবজিতে টিকটিক করিতেছিল একটি ঘড়ি। বাঁ-হাতের কবজিতে একটি সোনার চেন। উহার চোখ দুটিতে মোটা দাগের কাজল। চোখের পাতাগুলি কীরকম জ্বলজ্বল করিতেছিল। আমি বুঝিয়াছিলাম। চোখে আইল্যাশ ব্যবহার করিয়াছে। আমার মনের মধ্যে পর্ণাদির যে ছবি ছিল তাহা এরকম নয়। বিয়ের আগে পর্ণাদিকে দেখিতাম কী স্নিগ্ধ সাজগোজ। কত অল্প। অথচ কত নিখুঁত। বিয়ের পর সেই প্রথম দেখিলাম। তখন মনে হইতেছিল, পর্ণাদির সাজসজ্জা খুবই উগ্র, চড়া দাগের। কিন্তু সামনাসামনি আর কী বলিব? মৃদু হাসিয়া বলিলাম—দেখে তো ভালোই মনে হচ্ছে। বেশ সুখে আছো।..... আনন্দে আছো।

আমার উত্তর শুনিয়া পর্ণাদি, যেন পারিপার্শ্বিক ভুলিয়া উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল। —ভালো বলেছ। সুখে আছি। আনন্দে আছি।..... তা থাকবই তো। জানিসা সুহাস—আমার এখন অনেক টাকা।

—তুমি থাকো কোথায়? পর্ণাদি?

—সদর স্ট্রিটে।..... একটা খুব বড় ফ্ল্যাটে। যাবি?

সদর স্ট্রিট ঠিক কোথায় আমার জানা ছিল না। হইবে হয়ত কাছাকাছি কোথাও। খুব ধনী পল্লী নিশ্চয়ই। আমি কিছু উত্তর দিবার আগেই পর্ণাদি কী ভাবিল, তারপর বলিল—নাহ আজ থাক। তোতোকে আমার ফ্ল্যাটে নিয়ে গিয়ে আর কাজ নেই। কিন্তু এতদিন পর দেখা। তোর কথা প্রায়ই মনে পড়ে আজকাল সুহাস। তোমার হাতের লেখা কী সুন্দর ছিল। তুই আমার কত নোট লিখে দিয়েছিস। সেই জীবনটাই ভালো ছিল সুহাস।..... পর্ণাদি দীর্ঘশ্বাস ছাড়িলেন। ব্যস্ত রাজপথের এক বাসস্টপে আমরা দাঁড়াইয়া ছিলাম। আশেপাশে অপেক্ষমান যাত্রীরা। তাহাদের অনেকেই আমাদের কথা শুনিতেছিল। কেহ কেহ তাকাইয়া দেখিতেছিল পর্ণাদিকে। আমাকেও। পর্ণাদি তাহা বুঝিল। কীরকম অস্বস্তি পাইল। বলিল—অনেক কথা মনে পড়ে যাচ্ছে সুহাস। এতদিন পর তোকে দেখে কী ভাল যে লাগছে। অনেক কথা বলতে ইচ্ছে করছে। আমি কাউকে পাই না আমার কথা বলার। আমার কথা কেউ শোনে না। শুধু.....থামিল পর্ণাদি। কী বলিতে গিয়াও যেন বলিতে পারিল না। বরং বলিল—চল, কাছাকাছি একটা স্ন্যাকবার আছে। বসার জায়গা আছে। ওখানে কিছুক্ষণ বসি। তোকে কিছু খাওয়াই। এতদিন পর দেখা। তোকে ছাড়তে ইচ্ছে করছে না।

পর্ণাদির সাথে আমি যে জায়গায় আসিলাম তাহা দেখিয়াই বুঝিলাম যথেষ্ট

বিলাসবহুল। পুরোপুরি শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। এ রকম জায়গায় আমি কখনও আসি নাই। বাহিরে যে তীব্র দ্বিপ্রহর তাহা সেই হোটেলের অভ্যন্তরে বুঝিবার উপায় নাই। মৃদু আলোর রেশ ছড়াইয়া ছিল। চাপা রেশ। মনে হইতেছে বেশ গভীর রাত। টেবিলে টেবিলে নারী, পুরুষ। সুরাপান চলিতেছিল। নানারকম খাদ্যদ্রব্যও খাইতেছিল অনেকে।

একটি ফাঁকা টেবিল দেখিয়া পর্ণাদি বসিল। আমাকেও বসিতে বলিল। জিজ্ঞেস করিল—কি খাবি সুহাস?

—কিছু খাব না পর্ণাদি।

—তা কি হয়? এখানকার চিকেন রেশমী কাবাব চমৎকার। আর বাটার নান। তুই এসব খাস তো?

—খুব রিচ খাবার আমার পেটে সয় না পর্ণাদি। বিশেষ করে ভাজাভুজি একেবারে খাই না। মাঝে মাঝেই অম্বলে ভুগি।

—সে কি! এই বয়সেই অম্বলের রোগ।..... যাহোক একদিন খা। এখানকার খাবার ভাল।

ধোপদুরস্ত পোশাক এবং মাথায় পাগড়ি বেয়ারারা ঘোরাঘুরি করিতেছিল। সুদর্শন এক যুবক, পরনের স্যুট, টাই, একটি নোটবুক হাতে লইয়া আমাদের টেবিলের দিকে আসিল। পর্ণাদি তাহাকে অর্ডার দিল। যুবক নোটবুকে অর্ডার লিখিয়া নিল। তাহার পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা। পর্ণাদি একথা-সেকথা বলিতেছিল। ইতিমধ্যে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিল। দীর্ঘকায় আর এক যুবক আমাদের টেবিলের কাছে আসিল। চোখের দৃষ্টি তীব্র। চিবুকে ফরাসিকাট দাড়ি। সেই দাড়ির রং বাদামি। ডান হাতে ঝকঝক করিতেছিল একটি বালা। যুবক আসিয়া কীরকম বাঁকা হাসি হাসিয়া বলিল—লিজা হাউ ডু ইউ ডু?....পর্ণাদির নাম কী লিজা? যুবক ভুল করিতেছে না তো? আমার দিকে তাকাইয়া যুবক পর্ণাদিকে বলিল— আজকাল টিন-এজারদের সঙ্গেও চলছে নাকি? পর্ণাদির মুখে নানা রং-এর ক্রিয়া-বিক্রিয়া দেখিতেছিলাম। প্রথমে মনে হইল, তাহার মুখ কাগজের মতন সাদা। তারপর বেগুনি। তারপর রাগে রক্তবর্ণ দেখাইতেছিল। চাপা গলায় পর্ণাদি যুবককে বলিল—হানিফ—ডোন্ট টক রাবিশ। ও আমাদের পাড়ায় থাকত। আমি একটু কথা বলছি।

—তা বেশ। —হানিফ হাসিল। —ইন দ্যাট কেস, ইউ মে টেক ওয়ান আওয়ার? আফটার দ্যাট লেটস গো টুগেদার। আই উইল বি ওয়েটিং ওভার দ্যাট সাইড। —সে হোটেলের কোণের দিকের একটি টেবিল দেখাইল। পর্ণাদি ক্রোধে মস্‌মস্ করিতেছিল। সে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। আমাকে বলিল—সুহাস চল। দিস ইজ আ হেল। ডগস ফলো মি এভরিহোয়ার। এখানে বসে তোর সঙ্গে কোনও কথা বলা যাবে না। বেরিয়ে চল।

আমরা চেয়ার ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসিতেছি, একজন বেয়ারা খাবারের ট্রে লইয়া আসিল। বলিল—ম্যাডাম চলে যাচ্ছেন? ফুড—পর্ণাদি বলিল—স্যরি। খাবারের দাম আমি দিয়ে দিচ্ছি। আমি দেখিলাম হাতের ব্যাগ খুলিয়া পর্ণাদি তিনটি করকরে একশো টাকার নোট টেবিলের উপর রাখিল। তারপর গটগট করিয়া হোটেল হইতে বাহির হইয়া আসিল। আমিও তাহাকে অনুসরণ করিলাম। শুধু হোটেলের দরজা টানিয়া বাহির হইবার মুহূর্তে একবার ফরাসিকাট দাড়ির হানিফ-নাম্নী সেই যুবকের দিকে তাকাইলাম। দেখিলাম ক্রোধ নয়, বিস্ময়ের দৃষ্টিতে সে তাকাইয়া আছে পর্ণাদির দিকে। আমার কিছুই বোধগম্য হইতেছিল না। কে এই যুবক? সে পর্ণাদিকে লিজা ডাকিল কেন? পর্ণাদি তাহাকে দেখিয়া এমন অস্বস্তিতে পড়িলেন যে, চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া আসিলেন। কেন? পর্ণাদির স্বামী রূপম কী চাকুরি করে? পর্ণাদির ব্যাগে নিশ্চয়ই অনেক টাকা থাকে। হোটেলের খাবার স্পর্শ না করিয়াও পর্ণাদি ব্যাগ খুলিয়া তিনশো টাকা রাখিয়া আসিল!

হোটেল হইতে রাস্তায় নামিয়া পর্ণাদি একটি ট্যাক্সি ডাকিল। আমাকে উঠিতে বলিল। তারপর আমরা একটি বহুতল বাড়ির সামনে আসিয়া দাঁড়াইলাম। লিফ্‌টে উঠিলাম। পর্ণাদি বোতাম টিপিল—৫। তার মানে ফিফথ ফ্লোর। ৬-তলা। মাটি হইতে অনেক উঁচু। পর্ণাদি খুব ভালো আছে। আমার মনে হইল। আমাদের নিতান্ত মধ্যবিত্ত পাড়া। পর্ণাদিদের সাদামাঠা একতলা বাড়ি। সে তুলনায় পর্ণাদি এখন রীতিমতো ধনী সম্প্রদায়ের মানুষ।”.....

তমাল ডায়েরির এই পর্যন্ত পড়ে উল্টে রাখল বিছানায়। একটা সিগারেট টানতে ইচ্ছে হল। তমাল আজকাল সিগারেট টানে। বেশি নয়। সারা দিনে হয়ত চারটে। এই নেশা খুবই ক্ষতিকর সে জানে। দিনে চারটে সিগারেটও স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল নয়। ধূমপানের বিরুদ্ধে কতরকম প্রচার আজকাল হয়। সংবাদপত্রে। দূরদর্শনে। রাস্তাঘাটে পোস্টারের মাধ্যমে। তমালের চোখে পড়ে সেসব। কিন্তু তবুও আজকাল সে একটু-আধটু সিগারেট টানে। বড় ভালো লাগে। অনেকক্ষণ ভাবনা-চিন্তা করার পর কিংবা পড়াশোনা করার পর সিগারেটের ধোঁয়া মগজকে যেন সজীব করে। তাই কি? এসব হয়ত মনের ভুল। নেশার সম্মোহন। কোনও নেশার কবলে পড়া ঠিক নয়। সিগারেট ছাড়তে হবে।..... কিন্তু এই মুহূর্তে সিগারেটের প্রয়োজনীয়তা ভীষণভাবে বোধ করছে তমাল। সুহাসের ডায়েরি একটানা অনেকক্ষণ পড়ছে সে। এবার একটু বিরতি। এবার একটা সিগারেট।

বাড়ির ভেতরটা একবার ঘুরে এল তমাল। এখন দুপুর। খাঁ-খাঁ করছে বাড়ি। উঠোনে কিছু এঁটো বাসনপত্র পড়ে আছে। সেখানে দুটো চড়াইপাখি। তিড়িং তিড়িং লাফাচ্ছে। আর নিজেদের মধ্যে কিচিরমিচির করছে। দোতলায় পাশের ঘরে মায়ের ভজন চলছে টেপ-রেকর্ডে। কিন্তু মা গভীর ঘুমে মগ্ন।

তমাল তার ঘরের র‍্যাকে বইয়ের ফাঁকে রাখা সিগারেট-প্যাকেট বের করল। দেশলাই। তারপর সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল ছাদে। রোদে ছেয়ে আছে ছাদ। ঘোলা রং আকাশ। উড্ডীয়মান দুটো চিল চক্রাকারে ঘুরছে। একটা চিল আর একটাকে কি ছুঁতে চাইছে? ওরা কি নারী এবং পুরুষ?..... তমাল সিগারেট ধরাল। সুহাসের ডায়েরি তার মাথায় ঘুরছে। কত অভিজ্ঞতা সুহাসের। তমালের এত অভিজ্ঞতা নেই। পর্ণাদির ব্যাপারটা তমাল বুঝেছে। পর্ণাদি বিয়ের পর বেশ্যা। দেহ-পসারিনী। যৌন-কর্মী। পর্ণাদির গল্পটা বুঝে ফেলেছে তমাল। গল্প নয়। সত্যি ঘটনা। সুহাস তো আর গল্প লেখেনি। সত্যি ঘটনাই লিখেছে। কিন্তু পর্ণাদির এই অবস্থা কেন? সে তো রূপমকে ভালবেসেছিল। তাদের বিয়ে হয়েছিল। সামাজিক আচার মেনে বিয়ে হয়েছিল। তারপর কী হল? টান দিতে দিতে সিগারেট শেষ। তমাল ঘরে এল। উপুড় হয়ে শুল বিছানায়। আবার পড়তে লাগল সুহাসের ডায়েরি।

"পর্ণাদির ফ্ল্যাট যে খুব বড় এবং নানারকম দামি আসবাবপত্রে সাজানো সেই বর্ণনায় আর গিয়া লাভ কী? শুধু যেটি উল্লেখ করিবার সেটি হইল এই যে, সেই প্রশস্ত বাড়িতে আমি পর্ণাদির স্বামী রূপমকে দেখি নাই। এমনকী অতবড় বাড়ির কোনও দেয়ালে কিংবা অন্য কোথাও ওদের দুজনের কোনও ফোটোগ্রাফও দেখি নাই; যা অনেক গৃহস্থের বাড়িতে যাইলেই দেখা যায়।

পর্ণাদি-র জীবনের গল্পটি অবশ্য খুবই সহজ। আজকালকার বাংলা উপন্যাসে কিংবা সিনেমায় এরকম গল্প পাওয়া যায়। জীবনে যখন তা ঘটে; পরিচিতজনের জীবনে ঘটে, তখনই মনে বিষম আঘাত লাগে। মনে পড়ে সেই প্রবাদবাক্য—Truth is stranger than fiction। বিবাহের কয়েক মাস পরেই রূপমের আসল চেহারা প্রকাশ পাইয়াছিল। সে ছিল যথার্থই রূপবান ও কথাবার্তায় চৌখশ এক যুবক। সুতরাং সে যখন পর্ণাদি ও তাহার পরিবারের লোকজনকে জানাইয়া ছিল যে সে একজন মেডিক্যাল রিপ্রেসেনটেটিভ; তখন কাহারও সন্দেহ হয় নাই। ইহাও জানাইয়া ছিল যে, তাহার বাবা ও মা দুজনেই গত। সে কলকাতা শহরে একটি ফ্ল্যাট ভাড়া করিয়া থাকে। সে একমাত্র সন্তান। শুধু তাহার এক দূর-সম্পর্কের দাদা আছেন। তিনি নাসিকে থাকেন। সেখানেই চাকুরি করেন। রূপমের বিবাহ-অনুষ্ঠানে তাঁহারা দুজন এবং কিছু বন্ধুবান্ধব উপস্থিত থাকিবে। পর্ণাদির বাড়ির লোকজনের কোনও সন্দেহ হয় নাই এই কারণে যে, রূপমকে সবসময়ই তাহাদের খুব স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিক লাগিয়াছে। আরও ভাল লাগিয়াছিল যখন দেনাপাওনার কথা উঠিলে রূপম জানাইয়া ছিল সে কয়েকটি আদর্শ লইয়া চলে। তাহার মধ্যে একটি হইল, বিবাহে পণ না নেওয়া এবং পণ না দেওয়া। বিশেষত সেই বিবাহে তো পণ নেওয়ার প্রশ্নই ছিল না (রূপমের বক্তব্য পর্ণাদি যাহা জানাইয়াছিল) কারণ রূপম পর্ণাকে ভালবাসে। প্রায় এক বৎসরকাল তাহারা দুজন ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করিয়াছে। একে অপরকে

জানিয়াছে। বিবাহ হইল। ঠিক সাত দিন পর রূপম তাহার মুখোশ খুলিল।

একদিন তাহাদের রিচি রোডের সুসজ্জিত ফ্ল্যাটে রূপমের কয়েকজন বন্ধু আসিল। একেবারে চারজন। তাহাদের মধ্যে দুজনকে পর্ণাদি চিনিত। বিবাহ-অনুষ্ঠানে তাহারা বরযাত্রী গিয়াছিল। আর দুজনকে চেনে না। তাহাদের মধ্যে একজন অবাঙালি। কফি-বিস্কুট দিবার পর সবাই গল্পে মাতিয়া গিয়াছে। পর্ণাদির খারাপ লাগিতেছে না। রূপমের বন্ধুদের বেশ ভদ্র ও মার্জিত মনে হইতেছিল। হঠাৎ রূপম বলিয়াছিল, সে কিছু মিষ্টান্ন এবং কয়েকটি কোল্ড ড্রিঙ্কস-এর বোতল কিনিতে বাহিরে যাইতেছে। আধঘন্টার মধ্যে ফিরিয়া আসিবে। পর্ণাদি-র কোনও সন্দেহ হয় নাই। বিস্কুট ছাড়া আপ্যায়ন করিবার মতো (অতজন অতিথিকে) বাড়িতে আর কিছু ছিলও না। কিন্তু আধঘন্টা কেন একঘন্টা কাটিয়া গিয়াছিল রূপমের দেখা নাই। খানিক বাদে অতিথিদের একজন একটি বড় মদের বোতল বাহির করিয়াছিল ঝোলা ব্যাগ হইতে। পর্ণাদি-র ভীষণ অস্বস্তি হইতেছিল। অস্বস্তি এবং ভয়। চারজন মদ্যপান করিতে করিতে অশ্লীল আলোচনা করিতেছিল পর্ণাদির সামনেই। পর্ণাদির কীরকম সন্দেহ হইয়াছিল। সে উঠিয়া দরজা খুলিয়া বাহিরে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল। চারজনের একজন আসিয়া বাধা দিল। আর একজন জানাইয়া ছিল যে, রূপমের সন্ধান করিতে যাওয়া বৃথা। কারণ সে ততক্ষণে কলকাতা ছাড়িয়া অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে। তাহার পকেটে ছিল দু-লাখ টাকা। পর্ণাদি-র মূল্য।

সেদিন পরপর চারজন পর্ণাদিকে তাহাদের ইচ্ছামতো ভোগ করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে অবাঙালি ব্যক্তিটিই হইল পালের গোদা। এই শহর জুড়িয়া নারীদের লইয়া তাহার ব্যবসা। রূপমের মতো অনেক এজেন্ট শুধু এই শহর কেন, ভারতবর্ষের নানা শহরে ছড়াইয়া আছে। দীর্ঘদিন ধরিয়া তাহারা টোপ ফেলে। পর্ণাদি-র মতো ভদ্রঘরের সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে ভালবাসার নিখুঁত অভিনয় করে। অনেক ক্ষেত্রে (পর্ণাদির জীবনে যেমন) বিবাহ হয়। তাহার পর প্রকৃত সত্য জানা যায়।

ঐ ঘটনার পর পর্ণাদির পক্ষে এক অভিজাত যৌন-কর্মী হওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না। আর একটা উপায় অবশ্য ছিল। আত্মহনন। কিন্তু সম্ভবত সে ব্যাপারে পর্ণাদির সাহসে কুলোয়নি।

সদর স্ট্রিটে পর্ণাদির বিলাসবহুল ফ্ল্যাট, তাহার ভ্যানিটি-ব্যাগে গোছা গোছা নোট এসবই হইল পর্ণাদির নিজের উপার্জন। প্রতিদিন নিজের শরীরের বিনিময়ে উপার্জন। প্রতিদিনের উপার্জনের তিরিশ পার্সেন্ট তাহাকে দিতে হয় সেই অবাঙালিকে। তাহার নির্দেশ এবং সহায়তাতেই পর্ণাদির ব্যবসা টিকিয়া আছে।

সেদিন পর্ণাদি আমাকে সব কথা বলিয়াছিল। এর আগে কাহাকেও বলে নাই। আমাকেই বলিয়াছিল। বলিবার পর একটি মোক্ষম প্রশ্ন করিয়াছিল। সেই প্রশ্নটি আমি শুধু নির্বাক শুনিয়াছিলাম। পর্ণাদি-র দুই চোখে অশ্রুর কুয়াশা। সেই কুয়াশার

ওপর হইতে পর্ণাদি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—সুহাস বলতে পারিস আমার জীবনেই কেন এমন হ'ল? আমি তো জ্ঞানত কোনও পাপ করিনি। কারোর ক্ষতি করিনি। শুধু একজনকে ভালবেসেছিলুম। তবুও ভগবান আমাকে এত বড় শাস্তি কেন দিলেন? আমি তো এখন নষ্ট মেয়ে। তোদের সংসারে আমার কোনও জায়গা নেই। আমার কেন এমন হল? জীবন আমাকে এত কঠিন শাস্তি কেন দিল?

পর্ণাদি-র প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারি নাই। আমি কী করিয়া জানিব? মাত্র একুশ কিংবা বাইশ বৎসরে কি সব জানা যায়? তবে জীবনের এই বিচিত্র এবং নিদারুণ রসিকতার কোনও কারণ আমিও খুঁজিয়া পাই নাই। মাঝে মাঝে আমার খুব হতাশ লাগে। পর্ণাদির কথা ভাবিয়া আমি কষ্ট পাই। আমার চারপাশে নিত্যদিন যাহা ঘটিতেছে তাহা জানিয়াও আমি কষ্ট পাই। সংবাদপত্রে কত খবরই না প্রতিদিন পড়ি। এই তো সেদিন পড়িলাম এক শহরের পুলিশ বিভাগের সর্বময় বড়কর্তার বাড়ি তল্লাশি করিয়া প্রায় পঞ্চাশ লাখ হিসাব-বহির্ভূত টাকা এবং সোনার বাঁট মিলিয়াছে। কিংবা স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পরীক্ষার মার্কশিট ও সার্টিফিকেটের জাল চক্র ধরা পড়িয়াছে। সেই চক্রের নায়ক ছিলেন এমন একজন শিক্ষক যাঁহাকে ছাত্রছাত্রীরা খুবই মান্য করিত।

এইসব সংবাদ পড়িবার পর আমি ভীষণ আহত বোধ করি। আমার হাতদুটি কাঁপিতে শুরু করে। আমার কান্না পায়। মা জানে না আমি সমাজের হাল দেখিয়া নির্জনে কত নিঃশব্দ কান্নাই না কাঁদিয়াছি। পর্ণাদির নিঃশর্ত ভালবাসার প্রতিদান কি ভয়ঙ্কর? পুলিশ কমিশনার;—যিনি কত উচ্চশিক্ষিত, যাঁর উপর শহরের মানুষের নির্ভয় আস্থা, তিনি চোর! শিক্ষক যিনি মানুষ গড়ার কাজে ব্রতী তিনি প্রতারক! মাঝে মাঝে মনে হয় এই চরম দুর্নীতির সমাজে আমি কী করিয়া বাঁচিয়া থাকিব? আমার এই জীবন লইয়া আমি কী করিব?"

এখানেই সুহাসের ডায়েরি শেষ। তার সেই নির্জন আত্মকথন আর দেখতে পেল না তমাল। যদিও ডায়েরির অনেক পৃষ্ঠাই তখনও ফাঁকা ছিল। আর কোনও ডায়েরি লেখেনি সুহাস। জীবন নিয়ে, পূতি-গন্ধময় এই সমাজ নিয়ে সেই জিজ্ঞাসা বুকের মধ্যে গোপন করে একা একা সে বেড়িয়েছে কতদিন। তমালের মনে হ'ল, সুহাস আসলে ভীষণ সংবেদনশীল ছিল। সে ছিল মূলত কবি। সমাজ নিয়ে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ, তার মনে ছিলই। তারপর তার জীবনেও এক দুর্ঘটনা ঘটেছিল। বিকল টেলিফোন সারাতে এসে সেই দুজন মেকানিক যখন ঘুষ চেয়েছিল ক্ষোভে তাদের বিরুদ্ধে ফেটে পড়েছিল সুহাস। ঘুষ সে দেয়নি। প্রতিবাদ করেছিল। বিনিময়ে তাকে ওরা প্রকাশ্যে নাঙা করেছিল। নির্দয়ভাবে মেরেছিল। সেই অপমান সহ্য হয়নি সুহাসের। তাই সে নিজের শরীরে নিজের হাতে কেরোসিন ঢেলে জ্বেলে দিয়েছিল একটা দেশলাইকাঠি!

তমালের মন হু-হু করে উঠল। সে অনুভব করল প্রকাশ্যে নয়, নিজের ভেতরে সে কাঁদছে। সুহাসের জন্যে। ইন্দ্রানী সুহাসের জন্যে নিশ্চয়ই অনেক চোখের জল ফেলেছেন। আরও ফেলবেন। কিন্তু খুকু? সে তো কিছুই জানে না? বিনা কারণে খুকুরই বা এরকম ভয়ানক শাস্তি কেন? খুকুর নিষ্পাপ, উজ্জ্বল এবং সুন্দর চোখদুটো তমালের মনে পড়ল। সে খুকুর কাছে যাবে। আগামিকাল।

১৪

সুধা যে আবাসনে থাকে সেই অঞ্চলে প্রথম দিকে খুব একটা দোকান-টোকান ছিল না। ইদানীং কয়েকটা হয়েছে। এরকমই হয়ে থাকে। শৈবাল জানে। ধান-জমি, মাঠ-ঘাট বুজিয়ে জমি তৈরি হয়। সেই জমিতে বহুতল বাড়ি ওঠে। মানুষজন আসতে শুরু করে। তারপর ক্রমে দোকান, বাজার, ব্যবসা-কেন্দ্র গড়ে উঠতে থাকে। এভাবেই পত্তন হয় এক একটা অঞ্চলের। প্রথমদিকে যখন আবাসনে সবেমাত্র দু-পাঁচটা ফ্যামিলি আসতে শুরু করেছিল, (সুধাও তাদের মধ্যে একজন), তখন আশেপাশে কয়েকটা মাত্র দোকান চোখে পড়েছিল শৈবালের। একটা চায়ের দোকান। মুদির দোকান একটা। সেলুন। যতদূর মনে পড়ছে গম ভাঙানোর একটা দোকানও। সেই দোকানগুলোর ছিরিছাঁদও ভাল ছিল না। রাস্তার ধারে চওড়া ড্রেনের ওপর বাঁশ ও কঞ্চির খাঁচা বানিয়ে কোনওরকমে তৈরি করা হয়েছিল নড়বড়ে দোকানগুলো। 'তৈরি করা হয়েছিল' ভাবলেও বোধহয় ঠিক ভাবা হবে না। অনেকটাই ভুল ভাবা হবে। পলকা, ছিটেবেড়ার ঐসব দোকানগুলো আসলে এখানে অনেকদিন আছে। স্থানীয় মানুষের প্রয়োজন মেটাচ্ছে। এক বিরাট আবাসন হঠাৎ গজিয়ে ওঠার ফলে, এখানে নতুনভাবে থাকতে আসা নানা শ্রেণির, নানা পদমর্যাদার মানুষদের কথা ভেবে সুযোগসন্ধানী ব্যবসায়ীরা কিছু দোকান সম্প্রতি শুরু করেছে; আর কিছু পুরনো দোকান নিজেদের ভোল পালটে নিয়েছে। শৈবাল আবাসনের দিকে এগোতে এগোতে এসব কথাই ভাবছিল। 'সুগার অ্যান্ড স্পাইস'-এর দোকান এখানে তো ছিল না। ইদানীং হয়েছে। এরকমই ঝকঝকে এক মিষ্টির দোকান, লেডিস টেলারিং শপ, শাল রিপেয়ারিং হাউস--এসব নতুন হয়েছে। গম ভাঙানোর দোকানটা নেই। তার বদলে সিডি এবং ক্যাসেট বিক্রির দোকান। আর সেলুনের চেহারাও কবে যেন পালটে গেছে। ম্যাড়মেড়ে দোকানটার বদলে 'বিউটি স্পট' এই নামের ঝাঁ-চকচকে সেলুন। পর্দা ঝুলছে। পর্দার ফাঁক দিয়ে শৈবাল দেখল, পরপর কয়েকটা ঘূর্ণি-চেয়ার। সেই চেয়ারগুলোর লাল কুশন।

একেবারে শুধুহাতে ঢুকবে সুধা-মঞ্জিলে? সুধার ফ্ল্যাটকে মনে মনে শৈবাল

'সুধা-মঞ্জিল' বলে। একবার বলেওছিল সুধাকে। সুধা বলেছিল—আহা ঢং! নিজের বাড়িটা তাহলে মন্দির? সেখানে তোমার সতীসাধ্বী বউ আছে। ছেলে আছে। আর আমার এখানটা মস্তি করার জায়গা। তাই মঞ্জিল না? শৈবাল শুকনো হেসে বলেছিল—আরে ওভাবে দেখছ কেন?

নাহ, শুধুহাতে ঢোকা ঠিক নয়। বিশেষত এখন বেলা প্রায় পড়ে এল। রোদ নেই আর। পাতলা এক অন্ধকার আকাশের বুক থেকে ধীরে ধীরে নেমে আসছে পৃথিবীতে। চারপাশে আলো জ্বলে উঠছে। আবাসনের ফ্ল্যাটগুলোতেও আলো জ্বলে উঠছে একটা একটা করে। 'সুগার অ্যান্ড স্পাইস'-এর দোকানে ঢুকল শৈবাল। কয়েকটা চিকেন-প্যাটিস কিনল। এই বস্তুটা সুধার পছন্দ। দোকানের ছেলেটা যখন প্যাটিসগুলো শো-কেস থেকে বের করে বৈদ্যুতিক-ওভেনে গরম করার জন্যে ঢুকিয়ে দিল; শৈবালের হঠাৎ তমালের মুখটা মনে পড়ল। মুহূর্তে ঝোড়ো হাওয়ার মতো এক তীব্র অপরাধবোধ তাকে যেন বিব্রত করে দিল বেশ। এ কোন্ জীবন বেছে নিয়েছে সে? চরম মিথ্যের এক জীবন। প্রতারণার এক জীবন। আত্মপ্রতারণাও। কী প্রয়োজন ছিল এই জীবন বেছে নেওয়ার? শুধুমাত্র নিজের ইন্দ্রিয়সুখের জন্যে; যৌন-অতৃপ্তি চরিতার্থ করার জন্যে এত দগদগে মিথ্যের চোরাবালিতে নিজেকে আমূল ডুবিয়ে দেবার কী দরকার ছিল? নাহয় অনিতার ধর্মটর্ম নিয়ে দুর্বলতা একটু বেশি মাত্রায় আছে। সে বয়সের তুলনায় যথেষ্ট শুচিবাইগ্রস্ত। স্বামীর শারীরিক তৃপ্তির ব্যাপারে তার মনোযোগ কোনওকালেই তেমন নয়। বিছানায় অনিতাকে, যখন সদ্য বিয়ে হয়েছে তখনও, একেবারে আলুভাতের মতো লাগত। শরীরের খেলার নিয়ম একেবারেই বুঝত না অনিতা। পতিদেবতা চাইছে, তাকে দিতে হয়,—এরকম এক সনাতন বোধে সে বিছানার অন্ধকারে প্রথম থেকেই নিজের শরীরকে আক্ষরিক অর্থেই সমর্পণ করে বসত স্বামীর কাছে। কোনও ছলনা নেই, লাস্য নেই, প্রতিরোধ নেই। ফিরতি খেলা নেই। আশ্লেষের তীব্র অস্থিরতা নেই। যেন একটা মরা নদীর ঘোলা জলে নিজেকে ঢেলে দিত শৈবাল। কিন্তু তাতে কী হয়েছে? শরীরটাই কি সব? তার সংসারকে অনিতা ছবির মতো সাজিয়ে রেখেছে এটা তো ঠিক। যৌন-চাহিদার ব্যাপারে সে বেশ উদাসীন। কিন্তু শৈবালের অন্যান্য চাহিদার ব্যাপারে তো সে বেশ মনোযোগী! খুব ভাল রাঁধতে পারে অনিতা। শৈবালের একটু সুগার ধরা পড়েছে ইদানীং। শৈবালের খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে অনিতা যথেষ্ট যত্নবান। তাহলে? শৈবাল কেন সুধার সঙ্গে এরকম একটা মিথ্যে এবং শরীর-সর্বস্ব সম্পর্কে নিজেকে জড়াল? কতদিন এই অবৈধ সম্পর্ক টিকিয়ে রাখবে সে? যদি কোনওদিন ধরা পড়ে যায়? স্ত্রীর কাছে? ছেলের কাছে? সেদিন কী হবে? শৈবাল কীভাবে মুখ দেখাবে ওদের কাছে?

—নিন স্যার। সত্তর টাকা হয়েছে। —বিক্রেতা প্যাটিস-ভর্তি প্যাকেটটা কাউন্টারের

ওপার থেকে বাড়িয়ে ধরেছে। শৈবাল একশো টাকার নোট বাড়িয়ে দিল। বাকি টাকা ফেরত নিয়ে দোকান থেকে রাস্তায় নেমে সুধার ফ্ল্যাটের দিকে হাঁটতে হাঁটতে শৈবাল ভাবছিল, তমাল ভালবাসে গলদা চিংড়ি খেতে। আর অনিতা ভালবাসে রাবড়ি। মিথ্যের দাসত্ব করে, সুধার সঙ্গে রাত কাটিয়ে আগামিকাল অফিস সেরে বাড়ি ফেরার সময় সে মনে ক'রে গড়িয়াহাট মার্কেট থেকে কেজিখানেক গলদা-চিংড়ি এবং রাবড়ি নিয়ে ঢুকবে বাড়িতে।

সুধার ফ্ল্যাটের সামনে এসে ডোরবেল বাজাল শৈবাল। দরজা খুলল সুধা নয়। তার কাজের মহিলা। একে আগে দেখেনি। এখন চেহারা দেখে আন্দাজ করল কাজ করে মহিলা এ বাড়িতে। কিন্তু এসময় এর থাকার কথা নয়। বরাবর সুধার কাছে এসে শৈবাল দেখেছে সে একা। কিচেনে এটা করছে। সেটা করছে। একদিন শৈবাল জিজ্ঞেস করেছিল—কোনও মেড-সারভেন্ট নেই তোমার? যখনই আসি দেখি নিজে হাতে সব করছ? সুধা বলেছিল—ওমা! থাকবে না কেন? মেড-সারভেন্টরা যে এক একজন দক্ষ আঞ্চলিক রিপোর্টার এটা তো তুমি জানো? পরপুরুষ এসে আমার বাড়িতে রাত কাটাচ্ছে এটা রটে যাক আমি চাই না। তাহ'লে পাড়ায় থাকা যাবে?.... শৈবাল বুঝেছিল। নিজের গোপন জীবন গোপনই রাখতে চায় সুধা। তাতে অবশ্য তাকে দোষ দেওয়াও যায় না। এই পোড়া দেশে লিভিং-টুগেদার এখনও তেমন চালু হয়নি। হয়ত হয়ে যাবে। ধীরে ধীরে। ততদিন পর্যন্ত সুধার সতকর্তা থাক্ না।

কিন্তু আজ কি সুধার খেয়াল নেই? কাজের লোক এখনও এ বাড়িতে? মাঝবয়সী, কালো মহিলাটি বারবার তাকাচ্ছিল শৈবালের দিকে। শৈবাল সোজা ঢুকে গেল ঘরে। সুধা শুয়েছিল বিছানায়। তাকে দেখে উঠে বসল। ধড়ফড় করে নয়। বেশ ধীরে-সুস্থে। তার থমথমে ফোলা মুখের দিকে তাকিয়ে শৈবালের মনে হল সুধা দুপুরে চুটিয়ে ঘুম দিয়েছে।

—বৌদি আমি যাই? —কাজের মহিলা দরকার চৌকাঠের কাছে। ঘোমটা টেনে দিয়েছে। শৈবালকে দেখে।

—হ্যাঁ এসো। কাল সকাল আর আসতে হবে না। বিকেলের দিকে এসো। এঁটো বাসনগুলো মেজে যেও। খাবার জল এনে দিও। অবশ্য যদি দরজায় তালা দ্যাখো—

—ঠিক আছে বৌদি। বুঝেছি। মহিলা চলে গেল। সুধা আধশোয়া ভঙ্গিতে বিছানায়। শৈবালকে বলল—দরজাটা দিয়ে দাও না প্লীজ। শৈবালকে দরজা বন্ধ করে ফিরে এলে সেন্টার টেবিলে রাখা প্যাটিসের প্যাকেটটার দিকে তাকিয়ে সুধা জিজ্ঞেস করল—ওটা কী?

—চিকেন প্যাটিস। ইউ লাইক ইট।

—থ্যাঙ্কস। —সুধা বিছানা ছেড়ে নামল মেঝেতে। মেরুন-রং ম্যাকসি তার

পরনে। ম্যাকসি? না নাইটি? কে জানে শালা! ম্যাকসি আর নাইটির তফাত অত বোঝে না শৈবাল। সত্যিই বোঝে না। কারণ, অনিতা ওসব পরে না। সর্বক্ষণ শাড়ি। বাড়িতে খুঁট গুঁজে শাড়ি। বাইরে গেলে কোঁচা দিয়ে। বিয়ের পর পছন্দ করে রাত-পোশাক কিনে এনেছিল শৈবাল। (সেগুলো বোধহয় নাইটি?) দু-একদিন পরে অনিতা ওসব পরেনি। —দূর আমার শাড়িই ভাল। ওসব নাইটি-ফাইটিতে লজ্জা করে। বাড়িতে শ্বশুর-শাশুড়ি আছেন।..... হ্যাঁ তখন শৈবালের বাবা-মা বেঁচে ছিলেন। ক্রমশ শৈবালের মনও দমে গেছে। অনিতার ওপর নাইটি-প্যান্টি- এক্সপেরিমেন্ট সে কবে যেন ছেড়েই দিয়েছে।

শৈবাল বুঝছে নাইটির নীচে সুধার আর কোনও অন্তর্বাস নেই। উপরন্তু গলার কাছে নাইটি আলগা। ফলে জামবাটির মতো সুধার দুই স্তনের বিভাজিকা দৃশ্যমান।

—কোথায় চললে? শৈবাল জিজ্ঞেস করল।

—টয়লেটে। অনেকক্ষণ থেকে পেয়েছে.....।

—বিফোর দ্যাট....শৈবাল হঠাৎ সুধার কোমর জড়িয়ে ধরল। —সুইট হেলেন, মেক মি ইমমরটাল উইথ আ কিস! —চুমু খেল শৈবাল।

—উঁ কী হচ্ছে? ছাড়ো বলছি! —সুধার মুখে বাসি গন্ধ পেল শৈবাল। তাতে তার কামভাব আরও জেগে উঠল। শৈবালের আলতো আলিঙ্গন ছাড়িয়ে সুধা টয়লেটে ঢুকে গেল।

শৈবাল আরাম করে বসেছে সোফায়। স্বভাবে সুধা বেশ পিটপিটে সে জানে। তবে অনিতার মতো শুচিবাইগ্রস্ত নয়। সুধা বেশ ভাল গৃহিণী হতে পারত। যেটা তার মতো বহির্মুখী মেয়েরা সাধারণত হয় না। ঘরবাড়ি সে বেশ সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখে। সুধা যতক্ষণ টয়লেটে শৈবাল ঘরের চারদিকে দেখছিল তাকিয়ে। সোফার ঢাকা, কুশন সবই বেশ নতুন লাগছে। পরিচ্ছন্ন। যে বিছানায় শুয়েছিল সুধা, সেখানে নীল বেডশিট। শুয়ে থাকার দরুন একটু কুঁচকে আছে। এই ফ্ল্যাটে দুটো ঘর। এই ঘরটা বড়। আসল শোবার ঘর। অন্য ঘরটা অপেক্ষাকৃত ছোট। সেখানেও একটা সিঙ্গল খাট আছে। বুককেস আছে। তাতে অনেক বই আছে। ঘুরেফিরে দেখেছে শৈবাল। বইগুলোর সবই প্রায় ছোটদের বই। সুধার ছেলের সম্পত্তি। এই ঘরের বড় খাটের বিছানাটা আর একবার দেখল শৈবাল। এখন এখানে একটা বালিশ। সুধা একা শুয়েছিল বলে। আজ যেহেতু রাতে শৈবাল শোবে এখানে। আর তিনটে বালিশ নিয়ে আসবে সুধা। মাথার বালিশ দুটো। আর একটা পাশবালিশ। পাশবালিশটা দুজনের মাঝখানে রাখে সুধা। শৈবালের পাশবালিশ লাগে না। মাথার বালিশ দুটো লাগে। মাথার নীচে বালিশ একটু উঁচু না হ'লে তার জুত হয় না। কিন্তু পাশাপালিশ কেন? ঘর যখন অন্ধকার হয়ে যাবে, গভীর হবে রাত, শুরু হয়ে যাবে বিছানার খেলা; —তখন কী পাশবালিশের কোনও ঠিক থাকবে? শৈবাল জিজ্ঞেস করেছিল

একদিন—পাশবালিশ আনো কেন? দরকার আছে? সুধা হেসে উত্তর দিয়েছিল—ওটা একটা বাঁধ।

—বাঁধ না প্রাচীর?..... চিনের প্রাচীর।..... দুর্লঙ্ঘ্য।

—আজ্ঞে না, বালির বাঁধ। —হেসে বলেছিল সুধা।

এখনও টয়লেটে সুধা? না কি বেরিয়েছে? কিছু বুঝতে পারছে না শৈবাল। সে হাঁক দিল—সুধা! এই সুধা! প্রথমে উত্তর পেল না। খানিক বাদে উত্তর এল—আসা হচ্ছে, বসতে হবে। মনে হ'ল, বেশ রেগে আছে সুধা। কেন রেগে আছে কেন? শৈবালের আসতে দেরি হয়েছে বলে? কী আর করা যাবে। অফিস সামলে তো আসতে হবে। অনেক দায়িত্বপূর্ণ পদে তাকে কাজ করতে হয়। সুধা কি সেসব বোঝে না।

ঘরের দেয়ালে চোখ গেল শৈবালের। একটা মাত্র ক্যালেন্ডার। কী একটা হিজিবিজি ছবি। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। দেয়ালের আর একপাশে চকচকে কাঠের ফ্রেমে একটা ড্রয়িং। বেশ বড়। নতুন আমদানি। এটা তো এ ঘরে ছিল না? সুধা কিনেছে নিশ্চয়ই। কোনও আর্ট-এগজিবিশনে গিয়ে। এসব বাই তো আছেই সুধার। বেশ আঁতেল আঁতেল মনে করে সে নিজেকে। নতুন কবিতার বই কেনা। ইংরিজি ফিকশন (থ্রিলার নয়) কেনা। এখন আবার ছবি কেনাও শুরু হয়েছে। চলুক ভাই। চালাও পানসি বেলঘরিয়া।

ঘরে ঢুকল সুধা। নাইটি পালটে নিয়েছে। এটাকে কী বলা যায়? হাউসকোট। কোমরের কাছে ফাঁস। ঐ ফাঁসের কারণেই শৈবাল বুঝতে পারছে সুধার কোমর এখনও কী সরু! ক্ষীণ কটিতট.....! হাতে সুধা ধরে আছে ট্রে। তাতে দু-কাপ চা আর একটা বড় প্লেটে চিকেন প্যাটিস।

—শুরু করো। —সুধা বলল। —খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই। অফিস থেকে সোজা এখানে? না কি আবার বাড়িতে গেসলে অভিনয় করতে?

—অভিনয়টা ফোনেই সেরে নিলুম।

—মিথ্যে কথা বলতে তুমি ওস্তাদ। তাই না?

—বউয়ের কাছে মিথ্যে বলি। তোমার কাছে তো আর বলিনা।

—নাহ! বল না? তোমার পেটে খিদে আছে। এত বয়সেও বেশ চনমনে রেখেছ নিজেকে। আমি আর কদিন? পুরনো হয়ে যাব। তারপর আবার একটাকে ধরবে। তাকেও বলতে শুরু করবে আমাকে যেগুলো বলে এসেছ এতদিন। আমি কিছু বুঝি না ভাবছ?.....

সত্যিই বেশ বিক্ষুব্ধ মনে হচ্ছে সুধাকে। কেন? কিছুই বুঝতে পারছে না শৈবাল। সে প্রসঙ্গ পালটাতে চাইল।

—প্যাটিসগুলো বেশ ভালো তাই না?

—হুঁ। এত এনেছ কেন? কে খাবে এত? আমিও তো চিকেন করেছি। চিকেন আর পরোটা। মোড়ের দোকান থেকে আনিয়ে দেব পরোটা।

—কাকে দিয়ে আনাবে?

—তাও তো বটে। কাকে দিয়ে.....? আমি নিজেই যাব।

—ছেলের সঙ্গে কথা হয়েছে? কেমন আছে?

—হ্যাঁ। গতকাল রাতে মোবাইলে অনেকক্ষণ কথা বললুম। ভালই আছে। ওর তো সামনে পরীক্ষা। দু-সপ্তাহ বাদে। খুব পড়াশোনা করছে।

—তোমার ছেলে পড়াশোনায় খুব ভাল। শুনেও ভাল লাগে।

—হ্যাঁ। আর দশ-বারো বছর। তারপরই মুক্তি।

—মানে?

—ছেলে দাঁড়িয়ে গেলে আমি আর এখানে থাকব না।

—কোথায় থাকবে?

—স্টেটসে চলে যাব।

—স্টেটসে? হঠাৎ?

—তোমাকে বলেছি। স্টেটসে—নিউইয়র্কে আমার এক বন্ধু থাকে।..... মানে বান্ধবী। ওর নাম ঋতু।

—হ্যাঁ মনে পড়ছে বটে।

—হ্যাঁ। ওকে দেখতেও খুব ভাল। আমারই বয়সী। ভাগ্যও কিছুটা আমার মতোই

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। ওর হাজব্যান্ড ব্রিলিয়ান্ট কমপিউটার ইঞ্জিনিয়ার। বিয়ে করে ঋতুকে নিয়ে স্টেটসে চলে গিয়েছিল। সেটল করেছিল ওখানে। বছর তিন আগে ওরও হাজব্যান্ড মারা গেছে। হঠাৎই। হার্ট অ্যাটাক। ড্রিংক করত খুব বেশি। বেশ মোটাও ছিল

—বলেছিলে বটে একবার। —শৈবাল জানাল।

—ঋতুরও এক মেয়ে। আমার ছেলেরই বয়সী। হাজব্যান্ড মারা যাবার পর ও আর এদেশে ফেরেনি। ওখানেই সেটল করেছে। চাকরি করে। কী একটা অর্গানাইজেশনের সঙ্গে যুক্ত। যারা এডস্ রোগের বিরুদ্ধে ক্যামপেন করে। সারা পৃথিবী জুড়ে নাকি ওদের অর্গানাইজেশন। আর বিয়ে করেনি। লিভ্ টুগেদারও করে না। যখনই সময় পায় এডস রোগের বিরুদ্ধে প্রচার করে বেড়ায়। ঐ কাজটাতে খুব আনন্দ পায় ও। আমাকে প্রতিমাসে নিয়ম করে অন্তত একটা চিঠি লেখে। আমিও চিঠির উত্তর দিই। ঋতু আমাকে বলেছে স্টেটসে ওর কাছে চলে আসতে। ওদের ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনে নাকি ডিভোটেড কাজের লোক খুব দরকার। আমারও যাবার খুব ইচ্ছে হয়। তোমার সঙ্গে যে এত পাপ করছি তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না? এডস্ রুগীদের সেবা করে প্রায়শ্চিত্ত করব।

—পাপ?..... প্রায়শ্চিত্ত..... এসব শব্দকে তুমি গুরুত্ব দাও?

—কে জানে? দি হয়ত। বাইরে হয়ত আমি আধুনিক। ভেতরটা এখনও কোনও এক গাঁয়ের বধূ হয়ে আছে। প্রতিদিন কত পাপ করছি। ছেলেকে লুকিয়ে এই যে দিনের পর দিন একজন পরপুরুষের সঙ্গে শুয়ে পড়ছি এটা নিশ্চয়ই ভাল কাজ নয়। ঠিকমতো দেখতে গেলে—আই অ্যাম আ হোর! সুপার্ব হোর! তাই না? মাঝে মাঝে মনে হয় ভেতরটা পচে যাচ্ছে। দুর্গন্ধ বের হচ্ছে নিজের ভেতর থেকে।..... অনেকদিন আগে একটা লেখা পড়েছিলুম। লেখকের নাম ভুলে গেছি। বিষয় ভুলে গেছি। শুধু লেখাটার নাম মনে আছে। শুনবে নামটা?

—বলো.....

—সেজানের আপেল পচে যাচ্ছে.....

—সেজান কে?

খিলখিল হাসে সুধা। সত্যিই খিলখিল হাসি। থামতেই চায় না যেন তার হাসি। হাসতে হাসতে সে বলে—বাববা! তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না। ব্যাঙ্কের ব্যালান্স শিট.....ক্রেডিট রেসিও এসব ছাড়া কিছু জানো না।

—আমি তোমার মতো তো আর ইনটেলেকচুয়াল নই। নেহাতই গেরস্থ মানুষ।

—তোমার মনে কোনও খিদে নেই? কত কী জানার আছে। পড়ার আছে।

—শরীরের খিদে ছাড়া আমার আর কোনও খিদে নেই সুধা।

—সে তো জানি। —সুধা প্যাটিসে কামড় দেয়। সেই মুহূর্তে তার আংশিক জিভ আর দাঁত ঝিলিক মারে শৈবালের চোখে। নাইটির নীচে অন্তর্বাস নেই বলে তার ভারী দুই স্তন অধোমুখী। নিজের শরীরে একটা শিরশিরানি অনুভব করে শৈবাল। চা খাওয়া তো হল। এবার সুধাকে একটু আদর করতে চায় সে। এ বাড়িতে আসার পর প্রতি মুহূর্ত উপভোগ করার জন্যেই তো এসেছে সে। নীতিকথা শুনতে আসেনি। শৈবালের চা শেষ। সুধারও। প্যাটিসের টুকরো পড়ে আছে প্লেটে। একটা সিগারেট ধরাতে হবে। তারপর সুধাকে করতে হবে আলিঙ্গন। তাকে ধীরে ধীরে শুইয়ে দিতে হবে বিছানায়। আজ নীচের দিক থেকে সুধার শরীরে ঠোঁট ছোঁয়াতে শুরু করবে শৈবাল। পায়ের গোছ থেকে সুধার নাইটি মঞ্চে যেভাবে পর্দা উঠে যায় সেভাবে উঠে যাবে শৈবালের হাতের আলতো টানে। উন্মোচিত হবে সুধার অপরূপ দুই পা।..... আহ লেগস্! ফাইন লেগস্! বিদেশিনীর পায়ের মতো সুধার পায়ের গড়ন। যেখানে খিলান ও গম্বুজের প্রাচীন রেখা! সিগারেট শেষ হওয়ার পরই তো শৈবাল শুরু করবে। একচোট সেক্স.....।

—দাঁড়াও আসছি। —ট্রে, প্লেট আর চায়ের কাপগুলো সিঙ্কে রেখে আসি। —সুধা উঠে দাঁড়াল। শরীরে ঢেউ তুলে। ফিরে এসে বিপরীত দিকের সোফায় বসে বলল—দাও তোমার একটা সিগারেট। স্মোক করতে ইচ্ছে হচ্ছে।

—টেক ইট।

শৈবালের লাইটারে সিগারেট ধরাল সুধা। সুমিষ্ট বাজনা লাইটারে। সুধা সিগারেট টানছে। নাক দিয়ে ধোঁয়া। মুখ দিয়েও। সুধা রেগুলার স্মোকার নয়। মাঝে সাজে তার খেয়াল হয়।

—আসলে আজ ভোরে একটা স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল। খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম। মাথার ওপর ফ্যান বোঁ বোঁ করে ঘুরছিল। খুব একটা হিউমিডিটি ছিল না ওয়েদারে। তবুও জেগে উঠে দেখলুম ঘামে ভিজে গেছে শরীর। সেই যে মেজাজটা খিঁচড়ে গেল আর ভাল লাগছিল না কিছু। তোমাকে সাত-তাড়াতাড়ি ফোন করলুম। আসতে বললুম এখানে।

—কী ধরনের স্বপ্ন?

—অদ্ভুত স্বপ্ন।..... ভোরের স্বপ্ন সত্যি হয় কি?

—বলতে পারব না। অনেক সময় গ্যাস-ট্যাস হলে মানুষ ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন-টপ্ন দেখে। কাল রাতে কী খেয়েছিলে?

—কী আর খাব।..... ভাত, ডাল, পনিরের তরকারি। প্লেন ভেজিটেরিয়ান ডিশ। এতে আবার গ্যাস হবে কেন?

—কী ধরনের স্বপ্ন? —প্রশ্নটা রিপিট করল শৈবাল।

—বলছি।..... পুরোটা ঠিক মনেও নেই। কীরকম ভেগ.....। তবুও ট্রাই করছি।

শৈবালের সিগারেট শেষ। টিপস্ অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিল। সুধাও তার সিগারেট ঘন ঘন দুবার টেনে গুঁজে দিল অ্যাশট্রেতে। তার সিগারেট সবটা পোড়ে নি। অর্ধেকটা পুড়েছে।

— .....একটা করিডর বুঝলে?..... লম্বা আর নির্জন একটা করিডর। ঠিক একটা লং টানেলের মতো। সেই করিডর ধরে আমি ছুটছি। সেটা কি একটা হোটেলের করিডর? কারণ, যেখান দিয়ে আমি ছুটছি তার বোথ সাইডে একের পর এক দরজা। সেই দরজাতে নম্বর লেখা আছে। ২০১.....২০২.....২০৩.....এরকম। হোটেলেই তো এরকম থাকে। তাই না? কিন্তু প্রত্যেকটা দরজা বন্ধ।

—স্বপ্নের মধ্যে কেন ছুটছিলে তুমি?

—সেটাই তো বুঝতে পারছিলুম না। কিন্তু আমি ছুটছিলুম। বোধহয় কেউ তাড়া করেছিল আমাকে। কে? বলতে পারব না।

—গো অন প্লিজ.....।

—ছুটছি ছুটছি। হঠাৎ সামনে দেখলুম একটা কফিন....।

—কফিন?

—কফিনও হতে পারে কিংবা ঢাউস সুটকেসও হতে পারে।

—করিডরে আলো ছিল?

—আলো?..... হ্যাঁ ছিল। তবে খুব ব্রাইট নয়। কীরকম চাপা আলো। ডিম লাইট অন্ করা থাকলে যেরকম মনে হয়।

—ঐ কফিন কিংবা সুটকেসে তুমি কী পেলে? সোনার গয়না?

—ইয়ার্কি মেরো না।..... ইফ ইউ আর নট ইনটারেসটেড বলব না।

—আচ্ছা বাবা ভুল করে ফেলেছি। যে বস্তুটা সামনে পড়েছিল সেটা তুমি খুললে তো?

—ওটা ওপেন করার কোনও প্রশ্নই নেই। কারণ ভাল করে তাকিয়ে দেখলুম বন্ধ সুটকেশের ডালার ফাঁক দিয়ে কয়েকটা আঙুল বেরিয়ে আছে.....।

—আঙুল? ফিংগারস?

—ইয়েস ফিংগারস। আর সেই আঙুলগুলো বেয়ে গড়িয়ে নামছে রক্ত!

—তারপর?

—আমি তাকিয়ে ছিলুম। খুব ভয় পেয়েছিলুম। তারপর শুনলুম এক চিৎকার!

—চিৎকার?

—হ্যাঁ চিৎকার। কে চিৎকার করছিল জানো?

—কে?

—আমার ছেলে।..... মামণী আমার ভীষণ লাগছে.....মামনি আমাকে বাঁচাও! সে বলছিল। ডাকছিল আমাকে। তখনই ঘুমটা ভেঙে গেল আমার।

—দূর ওসব হ্যালুসিনেশন। আসলে তুমি ছেলের কথা দিনরাত ভাবো। তাই.....

—খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম। বুঝলে? —সুধা দুই হাতে মুখ চাপা দিয়ে বসে আছে। কাঁদছিল। —তাই মনে হ'ল তোমাকে ডাকি। তুমি ছাড়া আমার পাশে তো কেউ নেই।

শৈবাল উঠে গেল সুধার দিকে। এখন তারা দুজনে ঘনিষ্ঠভাবে বসে আছে। সুধার মুখ দুই হাতের চেটোর মধ্যে নিয়ে শৈবাল তাকে চুমু খেল। কান্নাভেজা স্বরে সুধা ফিসফিস করল—কোনওদিন আমাকে একা ফেলে চলে যাবে না তো? আমার বড় ভয় করে। —সুধার চোখদুটোর দিকে তাকাল শৈবাল। অনন্ত কুয়োর জলের গভীরতা সেই চোখে। তার চোখের জল হাতের স্পর্শে মুছে দিয়ে শৈবাল বলল—অত ভয় পাও কেন? দিনরাত অত দুশ্চিন্তার মধ্যে থাকবে না। টেক লাইফ ক্যাজুয়ালি। আমি তো আছি। অফিস থেকে ছুটি নিয়ে নাহয় ছেলের কাছে কদিন ঘুরে এসো। দার্জিলিং-এ কোনও হোটেলে থাকবে। স্কুলের হোস্টেলে গিয়ে ছেলের সঙ্গে দেখা করে আসবে যখনই ওরা অ্যালাও করবে। টাকা লাগবে? গাড়িভাড়া আর হোটেলভাড়ার খরচ আমি যোগাব।

—কতদিন এসব করবে? যতদিন আমার এই শরীরটা আছে।

—ছিঃ ওরকম বলে না। —সুধার নাইটি টেনে নামিয়ে দিয়েছে শৈবাল। বাদামি

আঙুরের মতো থোকা-থোকা দুই স্তনবৃন্তে আলতো ঠোঁট ছোঁয়াচ্ছে। সুধার ত্বকে ফুটে উঠেছে শিহরনের কাঁটা! বিছানায় সম্পূর্ণ নগ্ন সুধা চিত হ'য়ে শুয়ে মহার্ঘ্য নগরীর তোরণদ্বার প্রকাশ্য করে শৈবালকে নিজের দিকে প্রবলভাবে টেনে নিয়ে আবার বলল—আমি বুঝি। যতদিন আমার এই শরীরটা আছে ততদিনই তোমার এই মুরগি পোষা।

—ছিঃ সুধা, ওরকম বলে না। —শৈবাল আবার বলল। —শুধুই শরীর? ভালবাসা কি একটুও নেই?

—ভালবাসা আছে? তাহ'লে সেই ভালবাসা দেখাও?

—কীভাবে দেখাতে হবে?

—পারবে তোমার সংসার ছেড়ে আমাকে নিয়ে নতুন সংসার পাততে?

—নতুন সংসার? সেটা কি সম্ভব?

—কেন সম্ভব নয়? তোমার বউ আর ছেলের ভরণপোষণ করবে। আর আমাকে নিয়ে থাকবে। স্বামী-স্ত্রীর মতন।

—তোমার ছেলে বড় হচ্ছে। এই সম্পর্ক মেনে নেবে না।

—ওটা তো অনেক পরের ব্যাপার। তোমার অজুহাত। আসলে তুমি পারবে না আমাদের সম্পর্ককে প্রকাশ্য করতে। আমার কোনও ভূমিকাই নেই তোমার জীবনে। শুধু যখন শরীরের খিদে জাগে তখনই আমাকে দরকার হয়। সুধা ইনিয়ে বিনিয়ে এরকম কথা বলেই যাবে। শৈবাল জানে। যখনই তার মন খারাপ হয়, হয়ত নিজের প্রতি ঘেন্না হয়; তখনই সে এসব অশান্তি শুরু করে। কিন্তু ওসব কথায় কান দিলে চলবে না। হ্যাঁ ঠিকই তো। প্রবল উত্তেজনার মধ্যেও শৈবালের মনে কথাগুলো দগদগ করে। সুধার শরীরের লোভেই সে সুধাকে তার অফিস থেকে সাহায্য করেছিল। এই ফ্ল্যাট কেনায় সাহায্য করেছে। এছাড়া মাঝে মাঝে টাকাপয়সাও দেয়। কেন দেয়? নিজের শরীরের খিদে মেটাবার জন্যেই তো। অনিতা যদি তার শারীরিক তৃপ্তির দিকে কিছুটা নজর দিত, তাহলে শৈবাল হয়ত এই অবৈধ উপায় অবলম্বন করত না। কিন্তু অনিতা তা পারেনি। সে এক অদ্ভুত মেয়েমানুষ। অস্বাভাবিক—শৈবালের মনে হয়েছে। আপাদমস্তক শুচিবাইগ্রস্ত। নেহাত ঝামেলায় যাবার সাহস শৈবালের নেই। তাই সে অনিতাকে নিয়ে ফালতু একটা সংসারজীবন চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ভালবাসা তার নেই। অনিতার প্রতি আছে দায়িত্ববোধ। আর সুধার শরীরের জন্যে হ্যাংলামি। ভালবাসা আবার কী? নিজেকে ছাড়া কাউকে ভালবাসা যায় নাকি?

সেদিন তুমুলভাবে সুধাকে জাগাল শৈবাল। এটা সে পারে। যৌনসম্পর্কে নারীকে ঠিকঠাক জাগিয়ে তোলাই হল পুরুষের আসল কাজ। শৈবাল অভিজ্ঞতা দিয়ে জেনেছে। নারী ঠিকঠাক জাগলেই শৈবালের তৃপ্তি। অদ্ভুত তৃপ্তি হল সংগমে সেদিন

দীর্ঘ সময় নানা প্রক্রিয়ায় খেলা করল তারা। তারপর মিলিত হল। রাতের ডিনার সারার পর বিছানায় আরও একবার। আশ্লেষের ঝোঁকে সুধা উন্মত্ত আচরণ করছিল। তার জের পরের দিন সকাল অব্দি চলল। শৈবালকে অফিস যেতে দিল না সুধা। কিছুতেই না। বেলা করে ঘুম থেকে উঠে শৈবালেরও মনে হ'ল, একদিন ক্যাজুয়াল লিভ নিলে কী ক্ষতি। দুপুরে বাড়িতে রান্নার ঝামেলা করল না সুধা। দুজনে চলে গেল পার্ক-স্ট্রিটের এক অভিজাত হোটেলে। সেখানে লাঞ্চ সারল। একটা জুয়েলার্সের দোকান থেকে আমেরিকান হিরের গয়নার সেট কিনল সুধা। শৈবালই আসলে কিনে দিল। তারপর একটা ফিল্ম দেখল। ট্যাক্সিতে সুধাকে তার ফ্ল্যাটের সামনে নামিয়ে দেওয়ার সময় সুধা জানাল সে দার্জিলিঙে ছেলের কাছে যেতে চায়। শৈবাল তাকে পরের দিন তার অফিসে আসতে বলল। পাঁচ হাজার টাকার একটা বান্ডিল সে রেডি রাখবে সুধার জন্যে।

যখন বাড়ি ফিরল শৈবাল তখন সন্ধে নেমে গেছে। তাকে দেখে অনিতা ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কিচেনে ঢুকল পরোটা ভাজতে। চানঘর থেকে ফ্রেশ হয়ে বেরিয়েছে শৈবাল। ধোপদুরস্ত পাজামা আর পাঞ্জাবিতে বেশ ভাল লাগছিল। সে ডাইনিং টেবিলে এসে বসল। অনিতা খাবারের থালা রাখল শৈবালের সামনে।

—হ্যাঁগো তোমাকে যে কথায় কথায় বাইরে যেতে হচ্ছে, প্লেন জার্নি করতে হচ্ছে তোমার ক্লান্তি লাগে না? এখন তো বয়স হচ্ছে। এত খাটাখাটুনি পোষাবে?

—কী করা যাবে? উঁচু পদে দায়িত্ব বেশি তো হবেই।

—তোমাকে নিয়ে আমার খুব চিন্তা হয়। অফিসের জন্যে একেবারে প্রাণপাত করছ। এবার কিছুদিন ছুটি নাও।

—ছুটি নিয়ে কী করব? —পরোটার টুকরো আলুভাজাসহ হাঁ-এর মধ্যে চালান করে দিয়ে শৈবাল জিজ্ঞেস করে।

—চল না তিনজনে কোথাও বেড়িয়ে আসি? কতদিন কোথাও যাওয়া হয়নি।

—কোথায় যেতে চাও?

—দেওঘর যাবে? গুরুদেবের আশ্রমে? —অনিতার চোখ চকচক করে উঠল।

—দেওঘর? সেটা কি একটা ঘোরার জায়গা?

—ওরকম বলতে নেই। ওখানে গুরুদেবের আশ্রম না? সেখানে কদিন থাকব। গুরুদেবের আশীর্বাদ নিয়ে আসব। তোমার চাকরিতে আরও উন্নতি হবে। তমুর চাকরি হবে।

—তমু কোথায়? এখনও বাড়ি ফেরেনি?

—দুপুরের দিকে বেরিয়েছে। আজকাল কোথায় যে যায়। ওর একটা চাকরি দরকার। তোমাদের ব্যাঙ্কে কিছু হয় না?

—হাত ধরে চেয়ারে বসিয়ে দেওয়ার যুগ শেষ। তাহলেই ইউনিয়ন চেপে ধরবে।

স্বজনপোষণের অভিযোগ আনবে। ওকে রিক্রুটমেন্ট টেস্টে বসতেই হবে। কিছু নম্বরও পেতে হবে। তমু পড়াশোনা করছে?

—করছে নিশ্চয়ই। —অনিতা মিনমিন করে বলল।

—তুমি তো আবার ওসবের খোঁজই রাখো না।..... গম্ভীরমুখে বলল শৈবাল। —দেখি আজ ছেলেটা বাড়ি ফিরলে জিজ্ঞেস করব কী পড়াশোনা করছে.....।

—তুমি খাও। আমি তোমার চা করে আনি। —অনিতা কিচেনে ঢুকল।

১৫

একদিন বিকেলে, বাড়ি থেকে বেরিয়ে তমালের মনে হ'ল, গত দুদিন ইন্দ্রানীদের কোনও খোঁজখবর নেওয়া হয়নি। একবার টেলিফোন করা যেতে পারে। ওদের টেলিফোন নম্বর মুখস্থ হয়ে গেছে তমালের। সে রাস্তার ধারে একটা বুথ থেকে ফোন করতে গেল। বুথে ঢুকে তমাল দেখল ফোন করার জন্যে নির্দিষ্ট দুটো ছোট ঘরের দরজা বন্ধ। দুটো ফোনই এখন ব্যবহার করা হচ্ছে। দুটো দরজার উপরের অংশ কাচের। ভেতরের লোককে দেখা যায়। তমাল দেখল ডানদিকের ঘরে একজন মেয়ে ফোন করতে ব্যস্ত। আর বাঁ-দিকের ঘরে একজন বয়স্ক লোক। বুথের মালিক কিংবা পরিচালক যে সুদর্শন যুবক বসে আছে সে তমালকে বলল—ফোন করবেন? একটু ওয়েট করুন। এখনই ফাঁকা হয়ে যাবে। ছোট এই গুমটিতে দুজন মানুষ বসতে পারে এরকম সরু গদিরও ব্যবস্থা আছে। আর কেউ সেখানে অপেক্ষা করছে না। তমাল বসল। দোকানের যুবকটি একটা খাতা খুলে কীসব হিসেব করতে ব্যস্ত তমাল বসে আছে। বাইরে থেকে মেয়েটি এবং বয়স্ক লোক (যারা দুদিকে ফোন করছিল) দুজনকেই দেখতে পাচ্ছিল তমাল। সে তাদের কারোরই কথা শুনতে পাচ্ছে না। কিন্তু কথা বলার সময় তাদের মুখভাব দেখতে পাচ্ছে। আশ্চর্য লাগল তমালের। দুপাশে দুজনের মুখের ভাব দু-রকম। মেয়েটি ও-প্রান্তে যার সঙ্গে কথা বলছে সে তার বান্ধবী হতে পারে। আবার প্রেমিকও হতে পারে। কথা বলতে বলতে খুব হাসছে মেয়েটি। আর অন্যদিকে পাশের গুমটিতে যে লোকটি ফোন করছে তার মুখের ভাবে ফুটে উঠেছে এক বিষণ্ণতা। তমালের মনে হ'ল, লোকটি কোনও দুঃসংবাদ শুনছে এই মুহূর্তে। উদ্বেগ, বিষাদ, শোক একসঙ্গে যেন ফুটে উঠেছে ওর মুখের ভাবে। তমালের হঠাৎ মনে হ'ল, জীবনের দুটো দিক যেন সে এখন দেখতে পাচ্ছে। একদিকে হর্ষ, উচ্ছ্বাস, আনন্দ। আর একদিকে হতাশা, বিষাদ, শোক এটাই বোধহয় জীবন। তমালের মনে হ'ল। আগে কখনও এরকম মনে হয়নি আজ এখনই এরকম মনে হ'ল। তমাল ভাবল, জীবন কি এরকমই? যে মুহূর্তে

কোনও মানুষের জীবন ভরে যায় আনন্দে। সেই মুহূর্তেই কারোর জীবনে নেমে আসে শোক।

বাঁ-দিকের গুমটি থেকে বেরিয়ে এল লোকটি। তার মুখ থমথমে। হয়ত সত্যিই নিদারুণ দুঃসংবাদ জেনেছে। দোকানের যুবক তমালের দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারা করল। তমাল ঢুকে গেল গুমটির ভেতর। ইন্দ্রানীর টেলিফোন নম্বর ডায়াল করল সে। রিং হচ্ছে। স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে তমাল। কেউ ধরছে না কেন? ইন্দ্রানী কি বাড়িতে নেই? এই তো এবার উত্তর পাওয়া গেল।

—হ্যালো? —ইন্দ্রানীর স্বর নয়। কাজের মেয়ে সুমি।

—মাসিমা আছেন? —জিজ্ঞেস করল তমাল।

—কে বলছেন?

—আমার নাম তমাল।

—ধরুন। —অপেক্ষা করছে তমাল। ইন্দ্রানী কি ব্যস্ত?

—কে তমাল বলছ? —সেই অতি পরিচিত, স্নেহময়ী স্বর ইন্দ্রানীর।

—হ্যাঁ মাসিমা। ভাল আছেন আপনি?

—ভালই আছি।

—আর খুকু?

—তোমার কথাই ভাবছিলুম তমাল। ঠিক যখনই ভাবছি কয়েকদিন তোমার কোনও খোঁজ নেই, ফোন করি একটা, ঠিক তখনই তোমার ফোন এল।

—হ্যাঁ কাকিমা। আমারও মনে হ'ল আপনাদের খোঁজ খবর করি একটু।

—তুমি কোথা থেকে কথা বলছ? বাড়ি থেকে?

—না মাসিমা। পাড়ারই একটা পাবলিক বুথ থেকে।

—একবার আসতে পারবে?

—এখন?

—খুকুর শরীরটা ভাল নেই বাবা।

—কেন? কী হয়েছে ওর?

—এমনি তো ভালই আছে। জ্বর-টর যে হয়েছে তাও নয়। কিন্তু.....

—কিন্তু কী মাসিমা?

—খুকু কিছু খেতে চাইছে না।

—ডাক্তার দেখিয়েছেন?

ওপ্রান্ত থেকে তখনই উত্তর এল না। যেন কী বলবেন ভাবলেন ইন্দ্রানী। তারপর বললেন—তুমি একটু আসতে পারবে আমাদের বাড়ি?

—এখন? —রিস্টওয়াচ দেখল তমাল। বিকেল পৌনে পাঁচটা বাজে। এখন যদি ইন্দ্রানীর বাড়ি যায়। কিছুক্ষণও যদি বসে সেখানে তাহলে রাত আটটা সাড়ে-আটটার

আগে ফিরতে পারবে না।

—চলে এসো না একবার? খুব অসুবিধে হবে?

—নাহ মাসিমা। অসুবিধে হবে কেন? আমি আসছি।

—সাবধানে এসো বাবা।

রিসিভার নামিয়ে রেখে তমালের মনে হ'ল, বাড়িতে মাকে একবার জানিয়ে দেওয়া দরকার যে তার ফিরতে একটু দেরি হবে। আজকাল সন্ধে সাতটার পরও সে বাড়ি না ফিরলে মা বেশ চিন্তা করে। তাকে কোনওদিন বকাবকি করে না মা। শুধু বলে—এত রাত পর্যন্ত কোথায় ঘুরিস বাবা? একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে পারিস না? আমার যে বড় চিন্তা হয়।..... এটা ঠিক যে তমাল মাঝে মাঝে রাত করে বাড়ি ফেরে। অনেক সময় নির্দিষ্ট কোথাও যাবার থাকে না। তার কোনও বন্ধুও নেই। সে একা একা রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। প্রতিদিন যে শুধু রাস্তায় ঘুরে ঘুরে মরে তাও নয়। মাঝে মাঝে পাড়ার লাইব্রেরিতে যায়। তার বয়সী ছেলেমেয়েরা আজকাল কি পাবলিক লাইব্রেরীতে যায়? খুব বেশি যায় না বোধহয়। কিন্তু তমাল যায়। লাইব্রেরিতে গিয়ে সে দেখে লম্বা টেবিলের দুপাশে বয়স্ক মানুষেরা বসে নানা খবরের কাগজ পড়ছে। তমালও বসে পড়ে একটা চেয়ারে। কাগজ কিংবা পত্র-পত্রিকা দেখে। 'এমপ্লয়মেন্ট নিউজ' সামনে পেলে পাতা ওলটায়। নানারকম চাকরির খবর থাকে সেখানে। এই যে তমাল এখন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের একটা পরীক্ষাতে বসার জন্যে তৈরি হচ্ছে, সেই চাকরির বিজ্ঞাপনটাও সে প্রথম দেখেছিল 'এমপ্লয়মেন্ট নিউজ'-এ। তারপর অবশ্য সংবাদপত্রেও দেখেছিল। লাইব্রেরির কাউন্টারে বই দেওয়া-নেওয়ার জন্যে খুব একটা ভিড় থাকে না। তবুও কেউ কেউ তো বই নেয়। বই ফেরত দেয়। বয়স্ক পুরুষ ও মহিলারা যেমন কাউন্টারে আসেন। তেমনই তার বয়সী ছেলে-মেয়েকেও সে বই পাল্টাতে দেখেছে। তমাল নিজেও মাঝে মাঝে বই নেয় লাইব্রেরি থেকে। তবে সে খুব একটা পড়ুয়া নয়। সুহাসের ডায়েরিতে সে কয়েকটা বই-এর নাম পেয়েছিল। সুহাস খুব পড়ুয়া ছেলে ছিল। সে কবিতা লিখত। যারা কবিতা লেখে তারা নিশ্চয়ই খুব পড়াশোনা করে। সুহাসের ডায়েরিতে সে একটা বই-এর নাম পেয়েছিল। 'সঙ্গ নিঃসঙ্গতা ও রবীন্দ্রনাথ'। লেখক বুদ্ধদেব বসু। বইয়ের নামটা বেশ লেগেছিল তমালের। সে এই লাইব্রেরিতে এসে ক্যাটালগ খুঁজে পেয়েছিল ওটা। স্লিপে বইটার নাম আর নম্বর লিখে সে কাউন্টারে দিয়েছিল। বেশি দেরি হয়নি। খানিক বাদেই বইটা এসেছিল তমালের হাতে। বাঁধানো বই। কিন্তু অনেক দিনের বই হলে পাতাগুলো যেমন হলুদ হয়ে যায় সেরকম নয়। বেশ চকচকে আছে পাতাগুলো। বইয়ের সামনের দিকে লাইব্রেরি কাগজ সাঁটা থাকে। সেটা দেখলে বোঝা যায় কতবার ইস্যু হয়েছে বইটা। তমাল দেখেছিল খুব বেশিবার নেওয়া হয়নি বইটা। শেষ নেওয়া হয়েছিল, দু-বছর আগে।

বইটা পড়তে ভালোই লেগেছিল তমালের। সে মনে মনে সুহাসকে ধন্যবাদ জানিয়েছিল। সুহাসের জন্যেই সে আসলে একটা ভাল বই পড়তে পেরেছিল। সুহাস পৃথিবীতে নেই। সে যখন বেঁচে ছিল তখন তার সঙ্গে তমালের আলাপ ছিল না। কিন্তু মৃত সুহাস তমালের কীরকম বন্ধু হয়ে গেছে। গভীর রাতে বাড়ির ছাদে কিংবা অন্য কোনও নির্জন জায়গায় সুহাসের সঙ্গে তমালের মাঝে মাঝে দেখা হয়। তমালের মনে হয়, সুহাস যেন তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। একটুও ভয় পায় না তমাল। সে নিজের মনে সুহাসের সঙ্গে কথা বলে যায়। উত্তরও পায়। নির্জনে তমালের অনুভব হয় সুহাস তার সঙ্গে কথা বলছে। যেমন একদিন সে সুহাসকে জিজ্ঞেস করেছিল—সাময়িক উত্তেজনার বশে তুমি কেন নিজেকে পুড়িয়ে দিলে সুহাস? এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে, তোমার মাকে ছেড়ে, বোনকে ছেড়ে তুমি একা একা মরতে পারলে? কেন ওরকম ভুল করে ফেললে সুহাস? তমালের এই প্রশ্নের কোনও উত্তর দেয়নি সুহাস। তমাল দেখেছিল সুহাস চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখে বিষাদ। চোখ থেকে গড়িয়ে নামছিল কি অশ্রু? তমাল ঠিক বুঝতে পারেনি।

বুথ থেকে একটা নয়। পরপর দুটো ফোন করল তমাল। এবারের ফোনটা বাড়িতে করল। মাকে। বেশ কিছুক্ষণ রিং হয়ে যাওয়ার পর ফোন ধরল অনিতা। হয়ত একতলাতে ছিল। ফোন বাজছে শুনে দোতলাতে ছুটে উঠে আসতে হয়েছে অনিতাকে। তাই সে হাঁফাচ্ছিল।

—হ্যালো? —ওপ্রান্ত থেকে জিজ্ঞেস করল অনিতা।

—মা আমি।

—কে তমু? কী রে?

—আমার বাড়ি ফিরতে একটু দেরি হতে পারে।

—কেন রে? কোথায় যাবি?

—ইন্দ্রানী কাকিমার বাড়ি যাব মা।

—ইন্দ্রানী.....কাকিমা.....?.....ও সেই ভদ্রমহিলা যাদের বাড়ি একজন মেয়ে আছে প্রতিবন্ধী?

—হ্যাঁ মা।

—ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলি না তো?

—দেব মা। একদিন নিয়ে আসব আমাদের বাড়িতে।

—আনিস। তা ওদের বাড়ি হঠাৎ যাবি কেন রে?

—ওঁর মেয়ে খুকুর নাকি শরীর খারাপ। তাই একবার দেখতে যাব।

—আহারে। একে কথা বলতে পারে না। হাঁটতে চলতে পারে না। তার ওপর আবার শরীর খারাপ?..... আচ্ছা যা। ঘুরে আয়। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার চেষ্টা করবি বাবা.....। আজ রাতে তুই আর আমি শুধু দুজনে বাড়িতে থাকব। তোর

বাবা ফিরবেন না।

—কেন? বাবা অফিস থেকে বাড়ি ফিরবে না?

—না।

—কোথায় যাবে?

—দিল্লিতে যেতে হবে সন্ধের ফ্লাইটে। কী নাকি অফিসের জরুরি কাজ পড়েছে। সেই কাল সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরবে।

—বাবার মাঝে মাঝেই তো বাইরে কাজ পড়ছে আজকাল।

—কী আর করা যাবে। কাজ থাকলে.....

—ঠিক আছে মা। তুমি চিন্তা কোরো না। আমি তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার চেষ্টা করছি।

—হ্যাঁ বাবা। সাবধানে যাস।

দুটো ফোন-কলের জন্যে সাড়ে সাত টাকা পেমেন্ট করল তমাল। কির কির কির কির শব্দে বিলিং-মেশিন থেকে বিল বেরিয়ে এল। তাতে সাড়ে সাত টাকা চার্জ লেখা ছিল। রাস্তায় নামল তমাল। এই সময় একটা সরকারি বাস আছে যেটা ধরলে তাড়াতাড়ি সুহাসদের বাড়ি পৌঁছনো যাবে। কপাল ভালো তমালের। লাল-সবুজ সেই বাসটা সে পেয়ে গেল। বাসে তেমন ভিড় ছিল না। বসার জায়গাও মিলল।

ইন্দ্রানী যেন তমালের অপেক্ষাতেই ছিলেন। ডোর-বেল বাজতেই দরজা খুলে দিলেন নিজেই। ম্লান হেসে বললেন—এসো তমাল। আজ সারা দুপুর ভেবেছি তুমি যদি একবার আসো আমি যেন মনে জোর পাই। খুকুর যে কদিন কী হয়েছে...।

—কী হয়েছে খুকুর? —জিজ্ঞেস করল তমাল।

—কী হয়েছে সেটাই তো বুঝতে পারছি না। এমনিতে শরীরের সিস্টেম যে খারাপ চলছে তা নয়। টেমপারেচারও নেই যে ভাবব জ্বর হয়েছে। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে উঠতে বলছিলেন ইন্দ্রানী। তমাল তার পেছনে চলেছে। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে বারান্দা। প্রথম ঘরটাতে ঢুকলেন ইন্দ্রানী। তমালও।

—বোসো তমাল। —সোফার দিকে ইঙ্গিত করলেন ইন্দ্রানী। তমাল বসল। ইন্দ্রানী বসলেন না। দাঁড়িয়ে আছেন। ঘি-রং একটা শাড়ি পরনে। জরির পাড়। স্লিভলেস সাদা ব্লাউজ। তমালের মনে হ'ল, কীরকম যেন শুকনো লাগছে ইন্দ্রানীকে। চোখের কোণে ঈষৎ কালি। চোখের দৃষ্টিতে বিষাদ। হয়ত তিনি দুশ্চিন্তায় আছেন। খুকুর শরীর খারাপ তাই দুশ্চিন্তা।

—বসুন মাসিমা। খুকু কি ঘুমোচ্ছে?

—হ্যাঁ। ঘুমোচ্ছে একটু। কীরকম শীর্ণ দেখাচ্ছে ওকে আজকাল। আর কিছু খেতে চাইছে না। মুশকিলটা সেখানেই। প্রায় কিছুই খেতে চাইছে না।

—কিছুই খেতে চাইছে না?

—কিছুই খেতে চাইছে না। খাবার মুখের কাছে নিয়ে গেলেই মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে।

--কবে থেকে করছে এরকম?

—কবে থেকে?..... দুদিন। নাহ পরশু থেকে। তিনদিন বলতে পারো।

—তিনদিন না খেয়ে আছে? একেবারে না খেয়ে আছে নাকি?

—একেবারে না খেয়ে আছে এটা বলছি না। তবে মনে হচ্ছে ওর যেন খাওয়ার কোনও ইচ্ছেই নেই। মাঝে মাঝে চোখ ঘুরিয়ে কী যেন খুঁজছে খুকু। কাকে যেন খুঁজছে। তারপর চোখ বুজিয়ে শুয়ে থাকছে। অনেকসময় দেখছি চোখ থেকে গড়িয়ে নামছে জল। মানে—কাঁদছে। কেন কাঁদছে, কাকে খুঁজছে কিছুই বুঝতে পারছি না। আর ওর মেজাজটাও যেন তিরিক্ষে হয়ে আছে। সব খাবারই পাতলা খেতে ও ভালবাসে। ফলের রস। মোহনভোগ। এসব ওর পছন্দ। কিন্তু মুখের কাছে যা নিয়ে যাচ্ছি মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে। গত দুদিন জোর করে কিছু অন্তত খাইয়েছিলুম। কিছু না খেলে বাঁচবে কী ভাবে মেয়েটা?

—জোর করে ওকে কি খাওয়ানো যায়?

—জোর করে মানে একটু চাপাচুপি করে। যতবার মুখ ফিরিয়ে নেয় ততবারই আমি মুখের কাছে খাবার ধরি। খাইয়ে দেবার চেষ্টা করি। রাগও দেখায়। কিন্তু শেষমেশ আমার কথার অমান্য করে না। খেয়ে নেয়।

—খুকু কীভাবে রাগ দেখায় মাসিমা?

—শুধু দুপাশে মাথা নাড়ে আর আঁ আঁ আঁ আঁ এরকম এক চিৎকার ওর গলা দিয়ে বেরিয়ে আসে। প্রথমে ভেবেছিলুম হয়তো সাময়িক অরুচি ধরেছে মুখে। আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু ঠিক হচ্ছে কোথায়? আজ তো একেবারে উপোসই আছে ও। একটু ফলের রস ছাড়া কিছুই খায়নি। মাছের ঝোল দিয়ে দুটো ভাত দিলুম। একটা ভাতের দানা মুখে দিল না। এভাবে তো ও দুর্বল হয়ে পড়বে।

—একজন ডাক্তারকে দেখিয়ে নিলে হত না মাসিমা?

—দেখালুম তো। এই পাড়াতেই বসেন উনি। এম.বি.বি.এস.। বয়স্ক মানুষ। অনেকদিন ধরে উনিই আমাদের চিকিৎসা করেন। ছোটখাটো জ্বর-টর হলে আমরা ওঁকেই দেখাই। আজ সকালে ওঁকে কল দিয়েছিলুম। উনি এলেন। দেখলেন খুকুকে। কিন্তু মনে হল না কিছু বুঝলেন। বললেন কোনও কারণে সাময়িক অরুচি এসেছে মুখে। যাতে খিদে হয় তার ওষুধ দিয়ে গেলেন।

—ওকে একবার দেখি—সোফা থেকে তমাল উঠে দাঁড়াল।

—হ্যাঁ। দেখবে তো বটেই। কিন্তু তার আগে কিছু মুখে দাও। এত দূর থেকে এলে.....?

—নাহ। আমি এখন কিছু খাব না। আজ অনেকবেলায় ভাত খেয়েছি। এখন একেবারে খিদে নেই।

—তাই কখনও হয় বাবা? তুমি আসবে বলে আমি একটু মিষ্টি এনে রেখেছি। তার সঙ্গে নিমকি দেব। বাড়িতে আমার তৈরি করা নিমকি। তুমি একটু বসো। আমি খাবারটা নিয়ে আসি। আজ আবার সুমি নেই। ও একটু দেশে গেছে।

—ওর দেশ কোথায়?

—পাঁশকুড়া। সুমি গেছে চারদিন আগে। খুকুর তখন শরীর খারাপ হয়নি। খুকুকে ও খুব ভালবাসে। খুকুর শরীর খারাপ দেখলে ও যেত না। আগামিকালই চলে আসবে। তুমি একটু বসো। আমি কিচেন থেকে আসছি।

কী আর করা যাবে? ইন্দ্রানী যখন তমালের কোনও ওজর-আপত্তি শুনবেন না। নিজে সামনে বসিয়ে তাকে কিছু খাওয়াবেনই। আপত্তি বারবার জানানো মানে মানুষটাকেই অপমান করা। সোফায় বসে ঘরের চারপাশে তাকাল তমাল। ফ্লুরোসেন্ট আলো জ্বলছে। কীরকম টিমটিমে। বাইরে সন্ধে অনেকক্ষণ নেমে এসেছে। জানলা দিয়ে পাশের দোতলা বাড়ির পর্দাঢাকা জানলা কিছুটা দৃশ্যমান। দূরদর্শনের কোনও চ্যানেলে সংবাদ পরিবেশিত হচ্ছে। একবার পুরুষ-কণ্ঠ খবর পড়ছে। আর একবার মহিলাকণ্ঠ। পাশের বাড়িতে দূরদর্শনের সাউন্ড বেশ জোর করা আছে। এ বাড়িতে বসেও তমাল তা শুনতে পাচ্ছে। তমালের এবার চোখ পড়ে গেল সুহাসের ফোটোর দিকে। সুহাসের বাবার ফোটো আর তার ফোটো পাশাপাশি জায়গা পেয়েছে দেয়ালে। তমাল সোফা থেকে উঠে একটু এগিয়ে গেল। সুহাসের ফোটোর দিকে তাকিয়ে রইল। বেশ সুন্দর দেখতে ছিল সুহাস। একমাথা কোঁকড়া চুল। মুখ দেখলেই বোঝা যায় ওর গড়ন ছিল রোগাটে। চোখ-নাক কাটা কাটা। চোখের দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ। সুহাসের ফোটোর কিছুটা ওপরে দেয়ালে একটা টিকটিকি। তমাল তাকে তাড়া দিল। টিকটিকিটা চকিতে কোথায় যে মিলিয়ে গেল। সুহাস তমালের দিকে তাকিয়ে আছে। মর্মভেদী দৃষ্টিতে। চাপা দুই ঠোঁটের রেখায় যেন অল্প হাসি।

—কেন তুমি নিজেকে পুড়িয়ে দিলে সুহাস? —তমালের মনে প্রশ্ন।

—মাঝে মাঝে এমন পরিস্থিতি আসতে পারে মনে হয় এই পৃথিবীতে আর বেঁচে থাকা যুক্তিযুক্ত নয়। —সুহাস যেন বলল। তমাল শুনল।

—তোমাকে নাঙা করে রাস্তায় ফেলে সকলের চোখের সামনে ওরা পিটিয়েছিল। তাই না?

—হ্যাঁ। আমার পরনে শুধু অন্তর্বাস ছিল। একটা জাঙিয়া। টানাটানিতে জামা আর গেঞ্জি দুটোই ছিঁড়ে গিয়েছিল। যখন মারছিল তখন রাস্তার অত মানুষ কেউ বাধা দিতে এগিয়ে আসেনি। তারপর যখন ওরা আমাকে রাস্তায় ফেলে চলে গেল তখন সহৃদয় ব্যক্তি কয়েকজন এগিয়ে এসেছিল। তারা অমাকে ধরাধরি করে একটা

ট্যাক্সিতে তুলে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল। তখন আমার পরনে কী ছিল জানো?

—কি?

—ছেঁড়া জামাটা আর জাঙিয়া। আমার ঠোঁট কেটে গিয়েছিল। সারা শরীরে অসম্ভব যন্ত্রণা। মারের চোটে চোখদুটো ফুলে গিয়েছিল। আমি ভালভাবে তাকাতে অব্দি পারছিলুম না।

—কিন্তু তবুও আত্মহত্যা করা কি ঠিক হল? সুহাস তুমি পরে থানায় যেতে পারতে। ঐ লোকগুলোর বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে কমপ্লেন করতে পারতে। টেলিফোনের কর্মী ছিল ওরা। ওদের সহজেই হয়ত আইডেনটিফাই করা যেত। —বিড়বিড় করল তমাল।

—তুমি তো আমার ডায়েরি পড়েছ তমাল? —ফোটোর ভেতর থেকে, অনেক দূর থেকে যেন, সুহাস জিজ্ঞেস করল।

—হ্যাঁ.....পড়েছি।

—তাও বোঝোনি আমি কেন আত্মহত্যা করেছি। ওদের প্রহার তো একটা উপলক্ষ মাত্র। আসলে জীবনের প্রতিই তো আমি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলুম! অনেকদিন থেকেই মনে হচ্ছিল বেঁচে থাকা অর্থহীন।

ফোটোর অন্তরাল থেকে ভেসে আসা সুহাসের কথা শুনতে শুনতে তমালের মনে পড়ল সুহাসের ডায়েরির সেই শেষ অংশ। বারবার পড়ে যেন মুখস্থ হয়ে গেছে তমালের। সুহাস লিখেছিল ডায়েরিতে—'মাঝে মাঝে মনে হয় এই চরম দুর্নীতির সমাজে আমি কী করিয়া বাঁচিয়া থাকিব? আমার এই জীবন লইয়া আমি কী করিব?'.....

—কিন্তু আমাদের সমস্ত বেঁচে থাকাটাই কি অর্থহীন? —তমাল আবার বিড়বিড় করল। —দুর্নীতি আছে। মানছি। সমাজের অনেকটাই পচে গেছে মানছি। কিন্তু সবটাই কি পচে গেছে? কিছুটা তো ভাল আছে। তাছাড়া আর একটা প্রশ্ন.....

—কী? —সুহাস যেন মিটিমিটি হাসছে।

—তুমি আত্মহত্যা করে অবস্থা তো কিছু বদলাতে পারলে না। তাহ'লে নিজের হাতে জীবনকে শেষ করা কেন?

—আসলে তমাল কী জানো তো? যারা বেশি সংবেদনশীল হয় তারা অনেক সময় অপমানের জ্বালা সহ্য করতে পারে না। আমারও তাই হয়েছিল। এমনিতেই চারপাশের দিকে তাকিযে আমি খুব হতাশায় ভুগতুম। কোথাও কোনও আলো নেই। শুধু অন্ধকার। যারা রাজনীতি করে তাদের চরিত্র নেই। যারা সমাজের উঁচু তলার মানুষ তাদের কোনও মূল্যবোধ নেই। শুধু স্বার্থের খেলা। হিসেবের ছক। টাকার প্রতি মোহ। আমার মনে হ'ত ভালবাসা কিংবা হৃদয় শব্দগুলোর এই সমাজে আর কোনও প্রাসঙ্গিকতা নেই। পর্ণাদির কথাই ধরো। বেচারি একজনকে মন-প্রাণ দিয়ে

ভালবাসত। তার বদলে পেল চরম প্রতারণা। একজন বেশ্যা বনে যেতে হ'ল পর্ণাদিকে। এসব দেখে আমার মনে হতাশা এবং দুঃখ ছিলই। তারপর টেলিফোন-কর্মীদের সামান্য কাজের বিনিময়ে ঘুষ চাওয়ার ঘটনাটা আমাকে ভীষণ কাঁপিয়ে দিয়েছিল। প্রতিবাদ করেছিলুম আমি। জ্বলে উঠেছিলুম। ঘুষ দিইনি। তাতে ওরা যখন প্রকাশ্যে আমাকে ওভাবে নির্যাতন করল; আমি কোনও মানুষের সহানুভূতি বা সাহায্য কিছুই পেলুম না; তখনই মনে হয়েছিল নিজেকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দিই। তখন মাথা কাজ করছিল না। শুধু মনে ছিল চরম অপমানের জ্বালা! আর চোখের সামনে নিরেট অন্ধকার.....! তোমাকে নিয়েও আমার ভয় তমাল। —সুহাস যেন বলল।

—আমাকে নিয়ে? কেন?

—আমার মতো তুমিও খুব সংবেদনশীল। চারপাশের অবক্ষয় নিয়ে, সমাজের যাবতীয় দুর্নীতি নিয়ে তোমার মনেও এক ধরনের হতাশা আছে। আত্মসম্মানকে তুমি বড় মর্যাদা দাও। সেই আত্মসম্মানে ঘা পড়লে তুমিও আমার মতো কান্ড বাধিয়ে ফেলতে পারো।

—হ্যাঁ ঠিকই বলছ সুহাস। আমারও মাঝে মাঝে মনে হয়, চারপাশে এত অন্যায় ঘটে চলেছে, আমি তো আর কিছু বদলাতে পারব না। তাই কখনও কখনও বেঁচে থাকাও অর্থহীন ও ক্লান্তিকর মনে হয়।.....

ঠিক সেই মুহূর্তে ইন্দ্রানী ঘরে ঢুকলেন। তিনি ঈষৎ হাঁফাচ্ছেন। তাঁর এক হাতে ট্রে-তে বড় প্লেট। তাতে খাবার। ঝকঝকে কাচের গ্লাসে পরিষ্কার জল। কিচেন একতলাতে। সেখান থেকে খাবারের প্লেট হাতে সিঁড়ি ভেঙে উঠে এসেছেন। তাই ঈষৎ হাঁফাচ্ছেন ইন্দ্রানী।

—এসবের কী দরকার ছিল মাসিমা? একে বাড়িতে সুমি নেই।

—তাতে কী হয়েছে বাবা? তুমি তো ঘরের ছেলের মতন। তুমি এলে আমার আনন্দ হয়। মনে হয় আমার পাশে একজন শুভাকাঙ্ক্ষী আছে। —ইন্দ্রানী হাসলেন। তাঁর সুন্দর হাসিটা। মিষ্টি, নিমকি সব খেতে হল তমালকে। জলও খেল সে। তারপর বলল—চলুন। খুকুকে দেখি।.....

সেই সিঙ্গল খাট। হালকা নীল চাদর পাতা বিছানা। শুয়ে আছে খুকু। তার গায়েও একটা পাতলা সাদা চাদর। মাথার ওপর ফ্যান চলছে। তবে খুব ঢিলে গতিতে। খুকুর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল তমাল। সত্যিই খুব শীর্ণ আর শুকনো লাগছে খুকুকে। এক সপ্তাহ আগে যখন এসেছিল তমাল তখন এত শুকনো লাগেনি। খুকুর শিয়রের কাছে গিয়ে ইন্দ্রানী ডাকলেন স্নেহময় স্বরে—খুকু ও খুকু! দেখ কে এসেছে। কয়েকবার ডাকার পর খুকু চোখ মেলল। দেখল তমালকে। তমালের মনে হল খুকুর চোখে যেন আলো জ্বলে উঠল!.....

১৬

তমাল তাকিয়ে দেখছিল খুকুকে। সে শুয়ে আছে। এতক্ষণ তন্দ্রার মধ্যে ছিল। এখন ইন্দ্রানী ডাকতে সে জেগেছে। চোখ মেলে একবার দেখেছে তমালকে। তমালের মনে হ'ল, তাকে চিনতে পেরেছে খুকু। এখন আবার চোখদুটো বুজে আছে খুকুর। ইন্দ্রানী মুখে বললেন—কিছু খাবি মা? তার সঙ্গে ইশারাও করলেন। হাত এবং মুখে খাওয়ার ভঙ্গি করলেন। খুকু তাকিয়ে দেখছে। তার দৃষ্টি খুব স্বাভাবিক মনে হল তমালের। কীরকম এক অস্পষ্ট হাসি ফুটে উঠেছে মেয়ের মুখে। ইন্দ্রানীও তা লক্ষ্য করেছেন। তিনি তমালকে ফিসফিস করে বললেন—আজ তিনদিন পর মেয়েটার মুখে হাসি দেখছি। আমার কী মনে হচ্ছে জানো তমাল?

—কী?

—তুমি এসেছো বলে খুকু খুব আনন্দ পেয়েছে। ওর চোখ মুখের ভাব হঠাৎ বদলে গেছে।

—আমি কি ওকে কিছু খাওয়াবার চেষ্টা করব?

—তুমি?..... ইন্দ্রানী যেন কয়েক মুহূর্ত ভাবলেন। তারপর তমালের দিকে তাকিয়ে বললেন—এই কথাটা আমার মনে আগে আসেনি। কেন বলো তো আমার কথাটা মনে হয়নি?

—কোন্ কথাটা?

—যে তোমাকে দিয়ে ওকে খাওয়ানোর চেষ্টা করা।..... বরং আমি ভাবছিলুম অন্য কথা।

—কী কথা ভাবছিলেন কাকিমা?

—আমি ভাবছিলুম হয়ত সুহাসকে আর দেখতে পাচ্ছে না বলেই ও তাকে খুঁজছে। তাকে আর দেখতে পাচ্ছে না বলেই খুকু রাগ করেছে। অভিমান করেছে। ও খুব অভিমানী জানো তো? আহা কত কষ্ট ওর! ঈশ্বর কেন যে ওকে এই কঠিন শাস্তি দিলেন? কথা বলতে পারে না। কথা শুনতেও পায় না হয়ত। নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না। সারা জীবন বিছানায় শুয়ে আছে। শুয়ে থাকতে হবে ওকে। আমি যখন বাড়ি থাকতুম না সুহাস ওকে সঙ্গ দিত। ওর মাথার কাছে বসে থাকত। ওর সঙ্গে বকবক করত। আবার ইশারাতে কথাও বলত। তাই আমি ভেবেছিলুম সুহাসকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে না বলেই বোধহয় ওর অভিমান হয়েছে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তুমি কদিন আসনি বলে ওর অভিমান হয়নি তো? কারণ, তোমাকে সামনে দেখে খুকুর মুখের কিন্তু অনেক পরিবর্তন হয়ে গেল কয়েক মিনিটে। ও যেন খুশি হল। আমি তো ওর মা। আমি ওর মনের ভাব সব বুঝতে পারি।

তমাল তাকিয়ে ছিল খুকুর দিকেই। সে প্রথমে দাঁড়িয়ে ছিল। তারপর ইন্দ্রা
তাকে বসতে বললেন। একটা চেয়ার এগিয়ে দিলেন। তমাল বসল। খুকু আবা
চোখ খুলেছে। তাকিয়ে দেখছে তমালকে। তমালের আবার মনে হ'ল, খুকু সতি
সুন্দরী। জন্মের পর থেকে বিছানায় শুয়ে থেকেও তার মুখের লাবণ্য অনেকট
রয়ে গেছে। এক একরকম সৌন্দর্য আছে যা হৃদয়ের আলোয় যেন আলোকি
হয়ে থাকে। খুকুর সৌন্দর্যও সেরকম। হৃদয়ের আলোয় আলোকিত। এরকম ভাব
ভাবতে তমালের মনে হ'ল, খুকু কথা বলতে পারে না বটে। নিজেকে সে প্রক
করতে পারে না বটে। কিন্তু তারও তো হৃদয় আছে। সেই হৃদয়ে নানারকম বো
বুদবুদ ওঠে আর নামে। খুকুর হৃদয় কেমন? স্বচ্ছ স্ফটিকের মতন? সমুদ্রের গভী
যে স্ফটিকের জন্ম হয়! যে স্ফটিক থেকে বিচ্ছুরিত হয় প্রবাল দ্বীপের আলে

খুকু এখন নরম দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তমালেরই দিকে। তার ঠোঁটে হাসি
আভাস। যেন তমাল এসেছে তাই আনন্দ পেয়েছে সে। তমালের হঠাৎ মনে হ
কয়েকদিন ধরে খুকু খাওয়াদাওয়া ঠিকমতো করছে না। সে কি একবার চেষ্টা ক
দেখবে? যদি তার হাতে খুকু কিছু খেতে চায়?

—আমি কি একবার চেষ্টা করে দেখব?

—কি?

—যদি খুকু আমার হাতে কিছু খায়।

—ঠিক বলেছ! আমিও তাই ভাবছিলুম! —ইন্দ্রানী উচ্ছ্বসিত স্বরে বললে
—দাঁড়াও আমি ওকে জিজ্ঞেস করি। —এই বলে ইন্দ্রানী আবার খুকুর শিয়রে
কাছে এসে তার কপালে হয়ত রাখলেন।

—খুকু কিছু খাবি মা? —মুখে যেমন এই কথা জিজ্ঞেস করলেন ইন্দ্রানী, সেক
আবার ইশারাও করলেন। দেখা গেল খুকু মাথা নাড়ছে। আর তার ঠোঁটে অস্প
দিগন্তরেখার মতন জেগে আছে সেই হাসি। ইন্দ্রানী তমালের দিকে তাকি
বললেন—তুমি ঠিক আন্দাজ করেছ বাবা! ও এবার কিছু খেতে চায়। তুমি
সামনে বসে থাকো। তোমার উপস্থিতি যে ওকে আনন্দ দিচ্ছে তা তো বুঝতে
পাচ্ছি। আমি ওর জন্যে কিছু খাবার নিয়ে আসি।

ইন্দ্রানী ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তমাল বসে রইল। খুকু তমালের দি
তাকিয়ে আছে। তমালের মনে হ'ল, খুকু যেন তাকে জিজ্ঞেস করছে—এতদি
কোথায় ছিলে? আসোনি কেন? এরকম ভাবতেই তমালের শরীরে কীরকম শিহর
জাগল। মানুষের চোখের ভাষাই তো প্রকৃত ভাষা। সেই ভাষা পড়তে পারলে মানুষে
হৃদয়ের কথা বোঝা যায়। অনুভব করা যায়। খুকু কথা বলতে পারে না। কি
তার চোখের দৃষ্টিতে, অভিব্যক্তিতে যেন তার মনের কথা সে প্রকাশ করতে চাইছে
খুকুর উন্মোচিত দুই ঝিনুকের মতো চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তমালে

মনে হ'ল, সত্যিই যেন খুকু জিজ্ঞেস করছে তাকে—এতদিন আসোনি কেন? তুমি কী জানো না আমি খুব একা। মা ছাড়া আমার এই পৃথিবীতে কেউ নেই? আমাকে তুমি একটু ভালবাসতে পারো না? আমার কথা তোমার মনে পড়ে না? তুমি আসোনি তাই তো আমার অভিমান হয়েছিল। আমি তো অভিমান হ'লে প্রকাশ করতে পারি না। তাই আমি খাওয়া বন্ধ করেছিলুম। তাতেও যদি বোঝা যায় যে তুমি আসোনি বলে আমার রাগ হয়েছে।

আজ কী যে হচ্ছে তমালের! একটু আগে সুহাসের ফোটোর সামনে দাঁড়িয়ে তার মনে হচ্ছিল সুহাস যেন পরপার থেকে তার সঙ্গে কথা বলছে। সুহাসের কথা তমাল শুনতে পাচ্ছে। স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। কত কথাই না বলছিল সুহাস। যা সে কাউকে বলতে পারেনি। এমনকী লিখেও যায়নি তার ডায়েরিতে। সুহাসের আত্মহনন নিয়ে তমালের মনে কিছু প্রশ্ন ছিল। সেইসব প্রশ্নের উত্তর যেন তমাল আজ পেয়ে গেল সুহাসের ফোটোর সামনে দাঁড়িয়ে। আচ্ছা সত্যিই কি এরকম হতে পারে? মানুষের না-বলা অনেক কথা হয়তো এই ভূমন্ডলে ইথার-স্তরে ভেসে বেড়ায়। যে শুনতে চায় সে শুনতে পায়। মৃত্যুর আগে সুহাসও হয়তো তার অব্যক্ত কথাগুলো ছড়িয়ে রেখে গিয়েছিল শূন্যতায়; ইথার-স্তরে সেইসব না-বলা কথা ভেসে বেড়াচ্ছিল এতদিন। তমাল সুহাসের সেই কথাগুলোই শুনতে পেয়েছে। আর কেউ শুনতে চায়নি। তমাল একাই শুনতে চেয়েছে। তাই শুনতে পেয়েছে। এসব ভাবতে ভাবতে তমালেব এখন খুকুকে খুব ভালবাসতে ইচ্ছে করল। খুকু তাকিয়ে আছে তার দিকে। যেন আদিগন্ত বিস্তৃত নীল জলরাশির স্বচ্ছতার মায়া জড়িয়ে আছে খুকুর সেই দৃষ্টিতে। তমাল স্পষ্ট শুনতে পেল খুকু বলছে—ওগো তুমি খুব সুন্দর। তুমি খুব ভাল। তোমার হৃদয়েও জ্বলে থাকে আলো। আমি সেই আলো দেখতে পাই। আমি জানি তুমি খুব ভালবাসতে পারো। আমি তোমাকে যেদিন প্রথম দেখেছি সেদিনই আমার মনে হয়েছে তুমি আমাকে খুব ভালবাসবে। আমার দুঃখ বুঝবে তুমি। আমাব চোখের ভাষা বুঝবে। আমার হৃদয়ের ভাষা বুঝবে। তাই তো আমি তোমার জন্যে এই বিছানায় শুয়ে শুয়ে অপেক্ষা করি প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্ত। আমার দিন যেন কাটতে চায় না। তোমার বিহনে। তুমি আসছ না তাই আমি অভিমান করে খেতে চাইনি কিছু। এই তো তুমি এসেছ! তুমি আজ আমাকে নিজের হাতে খাইয়ে দেবে?

তমাল খুকুর দিকে তাকিয়ে বলল—হ্যাঁ খুকু। আমি তোমার কথা শুনতে পেয়েছি। আমি বুঝেছি তোমাকে। নিজের হাতে আমি তোমাকে খাইয়ে দেব.....। তমাল চেয়ার থেকে উঠে খুকুর শিয়রের কাছে গেল। আলতো হাত ছোঁয়াল খুকুর কপালে। আর সেই মুহূর্তে নিজের শরীরে যেন বিদ্যুতের শিহরন অনুভব করল সে! তার মনে হ'ল, যেন কেঁপে উঠল খুকু। সুখের কিংবা তৃপ্তির এক বোধ থেকে যেন

সত্যিই কেঁপে উঠল খুকু তমালের হাতের স্পর্শে! তমাল তার হাত সরিয়ে নিল না। বরং পরম আবেগে, গভীর ভালবাসায় ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল খুকুর কপালে। খুকু আবার চোখ বুজিয়েছে। তমাল দেখল, খুকুর চোখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা গড়িয়ে নামছে অশ্রু। মুক্তোর মতন অশ্রুবিন্দু। খুকু কাঁদছে। এই কান্না শোকের নয়। বিষাদের নয়। দুঃখের নয়। মানুষ যখন সত্যিকারের ভালবাসা পায় একমাত্র তখনই সে এরকম কান্না কাঁদতে পারে। তমাল বিড়বিড় করে বলল—আমি বুঝতে পেরেছি খুকু। তোমার কাছে আমি প্রতিদিন আসব। ঠিক সেই মুহূর্তে ইন্দ্রানী এলেন ঘরে। তাঁর হাতে সূক্ষ্ম কাচের পাত্র। সেই পাত্রে কমলালেবুর রস। ইন্দ্রানী তমালের দিকে পাত্রটি এগিয়ে দিয়ে বললেন—এটা তুমি খাইয়ে দাও খুকুকে। একজন প্রতিবন্ধী কিশোরীকে খাইয়ে দেওয়ার এই কাজটা একেবারে নতুন নয় অবশ্য তমালের কাছে। কিছুদিন আগেই সে একদিন খুকুকে ফলের রস খাইয়ে দিয়েছিল। সেদিন খুকু আগ্রহভরে খেয়েছিল তমালের হাতে। আর আজও খুকু তমালের হাতে খেল। তার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল সে তৃপ্তি পাচ্ছে। তার চোখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল তমালের হাতে এভাবে খেতে সে বেশ আনন্দ পাচ্ছে। হাসপাতালে কিংবা নার্সিংহোমে যেমন বিছানা দেখা যায়। অসুস্থতার কারণে বিছানায় শুয়ে আছে যে মানুষ তাকে উঁচু করে তুলে ধরতে ব্যবস্থা থাকে। সেই ব্যবস্থার সাহায্যে অসুস্থ, আহত বা মুমূর্ষু ব্যক্তিকে তুলে ধরা হয় কিংবা বসার অবস্থায় আনা হয়। প্রতিবন্ধী খুকুর জন্যেও সেই ধরনের বিছানার ব্যবস্থা করেছেন ইন্দ্রানী। এখন, খাওয়ার সময় তিনি স্ক্রু ঘুরিয়ে উঁচু করে দিয়েছেন খাট। খুকু আধশোয়া অবস্থায়। তমাল খুকুর মুখে চামচ করে ফলের রস দিচ্ছিল। দেখেই বোঝা যায় খুবই আগ্রহভরে খাচ্ছে খুকু। মাঝেমাঝে তাকাচ্ছে তমালের দিকে। তার ঠোঁটে চাপা হাসি। ইন্দ্রানী বললেন—আহা মেয়ে যেন তোমার হাতে অনশন ভঙ্গ করছেন। এতদিন অনশন করেছিলেন উনি। কেন যে অনশনে ছিলেন তা আমি এখন বুঝলুম।

—কী কারণে ও খেতে চাইছিল না? আমি তো ঠিক বুঝিনি। সাবধানে চামচ দিয়ে ফলের রস তুলে পরম যত্নে খুকুর মুখে দিয়ে তমাল প্রশ্ন করল।

—বুঝতে পারোনি? কী করেই বা বুঝবে? তুমিও তো একেবারে ছেলেমানুষ নিজের মনে থাকো।..... আশ্চর্য! ফিসফিস করে বললেন ইন্দ্রানী।

—আশ্চর্য কী মাসিমা?

—এখন আমি বুঝলুম ওর অভিমানের কারণ। আসলে তুমি কদিন আসোনি, তাই মেয়ের রাগ হয়েছিল। আহা, ও তো মুখে কিছু বলতে পারে না। তাই খাবার বারবার রিফিউজ করে বোঝাতে চাইছিল যে তোমার হাতে ও খেতে চায়। এটা আমি আগে বুঝিনি। এখন বুঝলুম।

—আমাকে কি ও সুহাস ভাবছে মাসিমা?

—আমার মনে হয় না। সুহাসকে ও দেখতে পাচ্ছে না তাই ওর মনে হয়তো প্রশ্ন আছে। সেটা মাঝে মাঝে ও যখন জেগে থাকে ওর তাকানো দেখলেই বুঝতে পারি। চোখ ঘুরিয়ে ও যেন কাকে খোঁজে। সেটা বেশি করত সুহাসের মৃত্যুর পর। কেন দেখতে পাচ্ছে না সুহাসকে বুঝতে পারত না। তাই অবাক হয়ে খুঁজত। কিন্তু সেও তো একমাসের বেশি হয়ে গেল। এখন বোধহয় মনে মনে ও সুহাসের অনুপস্থিতি মেনে নিয়েছে। এখনও তোমাকেই খোঁজে। তুমি আসছ না। তাই ওর রাগ হয়েছিল, অভিমান হয়েছিল।..... খুকু তোমাকে খুব ভালবাসে তমাল।..... বললেন ইন্দ্রানী। —'ভালবাসা' শব্দটা এমনভাবে উচ্চারণ করলেন যে তমালের কীরকম শিহরন হল। সে ইন্দ্রানীর মুখের দিকে তাকাল। ইন্দ্রানী মৃদু হাসছেন। তাঁকেও এই মুহূর্তে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে। আবার তমালের মনে পড়ল সেই তুলনাটা। শুভ্র কেশ, চশমা, ফরসা ও মসৃণ ত্বক এবং মুখমন্ডলে বৈদগ্ধের বিভায় ইন্দ্রানীকে দেখতে গায়িকা সুচিত্রা মিত্রের মতো। ওঁদের দুজনের মধ্যে বয়সের অনেক তারতম্য সত্ত্বেও।

—ছানার পায়েস খেতে খুকু খুব পছন্দ করে। আমি একটু ছানার পায়েস আনি। তুমি ওকে খাইয়ে দেবে তমাল? আমার মনে হচ্ছে তুমি যা দেবে ও এখন খাবে।

—হ্যাঁ। আনুন।

ফলের রস শেষ। তমাল দেখল খুকু তার দিকে তাকিয়ে আছে। মুখে হাসি। ঠিক প্রকাশ্য হাসি নয়। অস্পষ্ট হাসির রেখা। ছোট একটা তোয়ালে হাতের কাছেই আছে। তমাল তোয়ালে দিয়ে খুকুর মুখ মুছিয়ে দিতে গেল। ইন্দ্রানী গেছেন ছানার পায়েস আনতে। হঠাৎ চাদরের ভিতর থেকে রোগা ডান হাত বের করে খুকু তমালের হাত ধরল। ঈষৎ ঠান্ডা স্পর্শ! খুকুর হাতটা কাঁপছে! কোমর থেকে পা পর্যন্ত অসাড়। তাই খুকুকে শুয়ে থাকতে হয়। হাতদুটো তো সে নাড়াতে পারে। কথা বলতে অবশ্য পারে না। শুনতেও পায় না বোধহয়। ভীষণ কাঁপছে খুকুর আঙুলগুলো! তমালের অনুভবেও দুর্বল, প্রতিবন্ধী এক মেয়ের সেই অসহায় কাঁপুনি সঞ্চারিত হয়ে চলেছে যেন। খুকু কী বোঝাতে চাইছে?

—কী বলতে চাইছ? —তমাল ফিসফিস স্বরে জিজ্ঞেস করল। কিছু বলতে পারল না খুকু। সে শুধু তমালের দিকে তাকিয়ে আছে। আর তার দুই চোখ আবার জলে ভরে উঠছে। নিজের ভেতরে প্রবল এক আবেগ অনুভব করল তমাল। সুন্দর এবং নিষ্পাপ এই মেয়ে কথা বলতে পারে না কেন? একী নিষ্ঠুর খেলা ঈশ্বরের। ঈশ্বর কি আছেন? অপরেশ-স্যার তাকে বলতেন—ঈশ্বর নেই। ওসবে বিশ্বাস কোরো না তমাল। যে বিশ্বাসের কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই তাকে তুমি পাত্তা না দেবার চেষ্টা করবে।..... ঠিক আছে যদি ঈশ্বর না থাকে, তাহলে ভাগ্য? ভাগ্য বলে তো কিছু আছে? মানুষ সহজ ভাষায় যাকে কপাল বলে। সেই কপালের রীতিনীতি

কী? খুকু কেন তার জীবনে এত কষ্ট পাচ্ছে? আমৃত্যু হয়তো তাকে এই কষ্ট, শারীরিক এই প্রতিবন্ধকতা নিয়েই বেঁচে থাকতে হবে। জীবনের বিচিত্র খেয়ালের কাছে মানুষ কত অসহায়। তমালের মনটা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল কয়েক মুহূর্ত। জীবনের খামখেয়ালিপনার প্রতি সে অনুভব করল চাপা রাগ। খুকু কোমল দৃষ্টি নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। তমাল খুকুর কপালে ডান হাত ছোঁয়াল। সে পরম আবেগে বলল—আমি তোমাকে খুব ভালবাসব খুকু। যখনই সময় পাব আমি তোমার কাছে আসব। নিজের হাতে আমি খাইয়ে দেব তোমায়.....। খুকু তো জন্ম থেকেই মূক ও বধির। তার পক্ষে তো তমালের কথা শুনতে পাওয়া সম্ভব নয়। তবুও খুকুর চোখ ক্রমশ জলে ভরে উঠছে কেন? কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে নামছে। খুকু কাঁদছে আবার। সে কি আনন্দে? খুকুর চোখের জলও তোয়ালে দিয়ে মুছে দিল তমাল। সে খুকুর কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। খুকুর চোখ বুজে আছে। সে যেন তার প্রাণ-মন দিয়ে অনুভব করছে তমালের ভালবাসার আস্বাদ।

ইন্দ্রানী ঢুকলেন। হাতে আর একটা কাচের পাত্র, চামচ।

—একটু দেরি হ'ল তমাল। আমি তো একা আছি। সুমি নেই। তাই রাতের তরকারিটা চাপিয়ে এলুম। মা আর মেয়ে খাব। এবার মনে হচ্ছে ও অনশন ভেঙেছে তুমি ছানার পায়েস খাইয়ে দাও। তোমার কাছে ও বেশ খায়।

ইন্দ্রানীর কথার মধ্যে কোনও ভুল নেই। পাত্রে যতটুকু পায়েস ছিল, সবটাই খেয়ে নিল খুকু। একটু জলও খেল। তারপর মুখে বিচিত্র শব্দ করল। ইন্দ্রানী বুঝেছেন। পাশ ফিরতে চাইছে খুকু। তিনি যত্নে এবং সাবধানে ওকে পাশ ফিরিয়ে দিলেন। খুকু বোধহয় ঘুমিয়ে পড়ল। তমাল বলল—আমি এবার যাই কাকিমা ঘড়িতে সাড়ে আটটা বেজে গেছে। ফিরতে ঘন্টাখানেক লাগবে। তার মানে সাড়ে নটা। আজ আবার বাড়িতে আমি আর মা দুজনে। বাবা থাকবেন না।

—কেন? বাবা কোথায় গেলেন?

—বাবা অফিসের কাজে দিল্লি। আগামীকাল বিকেলের ফ্লাইটে ফিরবেন। তার মানে দমদম এয়ারপোর্ট থেকে বাড়ি ফিরতে সন্ধে হবে।

—তোমার বাবাকে প্রায়ই এরকম বাইরে চলে যেতে হয়?

—প্রায়ই। আগে এতটা ছিল না। আজকাল দেখছি প্রায়ই ওঁকে বাইরে রাত কাটাতে হয়। অফিসে বাবার অনেক দায়িত্ব তো?

—সে তো বটেই। ব্যাঙ্কের সিনিয়র অফিসার। কতরকম কাজ থাকে। তমাল খুকুর ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়েছে। ইন্দ্রানী কিছু যেন ভাবছেন কিছু বলতে চান বোধহয়। কী বলতে চান?

—একটা কথা বলব তমাল?

—কি মাসিমা?

—তোমার বাড়িতে আমি একটা ফোন করি। তোমার মায়ের সঙ্গে একটু কথা বলি।

—কী ব্যাপারে?

—শোনোই না। —ইন্দ্রানী পাশের ঘরে এলেন। ফোনের ডায়াল করছেন। তমালদের বাড়িতে। তমাল লক্ষ্য করে যাচ্ছে। মায়ের সঙ্গে কথা বলতে চান ইন্দ্রানী। কী কথা?.....

তমালদের বাড়ির ফোনে রিং হচ্ছে বোধহয়। ইন্দ্রানী রিসিভার কানে ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। এবার কথা বলছেন।

—আমি ইন্দ্রানী বলছি। আপনার ছেলে তমাল আমার বাড়িতে। এবার ফিরবে।

....

—আপনি বোধহয় জানেন, শুনেছেন তমালের মুখে আমার মেয়ে কথা বলতে পারে না। হাঁটাচলাও করতে পারে না। তো এ বাড়িতে তমাল আসার পর থেকে আমি মেয়ের অদ্ভুত উন্নতি লক্ষ্য করছি। তমালকে ও খুব পছন্দ করে। কয়েকদিন মেয়েটা কিছু খাচ্ছিল না। আজ তমাল ওকে খাইয়েছে। তমালের সঙ্গ পেলে মেয়েটা খুব ভালো থাকে। তাই বলছিলুম আমার একটা অনুরোধ আছে।

....

—সেটা হ'ল, তমাল যদি আগামিকাল সকালে আমার বাড়িতে আসে। দুপুরবেলা ও এখানে খাবে। আপনার কোনও আপত্তি নেই তো?

....

—শুনে খুব খুশি হলুম ভাই। আপনিও দেখছি খুব ভালোমানুষ।

....

—হ্যাঁ। আপনাদের বাড়ি নিশ্চয়ই একদিন যাব। আপনিও একদিন এলে খুসি হব। আচ্ছা রাখলুম ভাই।

তমাল শুনছিল ইন্দ্রানীর কথা। ওপ্রান্ত থেকে মা কী বলছে সে শুনতে পাচ্ছে না যদিও। রিসিভার যথাস্থানে নামিয়ে রেখে ইন্দ্রানী তমালের দিকে তাকিয়ে বললেন—তোমার মায়ের সঙ্গে কথা বলে খুব আনন্দ পেলুম। খুব ভদ্র। ওঁর অনুমতি নিয়েছি। তুমি আগামীকাল সকালে এখানে চলে এসো। আমি তোমার জন্যে রান্না করব। সুমিও কাল সকালে চলে আসবে। আমি আগামিকাল স্কুলে যাব না তমাল। কেন জানো?

—কেন?

—আগামিকাল খুকুর জন্মদিন।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ তমাল। আগামীকাল খুকু ঠিক সতেরো বছরে পড়বে। আমার আর কে

আছে বলো? আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে কোনওদিনই তেমন যোগাযোগ নেই। সুহাস নেই। তুমি একটু আসবে না?

—হ্যাঁ মাসিমা। নিশ্চয়ই আসব।

—সকাল নটার মধ্যেই চলে আসবে তমাল। আমার খুব ভাল লাগবে।

—তাই আসব।

—তোমার মায়ের সঙ্গে কথা বলে বেশ লাগল তমাল। একদিন ওঁকে এনো আমাদের বাড়িতে।

—হ্যাঁ আনব। এখন আসি। কাল সকাল সকাল চলে আসব।

—এসো বাবা। সাবধানে যেও।

তমাল যখন বাড়ি ফিরল তখন রাত সাড়ে নটা বেজে গেছে। মা অপেক্ষা করে আছে। বাড়ি ঢুকে তমালের মনে পড়ল আজ বাড়িতে বাবা নেই। জরুরি কাজে আজ বিকেলের ফ্লাইটে দিল্লি গেছে। আগামীকাল বিকেলের ফ্লাইটে ফিরবে খাবার টেবিলে বসে অনিতা জিজ্ঞেস করল—যে ভদ্রমহিলা ফোনে কথা বললেন, যাঁর বাড়িতে তুই যাস ওঁরই এক ছেলে কিছুদিন আগে সুইসাইড করেছিল না?

—হ্যাঁ।

—ভদ্রমহিলার কী দুঃখী জীবন! এক ছেলে নেই। এক মেয়ে সেও সুস্থ নয় প্রতিবন্ধী। ঠাকুর কেন যে মানুষকে এত কষ্ট দেন। আমি কত ঠাকুরকে ডাকি রোজ.....

—কী জন্যে ঠাকুরকে ডাকো মা?

—আমরা সবাই যাতে শান্তিতে থাকি। শুধু আমরা নয় তমু। পৃথিবীতে সবাই যাতে সুখে-শান্তিতে থাকতে পারে তার জন্যে আমি প্রতিদিন ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি। কিন্তু ঠাকুর শোনেন কোথায়? কত মানুষের কত কষ্ট! তুই মাঝে মাঝে ওঁর বাড়িতে যাবি তমাল। আমার পারমিশান দেওয়াই রইল। ওঁর পঙ্গু মেয়ে তোকে নাকি খুব পছন্দ করে। তোর হাতে খেতে ভালবাসে। আহারে! শুনে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। মানুষই তো অন্য মানুষের জন্যে করবে। একজনের বিপদে আর একজন পাশে দাঁড়াবে। এটাই তো জীবনের নিয়ম।

মায়ের কথাগুলো বেশ ভাল লাগছিল তমালের। তার মা কিন্তু খুবই স্নেহময়ী ঠিক যেন ইন্দ্রানীর মতোই। মা ঠাকুর-দেবতা-গুরুদেব এসব নিয়ে একটু বেশি সময় কাটায়। এটা ঠিক। কিন্তু তবুও মা খুব ভাল। মা সবসময় সংসারের জন্যেও ভাবে তমাল জানে। মা মাঝে মাঝে বলে—সংসার হল মন্দিরের মতন। মন্দিরে গেলে যেমন মনে শান্তির ভাব আসে। আমাদের সংসারেও আমরা এমন ভাবে বাস করি যাতে সবাই আনন্দে থাকে। গুরুদেব তাই বলেন বারবার।

খেতে খেতে তমালের হঠাৎ মনে হল, বাবা যেন মাকে একটু অবহেলাই করে

সর্বদাই যেন বড় ব্যস্ত বাবা। মাকে নিয়ে কোথাও বেড়াতে যায় না। প্রয়োজন ছাড়া কথা বলে না। আর ইদানীং যেন বাবার অফিসের কাজের চাপ বড় বেড়েছে। প্রায়ই রাতে বাবা বাড়িতে থাকে না। দিল্লি যায়। ভুবনেশ্বর যায়। তমালের মনে হল, মা আসলে খুব একা। সে নিজেও তো তেমন কথাবার্তা বলে না মায়ের সঙ্গে। নিজের পড়াশোনা নিয়েই থাকে। নিজের ভাবনাচিন্তা নিয়েই থাকে।

মা এখনও টেবিলের একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। তমালের খাওয়া শেষ হলে খাবে। তমাল বলল—তুমিও বসে পড়ো মা।

—এই বসব। তোর খাওয়া শেষ হোক।

—নাহ। তুমি এখনই বসে পড়। আমরা দুজনে একসঙ্গে খাব।

তমালের পীড়াপীড়িতে অনিতাকে বসতেই হয়। খেতে খেতে অনিতা বলে—আমাকে একদিন ইন্দ্রানীদি-র বাড়িতে নিয়ে যাবি তমাল?

—হ্যাঁ। নিয়ে যাব।..... বাবা কি আজ অফিস থেকে বাড়িতে ফেরেনি মা?

—নাহ। বাড়ি ফেরার আর সময় পেল কোথায়? অফিস থেকেই তো ফোন করল যে দিল্লি চলে যেতে হবে। বিকেলের ফ্লাইটে।

—আজকাল যেন অফিসের কাজে বাবার বাইরে যাওয়া বেড়েছে?

—হ্যাঁ। দায়িত্ব বেড়েছে হয়তো। কাজের মানুষ। কাজ করতে ভালবাসে।

—বাবা এত জায়গায় অফিসের কাজে যায়। তোমাকে কোথাও নিয়ে যায় না কেন? তুমি তো শুধু এই সংসার নিয়েই আছো সর্বক্ষণ।

—তোকে একা ফেলে আমি বেড়াতে চলে যাব? —অনিতা হাসে।

—আমি তো এখন বড় হয়ে গেছি। বাড়িতে কাজের লোক আছে। দু-একদিন একা থাকতে পারব না?

—আচ্ছা তুই একটা ভাল চাকরি পেয়ে যা। তোর সঙ্গে খুব ঘুরে বেড়াব। অনিতা হেসে বলে। তমালের মনে হয় সেই হাসিতে যেন বুকের গভীরে কোনও দুঃখকে আড়াল করতে চাইছে মা.....।

১৭

পরের দিন সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে চৌরাস্তায় এসে তমালের চোখে পড়ল

দেয়ালে সাঁটা কিছু পোস্টার। একেবারে নতুন লাগানো হয়েছে পোস্টারগুলো। গতকালও এগুলো দেখেনি সে। হয়তো গতকাল সন্ধের সময় কিম্বা রাতের দিকে নানা দেয়ালে এবং পাঁচিলে সেঁটে দিয়ে গেছে পোস্টারগুলো এক রাজনৈতিক দলের কর্মীরা। সেই পোস্টার জানাচ্ছে যে, নির্দিষ্ট এক লোকসভা আসনের আসন্ন উপনির্বাচনে এলাকার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শ্রীঅপরেশ রায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। তাঁকে বিপুল ভোটে জয়ী করে এলাকার সার্বিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার আহ্বান জানানো হয়েছে ঐ পোস্টারে। যে রাজনৈতিক দলের সমর্থন নিয়ে অপরেশ রায় লোকসভা উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চলেছেন তাদের প্রতীকচিহ্ন জ্বলজ্বল করছে পোস্টারগুলোতে। শুধু পোস্টার নয়, বাসস্ট্যান্ডে বেশ কয়েকটা বড় ব্যানারও চোখে পড়ল তমালের। সেই ব্যানারগুলোও লোকসভা উপনির্বাচনে একজন প্রার্থী হিসেবে শ্রীযুক্ত অপরেশ রায়ের নামই জানাচ্ছে জনসাধারণকে।..... শেষ পর্যন্ত অপরেশ স্যার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন? বিশ্বাস হচ্ছিল না যেন তমালের। যে রাজনৈতিক দলের সদস্য হিসেবে একসময় খুব কাজ করতেন অপরেশ, সেই দলের কাছ থেকেই কয়েক বছর আগে পেয়েছিলেন চরম অপমান আর লাঞ্ছনা। তীব্র অপমানবোধে এবং অভিমানে অপরেশ নিজেকে যাবতীয় রাজনৈতিক কার্যকলাপ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছিলেন। তমাল জানত সেসব। অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছিলেন অপরেশ। কিন্তু সেই প্রতিবাদ ভাল চোখে দেখেনি তাঁর রাজনৈতিক দল। প্রকাশ্যে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছিল তাঁকে। অপরেশ নিজেকেই বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিলেন তাঁর দল থেকে। কিন্তু এতদিন পর কী এমন ঘটল যে, অপরেশ আবার সেই রাজনৈতিক দলের হয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে উদ্যোগী হলেন?

বাসস্ট্যান্ডে বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল তমাল। আর ভাবছিল। ইতিমধ্যে সে কয়েকটা রবিবার অবশ্য অপরেশ স্যারের কাছে গেছে পড়াশোনা করতে। কিন্তু স্যাব তাকে ঘুণাক্ষরেও জানাননি যে তিনি লোকসভার উপনির্বাচনে একজন প্রার্থী হতে চলেছেন। নিজের খেয়ালে থাকে তমাল। স্থানীয় রাজনীতির খবর সে অতটা রাখে না। তেমন কোনও আড্ডাতেও সে যায় না যে, তার কানে খবর চলে আসবে। কিন্তু এটা কী করে সম্ভব হল? অপরেশ নিজেকে একদিন সরিয়ে নিয়েছিলেন প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে। যে রাজনৈতিক দলের কাছে তিনি চরম অপমানিত হয়েছিলেন, কয়েক বছর পর সেই দলেরই প্রার্থী হয়ে তিনি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন, এটা একেবারেই মেনে নিতে পারছিল না তমাল। তার মনের মধ্যে তোলপাড় চলছিল। তুমুল তোলপাড় চলছিল। অপরেশ স্যারকে তমাল খুব কাছ থেকে দেখেছে। নিজের জীবনে তিনি কয়েকটি আদর্শ মেনে চলতে চান। অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করেন না কোনওদিন। স্কুলের প্রায় সব শিক্ষকই প্রাইভেট টুইশানি করেন। ক্লাসের ছাত্ররা শিক্ষকদের কোচিং-এ এবেলা-ওবেলা ভিড় করে। এরকমই একজন শিক্ষক

সুবীরবাবু। যিনি রাজনীতি করেন। শিক্ষকতা করেন। আবার তাঁর কোচিং-এ ছাত্রছাত্রীদের অসম্ভব ভিড় হয়। দুবেলা ছাত্রছাত্রী পড়িয়ে সুবীরবাবু তিনতলা বাড়ি হাঁকিয়েছেন; আবার গাড়িও কিনেছেন। অপরেশ-স্যার তমালের কাছে একসময় কত সমালোচনা করেছেন। তিনি বারবার একটা কথা বলতেন, প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে কিছু আদর্শ থাকা দরকার তমাল। আদর্শ ছাড়া তুমি বাঁচবে কীভাবে? তাহলে তো রাডারহীন জাহাজের মতো জীবন এলোমেলো হয়ে যাবে। আমাদের চারপাশে এত আদর্শের বিচ্যুতি দেখে ভাল লাগে না তমাল। আমি আমার বাবাকে দেখেছি। সারাজীবন নিজের জীবনের আদর্শে অবিচল থাকতে গিয়ে অনেক ঝড়-ঝাপটা সামলাতে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু তবুও নিজের আদর্শ থেকে একচুলও সরেননি তিনি। আর আজ দেখছি অন্যরকম। জীবনধারণের পদ্ধতি কবে যেন বদলে গেছে। মানুষ অন্ধের মতো ছুটছে টাকার পেছনে, খ্যাতির পেছনে, ক্ষমতার পেছনে। শিক্ষক হিসেবেই বা আমরা কী করছি? শিক্ষকের জীবনের ব্রত হল বিদ্যাদান। ভবিষ্যতের মানুষ তৈরি কবা। কিন্তু আজকাল কজন শিক্ষক নিজের পেশাকে সেভাবে দ্যাখেন? আমার সহকর্মীদেরই অনেক আছে, যাঁরা ক্লাশে ভালভাবে পড়ান না, শুধু নিয়ম রক্ষার মতো পড়িয়ে যান। আর আভাসে-ইঙ্গিতে ছাত্রছাত্রীদের তাঁদের কোচিং-এ ভর্তি হতে বলেন। বিদ্যাদান তাঁদের উদ্দেশ্য নয়। মানুষ গড়া তাঁদের উদ্দেশ্য নয়। তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল, অর্থ উপার্জন।

এরকম অনেক কথা তমালকে শোনাতেন অপরেশ। যখন তমাল তাঁর ছাত্র ছিল। তাঁর বাড়িতে প্রায়ই যাতায়াত করত। অপরেশ তমালকে মাঝে মাঝে নিজেই উৎসাহ নিয়ে অঙ্ক এবং ইংরেজি পড়াতেন। তমালকে নানারকম বই পড়তে দিতেন। একটা বইয়ের নাম তমালের আজও মনে আছে—দুনিয়া কাঁপানো দশ দিন। সোভিয়েত রাশিয়াতে বিপ্লবী লেনিনের নেতৃত্বে শ্রমজীবী মানুষ কীভাবে জারতন্ত্রের অবসান ঘটাল তারই অপূর্ব কাহিনি। দুদিনের মধ্যে তমাল বইটি পড়ে অপরেশস্যারকে জানিয়েছিল যে ওরকম বই সে আগে পড়েনি।

রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তমালের মনে পড়ে যাচ্ছিল অনেক কথা। তখন অপরেশস্যারের খুব খারাপ সময় চলছিল। যে রাজনৈতিক দলের জন্যে তিনি অনেক সময় দিতেন; সেই দলই তাঁর প্রতি বিরূপ হয়ে পড়ল একটাই কারণে। তিনি চোখের সামনে ঘটে যাওয়া কিছু অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছিলেন বলে। স্থানীয় নেতা মোহিত চৌধুরীর বিলাসবহুল ব্যক্তিগত জীবন তাঁর পছন্দ হয়নি। মোহিত চৌধুরীর মেয়ের নাম জয়েন্ট এনট্রান্স পরীক্ষার মেধা-তালিকায় অনেক নীচের দিকে থাকলেও সে কীভাবে ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পেল বুঝতে পারেননি অপরেশ। মোহিত পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী ছিলেন। তাঁর তেমন কোনও উপার্জন ছিল না। তাঁর স্ত্রী প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষিকা ছিলেন। তবুও মোহিত চৌধুরী তাঁর মেয়ের বিবাহ-অনুষ্ঠানে যে

এলাহী আয়োজন করেছিলেন তা দেখে অপরেশ খুবই বিরক্ত হয়েছিলেন। তিনি পার্টির মিটিং-এ মোহিতের সততা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। ফলে অপ্রিয় হয়ে পড়েছিলেন সকলের। প্রকাশ্য সভায় পচা ডিম ছুড়ে অপমান করা হয়েছিল তাঁকে। অন্যান্য রাজনৈতিক সহকর্মীরা কেউ তাঁর পাশে দাঁড়ায় নি। তাঁকে সমর্থন কিংবা সহানুভূতি জানাতে এগিয়ে আসে নি। পার্টিতে তাঁর গুরুত্ব একেবারেই কমে গিয়েছিল। তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। বাড়িতে চুপচাপ একা বসে থাকতেন অপরেশ। কোথাও যেতেন না। কারোর সঙ্গে মিশতেন না তেমন। সেই সময় তমাল স্কুল শেষ করে কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র। কিন্তু অপরেশের ব্যক্তিত্বের টানে সে মাঝে মাঝে সময় করে তাঁর বাড়িতে যেত। তখন খুব দুঃসময় চলছে অপরেশের। পার্টি থেকে ঠিক বহিষ্কার হননি; কিন্তু তাঁকে সবসময়েই বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে পার্টির কাজকর্মে তাঁকে তেমন প্রয়োজন নেই; মিটিং-এ গেলে কেউ তাঁর সঙ্গে কুশল বিনিময় করছে না; মুখোমুখি হলেই এড়িয়ে যাচ্ছে; ফলে নিজের ওপর আত্মবিশ্বাস কমে যাচ্ছে অপরেশের; তিনি নিজেকে মনে করছেন এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপের একা একজন মানুষ; সেই খারাপ সময়ে তমালের খুব মন কেমন করত অপরেশ-স্যারের জন্যে। অপরেশ তখন একরাশ অস্বস্তি, হতাশা আর বিরক্তি নিয়ে বসে থাকতেন নিজের বাড়িতে। হয়তো মাঝে মাঝে পড়াশোনা করতেন। তবে বেশির ভাগ সময়েই একা একা বসে ভাবতেন কী এমন অপরাধ করলেন তিনি, যে পার্টি তাঁকে এতবড় শাস্তি দিল? তিনি যা করেছিলেন তাকে কি অপরাধ বলে? একজন নেতা ক্রমশ দুর্নীতির নোংরা এবং জটিল জালে জড়িয়ে পড়ছিলেন। সমাজবিরোধীদের সঙ্গে ওঠাবসা শুরু করেছিলেন। সেই নেতার জীবনযাপনে দৃষ্টিকটু পরিবর্তন এসেছিল তাঁর জীবনযাপনের পদ্ধতি দেখলেই বোঝা যেত তাঁর অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে জীবনযাত্রার মধ্যে এক বড় ফাঁক থেকে যাচ্ছে। নিজে দুর্নীতি সহ্য করতে পারেন না, দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেন না; তাই অপরেশ ভেবেছিলেন নেতা মোহিত চৌধুরীর বিলাসবহুল জীবনযাত্রার ব্যাপারে প্রকাশ্য সভায় অন্যান্য সদস্যদের উপস্থিতিতে একটু হৈ-চৈ করা দরকার. অপরেশ ভেবেছিলেন, পার্টির মঙ্গল করছেন তিনি। জনসমক্ষে পার্টির ভাবমূর্তি যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেই চেষ্টাই করছেন। কিন্তু ফল তো হল উলটো অপরেশকেই হেনস্তা হতে হয়েছিল। অপমানিত হতে হয়েছিল। ক্ষোভে, দুঃখে অভিমানে তিনি পার্টির সঙ্গে আর সম্পর্কই রাখতে চাননি। বারবার অপমানিত হতে তাঁর আত্মসম্মানে লাগত।

সেইসময় একদিন (রবিবার বোধহয়) তমাল গিয়েছিল তার স্যারের বাড়িতে তমাল তখন কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র। তাকে বিশ্বাস করে অপরেশ অনেক কথা বলেছিলেন। তার কিছু কথা তমালের আজও মনে আছে। চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে অপরেশ স্যারের হাসিমুখের ছবিসহ পোস্টারগুলোর দিকে তাকিয়েছিল

তমাল। স্যারের কথাগুলো তার মনে পড়ছিল।

অপরেশ-স্যার বলেছিলেন—জানো তো তমাল এখন সততার কোনও দাম নেই। সততা দেখাতে গিয়েই আমার এই অবস্থা। আমাকে অপমান করে পার্টি বুঝিয়ে দিল যে, প্রকাশ্যে মোহিত চৌধুরীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে আমি আসলে ভুল করেছি। মোহিত চৌধুরীর উপরের স্তরের নেতারা আমার এই হঠকারিতা ভাল চোখে নেয়নি।

--হঠকারিতা বলছেন কেন স্যার? আপনি তো ঠিকই করেছেন। অন্যায়কে অন্যায় বলা যাবে না? —উত্তেজিতভাবে জিজ্ঞেস করেছিল তমাল।

—আমি যেভাবে বলেছি সেভাবে হয়ত বলা যাবে না। প্রকাশ্যে, সকলের সামনে মোহিত চৌধুরীর নিন্দে করে আমি হয়ত অন্যান্য নেতাদের চটিয়ে দিয়েছি। আর তাছাড়া....

—তাছাড়া কি স্যার?

—অন্যায়ের সংজ্ঞাটাই হয়ত এখন পালটে গেছে। এখন একটা কথা প্রায়ই শুনতে পাই আমরা। পেশাদারী মনোভাব। প্রফেশনাল অ্যাটিটিউড। হয়তো আমার মধ্যে সেটার অভাব। সত্যিই হয়ত অভাব। মূল্যবোধ, সততা এসব কথা আজকাল বোধহয় কেউ শুনতে চায় না। এসব নিয়ে বেশি বলতে গিয়েই হয়ত নিজের বিপদ ডেকে আনলুম আমি। —অপরেশের স্বরে তীব্র হতাশা ছিল। তমাল জিজ্ঞেস করেছিল—তাহ'লে স্যার এখন আপনি কী করবেন? আপনার পার্টি অফিসে কী যাবেন না আপনি। নেতা, সাধারণ কর্মী কারোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন না?

—নিজে থেকে আমি আর আমার পার্টি-অফিস মাড়াব না। যাদের সঙ্গে এতকাল কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মানুষের জন্যে কাজ করেছি; তাদের কারোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখব না। আমাকে যদি ওদের প্রয়োজন হয় ওরাই যোগাযোগ কববে। তখন দেখা যাবে।..... তবে দেখা আর কী যাবে? আমি অনেকদিন থেকে অনেকের কার্যকলাপ লক্ষ্য করে যাচ্ছি। মোহিত চৌধুরী একা নয়। নেতাদের মধ্যে অনেকেই আজকাল নানা দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত। সাধারণ কর্মীদের মধ্যেও অনেকে সেরকমই। তাদের সঙ্গে আমি পা মিলিয়ে চলতে পারব না তমাল।

—তাহলে আপনি খুব একা হয়ে যাবেন না স্যার? এতকাল রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কী ভাল বক্তা আপনি! আপনার বক্তৃতা শুনতে মিটিং-এ কত ভিড় হত! আমি তো আপনাদের পার্টির মধ্যে নেই স্যার। শুধু আপনার বক্তৃতা শুনতে আমি ঐ সব মিটিং-এ যেতুম। পাবলিক লাইফে বরাবর অভ্যস্ত আপনি। সেই জীবন ছেড়ে একা একা বাড়িতে বসে থাকতে ভাল লাগবে?

তমালের প্রশ্ন শুনে অপরেশ কিছুক্ষণ চুপ করে ছিলেন। তারপর ম্লান হেসে বলেছিলেন—সময় কাটাবার অনেক উপায় আছে তমাল। তার জন্যে আমার এতটুকু

দুশ্চিন্তা নেই। এতদিন ব্যস্ততা ছিল খুব। রাজনীতি আমার সময়ের অনেকটাই দখল করে নিত। এখন আমার হাতে অনেক সময় থাকবে। কত বই জমে আছে। উলটে দেখা হয়নি। পড়াও হয়নি। এখন সেসব বই পড়তে হবে। স্কুলের চাকরি, সংসার, পড়াশোনা আর মাঝেমাঝে একটু-আধটু লেখালেখি। এভাবেই সময় কাটাব আমি। মানুষকে অপমান করা যায়। সাময়িকভাবে পরাজিতও করা যায়। কিন্তু মানুষকে ধ্বংস করে ফেলা যায় না। আমি ধ্বংস হব না তমাল। আমার আত্মায় কোনওদিন ময়লা পড়তে দেব না। ওরা আমাকে যতই হেনস্থা করতে চেষ্টা করুক, আমার ওপর চাপ সৃষ্টি করুক, আমি ওদের সঙ্গে হাত মেলাতে যাব না। দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেব না। অপরেশের সেইসব কথা আজ মনে পড়ল তমালের। সে বুঝতে পারছিল না কীভাবে এত পালটে গেলেন অপরেশ; যে তিনি পার্টির মনোনীত প্রার্থী হয়ে লোকসভা উপনির্বাচনে দাঁড়িয়ে পড়লেন! খুবই আবেগপ্রবণ ছেলে তমাল। অল্পতেই সে উত্তেজিত হয়ে পড়ে। তার মনে কোনও প্রশ্ন জাগলে সে তখনই তার ফয়সালা চায়। ইন্দ্রানীর বাড়িতে যাবার জন্যে বেরিয়েছিল তমাল। খুকুর জন্মদিন উপলক্ষে ইন্দ্রানী তাকে সকালে খাবার নিমন্ত্রণ করেছিলেন। তমাল ভেবেছিল সে ভেবেচিন্তে খুকুর জন্যে একটা প্রেজেন্টটেশান কিনে নিয়ে যাবে। কিন্তু রাস্তায় বেরিয়ে দেয়ালে অপরেশের পোস্টার দেখে সব কীরকম গন্ডগোল হয়ে গেল তমালের। তার মনে পড়ল গত দু-মাস সে কোনও রবিবারেই অপরেশ-স্যারকে বাড়িতে পায়নি। রবিবার সকালে সে অঙ্ক আর ইংরিজির তালিম নিতে যেত স্যারের কাছে। কিন্তু গত কয়েকটা রবিবারেই সে অপরেশের কাছে গিয়ে ফিরে এসেছে। অপরেশের স্ত্রী তাকে প্রতিবারই জানিয়েছেন যে অপরেশ বাড়ি নেই। জরুরি কাজে বাইরে গেছেন। কখন ফিরবেন ঠিক নেই। দু-একবার ফোনে অপরেশের সঙ্গে কথা বলেছে তমাল। জিজ্ঞেস করেছে সে পরের রবিবার পড়তে যাবে কিনা। অপরেশ সংক্ষেপে জানিয়েছেন, পরের রবিবারেও তিনি ব্যস্ত আছেন। এখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে সেসব কথাও মনে পড়ল তমালের। তার মনে হ'ল আজ এখনই অপরেশের সঙ্গে কথা বলতে চায়। এখনই। ইন্দ্রানীর বাড়ি যাবার কথা ভুলে অপরেশের বাড়ির দিকে দ্রুত পা চালিয়ে দিল তমাল।

আজকে দরজা খুললেন অপরেশই। এখন সকাল আটটা। আজ তো ছুটির দিন নয়। স্কুলে যেতে হবে। তাই অপরেশ বোধহয় দাড়ি কামাচ্ছিলেন। তাঁর একগালে কিছুটা সাবান। হাতে শেভিং-ব্রাশ। তাতে সাবানের ফেনা। তমালের একটু অস্বস্তি হচ্ছিল। অপরেশ দরজা খুলে জিজ্ঞেস করলেন—কী ব্যাপার? তুমি? এরকম অসময়ে?

—আমি আজ পড়তে আসিনি স্যার।

—আজকে পড়তে আসার কথাও নয়। আমাকে তো স্কুলে যেতে হবে।

—জানি স্যার। শুধু একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছি।

—কী কথা?

—বাইরে দাঁড়িয়েই কথা বলব স্যার? বাড়ির ভেতরে যাওয়া যাবে না?

—এখন তো কথা বলার সময় নেই তমাল। তুমি বড় অসময়ে এসেছ। সবে দাড়ি কামাচ্ছি। তারপর চান। খাওয়াদাওয়া। সব ঘড়ি ধরে।

—জানি স্যার অসময়ে এসেছি। তবুও এলুম। শুধু একটা কথা?

—কী কথা? —অপরেশের মুখে বিরক্তি ফুটে উঠল। —আচ্ছা ভেতরে এসো.....।

তমাল বাড়ির ভেতরে ঢুকে এল। বাইরের ঘরে সোফায় বসল। অপরেশ দাঁড়িয়ে আছেন। হাতে শেভিং ব্রাশ। এক গালে সাবান শুকিয়ে এসেছে। আবার জিজ্ঞেস করলেন—বল তমাল, কী এমন জরুরি কথা?

—আপনি স্যার ভোটে দাঁড়াচ্ছেন? দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার.....

—ওহ্—হাসলেন অপরেশ। —চোখে পড়েছে তোমার? তা তো পড়বেই। গতকাল থেকে ওরা প্রচারের কাজ জোরদার শুরু করেছে।

—ওর মানে কারা স্যার?

—কেন? তুমি কি পোস্টারে প্রতীক চিহ্ন দেখোনি?

—দেখেছি স্যার। একটা রাজনৈতিক দল।

—আমি তো ঐ দলের রাজনীতিই করি। তুমি জানো না?

—করি বলছেন কেন স্যার? ঐ দল তো আপনি একসময় করতেন। আপনাকে ওরা অপমান করেছিল.....।

—পুরনো কথা আর তোলার দরকার নেই তমাল। —গম্ভীরভাবে বললেন অপরেশ। —এখন সামনের দিকে তাকাতে হবে।

—অপমানের কথা সব ভুলে গেলেন স্যার?

—ভুলব কেন? যা হয়েছিল তার জন্যে পার্টি আমার কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছে।

—আপনি ঐ দলের প্রতীকে একেবারে ভোটে দাঁড়িয়ে যাবেন এটা আমার ধারণায় ছিল না।

—দেখো তমাল। আমি রাজনীতি করা মানুষ। রাজনীতি ছাড়া আমি থাকতে পারব না। একজন এম.পি. হয়ে সমাজের এবং মানুষের কত উপকার করা যায় জানো?

—আমি ভাবতেই পারছি না স্যার যে আপনি আপনার অপমানের কথা এত তাড়াতাড়ি ভুলে যাবেন। আপনি ওদের সঙ্গে হাত মেলাবেন.....।

—হাত মেলানো-টেলানো কী আজেবাজে কথা বলছ তুমি? আমি কেন ভোটে দাঁড়িয়েছি সে ব্যাপারে তোমাকে কৈফিয়ত দিতে হবে নাকি? তুমি এখন যাও।

আমার স্কুল যাবার তাড়া আছে। —অপরেশ কীরকম রুক্ষভাবে বললেন। তমাল তাকিয়ে ছিল অপরেশের দিকে। এ কোন্ অপরেশকে দেখছে সে? ইনি কি তার অপরেশ স্যার?..... রাগ, দুঃখ সব যেন একসঙ্গে বিভ্রান্ত করছিল তমালকে। সে অপরেশের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। হাঁটতে লাগল জোরে। তার মনে পড়ে গেছে ইন্দ্রানী তার জন্যে অপেক্ষা করছেন। আজ খুকুর জন্মদিন.....। যে বাসে ইন্দ্রানীর বাড়ি যাবে সেই বাসই আগুয়ান। হাত দেখাল তমাল। বাস থামল। সে উঠে পড়ল।

১৮

ইন্দ্রানীর বাড়ি পৌঁছতে প্রায় বেলা এগারোটা হয়ে গেল। তমালের অপেক্ষাতেই ছিলেন তিনি। দরজা খুলে দিয়েই জিজ্ঞেস করলেন—এত দেরি হল কেন তমাল? আমি আশা করেছিলুম তুমি আরও সকালে আসবে। ব্রেকফাস্ট করবে আমাদের সঙ্গে। অপেক্ষা করে করে আমি কিচেনে ঢুকলুম। রান্নার দেরি হয়ে যাবে।

—একটু দেরি হয়ে গেল মাসিমা।

--স্থির হয়ে বোসো। জল খাবার দি।

—এত বেলায় জলখাবার?

—ওমা সে কি? কিছু খাবে না? ভাত খাবার দেরি আছে। খুকুকে কীরকম সাজিয়েছি দেখো।

তমাল দেখল। বিছানায় শুয়ে আছে যে মেয়ে, কোমর থেকে পা অব্দি অসাড়, কথা বলতে পারে না; তাকেও তার জন্মদিনে পরম যত্নে সাজিয়ে দিয়েছেন ইন্দ্রানী। খুকুকে বেশ ফুটফুটে লাগছে। ওর বালকসুলভ চুল আঁচড়ে দিয়েছেন। একটা নতুন ম্যাক্সি জাতীয় পোশাক পরিয়েছেন। কোমর অব্দি চাদর ঢাকা খুকুর শরীর। চাদরটিও মনে হল নতুন। খুকুর ফর্সা এবং ছোট্ট কপালে একটা টিপ। মেরুন রং, গোল টিপ। খুকুকে দেখতে বেশ লাগছে। আজ আর খুকু বিছানায় শুয়ে ঝিমোচ্ছে না। জেগে আছে সে। তাকিয়ে দেখছে এদিক ওদিক। তমালকেও দেখল। তমালের আজও মনে হ'ল, তাকে দেখে খুকু ঠিক চিনতে পেরেছে। মায়াময় এক ছায়া যেন ঘনিয়ে এল তার দুই সুন্দর চোখে। খুকুর বিছানার পাশে একটা চেয়ার। তমাল বসল তাতে। ইন্দ্রানী কিচেনে গেলেন তার জলখাবারের ব্যবস্থা করতে। তমাল খুকুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল—কেমন আছো খুকু? কথা বলতে পারে না খুকু। সে বড় বড় দুই চোখে তাকিয়ে আছে তমালের দিকে। পাতলা, ফিনফিনে কিন্তু চাপা দুই ঠোঁটে যেন একটু হাসির রেখা। খুকু মুখ দিয়ে কী যেন ইঙ্গিত করছে। তার মুখ থেকে বের হচ্ছে ধ্বনি—জ-জ-জ-জ। কী বলতে চাইছে খুকু?

কীরকম উদ্বেলিত মনে হচ্ছে খুকুকে। তমাল এসেছে বলে সে আনন্দিত? না কি জন্মদিনে নতুন পোশাক পেয়ে খুকুর মনে স্ফূর্তি? জ—জ—জ—জ—খুকু কিছু একটা বলার চেষ্টা করছে। তমাল জিজ্ঞেস করল—কিছু বলতে চাও খুকু? —জ—জ—জ—জ.....! —তমাল কিছু বুঝল না। ইন্দ্রানী ঢুকলেন। হাতে ট্রে। ট্রেতে খাবারের প্লেট, জলের গ্লাস।

—মাসিমা খুকু কী বলতে চাইছে?

—আমিও ঠিক বুঝছি না। আজ সকাল থেকেই ও এরকম আওয়াজ বের করছে মুখ দিয়ে। আগে এরকম করেনি। এটা ওর আনন্দের প্রকাশ বলতে পারো।

—আনন্দ?

—বাহ আনন্দ নয় তো কী? ও নিশ্চয়ই বুঝেছে আজ ওর জন্মদিন। তাই ওর মনে এত আনন্দ! —ইন্দ্রানী বললেন। .....আজকের দিনে যদি সুহাস থাকত। আজ সারাদিন সুহাসের কথাও মনে পড়ছে বড়। —ইন্দ্রানী বললেন। তমাল তাকাল তাঁর দিকে। কাঁদছেন না ইন্দ্রানী। শুধু তাঁর মুখে ছড়িয়ে আছে বিষণ্ণতা। ইন্দ্রানীকে দেখে তমাল বুঝতে পারে জীবনের যন্ত্রণা সহ্য করতে জানতে হয়। স্বামী হারিয়েছেন ইন্দ্রানী। পুত্র হারিয়েছেন। এত সুন্দর খুকু প্রতিবন্ধী। কোনও কোনও মানুষকে এত দুঃখ পেতে হয় কেন? জীবনে দুঃখ ভোগ করারও তো একটা সীমা থাকবে। জীবন এত আঘাত দিয়েছে ইন্দ্রানীকে। তবুও তিনি জীবনকে আঁকড়ে ধরে আছেন। হেরে যাননি। নুয়ে পড়েননি। সব আঘাত সহ্য করে খুকুকে নিয়ে বাঁচতে চাইছেন। ইন্দ্রানীকে যত দেখে ততই অবাক হয় তমাল। দুঃখকে হাসিমুখে কীভাবে গ্রহণ করতে হয় তা ইন্দ্রানীকে দেখে বোঝা যায়।

কোনও ওজর-আপত্তি টিকল না তমালের। ইন্দ্রানীর দেওয়া সব মিষ্টি খেতে হল তাকে। বেশ গোটা গোটা নধর এবং নিটোল কাজুবাদাম দিয়েছেন ইন্দ্রানী। কাজুবাদাম তার খুব প্রিয়। সে সব খেয়ে নিল। কিছুক্ষণ বসে একথা সেকথার পর ইন্দ্রানী বললেন—তুমি খুকুর কাছে বোসো তমাল। কথা বলো। আমি তো ওর সঙ্গে কথা বলি।

—কথা বললে তো ও বুঝবে না কাকিমা?

—কে বলল বুঝবে না? খুকু সব বুঝবে। শুধু ও নিজে কিছু বলতে পারবে না। কিন্তু ওর তাকানো দেখেই তুমি বুঝতে পারবে ও তোমার কথা বুঝতে পারছে।

—এটা কীভাবে হবে কাকিমা? ও কি শুনতে পায়?

—সবসময় কার্যকারণসূত্র খুঁজতে চেয়ো না তমাল। জীবনের সবকিছু যুক্তি দিয়ে বোঝা যায় না। বিশ্লেষণ করা যায় না। এই পৃথিবীতে সব থেকে রহস্যময় হল প্রাণ.....জীবন.....। তুমি ওর কাছে বোসো তমাল। আমি রান্নাটা সেরে ফেলি। তুমি খুকুর কাছে থাকো। তাইশে আমি নিশ্চিন্তে রান্না সারতে পারি। ভেটকি মাছ এনেছি।

আর গলদা চিংড়ি। দুটো মাছই তোমার খুব প্রিয় আমি জানি।

—কী ভাবে জানলেন কাকিমা?

—তুমিই তো একদিন বলেছিলে। —ইন্দ্রানী হাসলেন।

কিচেনে ইন্দ্রানী। রান্না করছেন। তমাল খুকুর কপালে হাত রাখল। —খুকু? —সে ডাকল। খুকু দেখছে তাকে। যেন কিছু বলতে চাইছে।

—কি বলতে চাইছ খুকু?

—জে—জে—জে—জে—।

তমাল মনে মনে একটা খেলা শুরু করল। বিজনে নিজের সঙ্গে এই খেলাটা সে খেলে থাকে মাঝে মাঝে। যাদের সে পছন্দ করে তাদের কারো কারো সঙ্গে সে একা একা কথা বলে। এ তার বিচিত্র তৃপ্তি। বিচিত্র আনন্দ। খুকু তাকিয়ে আছে। জে.....জে.....জে.....জে.....। কিছু বলতে চাইছে?

—কী বলবে খুকু?

—তুমি খুব সুন্দর।

—আমি?

—হ্যাঁ। তুমি খুব ভাল। তুমি খুব সরল তমাল। তোমাকে আমি খুব পছন্দ করি।

—আমাকে পছন্দ করো?

—হ্যাঁ। তুমি বুঝতে পারো না? আসলে আমি তো কথা বলতে পারি না.....।

—তুমিও খুব সুন্দর খুকু।

—আমি তো অসুস্থ। সারাদিন শুধু শুয়ে থাকি। আমার জীবনের কী দাম আছে বলো?

—সব জীবনেরই দাম আছে। প্রত্যেক জীবনের দাম আছে। তোমাকে দেখলে আমার মনে হয় জীবন সুন্দর। বেঁচে থাকা সুন্দর।

—সত্যি বলছ আমাকে দেখে তোমার এসব মনে হয়?

—সত্যি বলছি।

—তুমি আমাকে ভালবাসবে তমাল?

—আমি তোমাকে ভালবাসি খুকু।

—খুউব ভালবাস?

—খুউব।

—তাহলে সেটা বোঝাও। আমি তো বুঝতে পারি না।

—কীভাবে বোঝাব বলো তো খুকু?

—বলব কেন? তোমার ভালবাসা বোঝাবার দায় তো তোমারই। তমাল প্রমাদ গোনে। কীভাবে খুকুকে সে বোঝাবে তার ভালবাসা? কীভাবে? কী করলে খুকু

বুঝবে তমাল তাকে ভালবাসে? এরকম যখন ভাবছে তমাল তখন হঠাৎ সে দেখে দুই হাত উঁচু করে খুকু যেন কী বোঝাতে চাইছে। খুকুর আঙুল ঘুরছে তার নিজেরই ঠোঁটে।..... কি বলতে চাইছ খুকু? তমাল নীচু হয়ে জানতে চায়। আর ঠিক সেই মুহূর্তে খুকুর দুই শীর্ণ হাত তমালের গাল ছোঁয়! তমাল অনুভব করে খুকু যেন তাকে মৃদু টানছে! তমাল এগিয়ে দেয় তার মুখ। খুকুর ঠোঁটে সে আলতো ছোঁয়ায় তার ঠোঁট। খুকু পরম আবেশে চোখ মুদে ফেলে। খুকুর ঠোঁট ভিজে-ভিজে। সেই ঠোঁটে অতল সমুদ্রের গভীরে জলজ উদ্ভিদের গন্ধ! তমাল মন-প্রাণ ঢেলে খুকুকে চুম্বন করে। তার মনে হয় সে কুয়াশার ভেতর দিয়ে অনেক দূরে কোথাও হারিয়ে যাচ্ছে.....!

—জে—জে—জে—জে.....খুকু কিছু বলতে চাইছে। ঠিক সেই মুহূর্তে তমালের সম্বিত ফেরে। সে এতক্ষণ নিজের ভেতরেই কথা বলছিল। খুকু তার মনের গভীরে জায়গা করে নিয়েছে। তাই সে এতক্ষণ মনে মনে খুকুর সঙ্গে কথা বলছিল। খুকুকে চুম্বন করেছে তমাল। ভালবাসার চুম্বন। তমাল আবার তাকিয়ে দেখল খুকুকে। কী ইশারা করছে খুকু? সে কি তমালের মনের কথা বুঝতে পেরেছে? জে—জে—জে—জে—জে—।

—কী বলতে চাইছ খুকু? —তমাল এবার সত্যিই খুকুর দিকে ঝুঁকে আসে। তারপর সত্যিই চুম্বন করে খুকুকে। সত্যিই খুকুর ঠোঁট ভিজে-ভিজে। সত্যিই সেই ঠোঁটে অতল সমুদ্রের গভীরে জলজ উদ্ভিদের গন্ধ! খুকু বুজিয়ে ফেলেছে চোখ। তমালের লজ্জা করল। যদি ইন্দ্রানী এসে যান। সে তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিল তার ঠোঁট। সোজা হয়ে বসল। খুকু আবার দেখছে তমালকে। সেই দৃষ্টিতে ভালবাসা। তমালের সারা শরীরে রোমাঞ্চ জাগল!

ইন্দ্রানী এলেন ঘরে। জানালেন রান্না হয়ে গেছে। তারপর খাওয়াদাওয়ার পাট শুরু হল। প্রথমে খুকুকে খাওয়ানো হল। তমাল খাইয়ে দিল খুকুকে। মাছ খেল খুকু। ভাত খেল। পায়েস খেল। লক্ষ্মী মেয়ের মতো। ইন্দ্রানী খুব খুশি। এত ভাল মেজাজে তিনি খুকুকে অনেকদিন দেখেননি। বারবার ইন্দ্রানীর মনে হচ্ছিল, তমালকে খুকু খুবই পছন্দ করছে আজকাল। খুকু কি ক্রমশ ভাল হয়ে উঠবে? ইন্দ্রানী ভাবলেন। তমালের সঙ্গ পেলে খুকু খুব আনন্দে থাকে। এটা তিনি লক্ষ্য করেছেন। যদি খুকুর মনে আনন্দ থাকে তাহলে ও হয়ত একদিন কিছুটা ভাল হয়ে উঠতে পারে। একটা স্বপ্ন দেখার সুযোগ এল ইন্দ্রানীর নিঃসঙ্গ জীবনে।

দুপুরবেলার দিকে তমাল বেরিয়ে পড়ল। খুকু তখন গভীর ঘুমে মগ্ন। ইন্দ্রানী তাকে বলেছিলেন আরও কিছুক্ষণ থাকতে। তমাল যতক্ষণ এ বাড়িতে থাকে ততক্ষণই আনন্দে ছেয়ে থাকে বাড়ি। খুকুও আনন্দে থাকে। কিন্তু তমালের আসলে অন্য একটা ইচ্ছে হল। আজ খুকুর জন্মদিন। অথচ সে শুধু হাতে এ বাড়িতে

এল। একটা উপহার নিয়ে আসা উচিত ছিল। যাহোক কিছু একটা উপহার। সকালে অপরেশস্যারের বাড়িতে গিয়ে সব গোলমাল হয়ে গেল। চিন্তাভাবনা সব ওলোটপালোট হয়ে গেল। অপরেশস্যারের নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ব্যাপারটা তমালের কাছে প্রথমে অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল। তার খুব শ্রদ্ধা ছিল অপরেশস্যারের প্রতি। তাঁর আদর্শের প্রতি তাঁর মূল্যবোধের প্রতি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে যে, অপরেশস্যারও কি অন্য অনেকের মতন? তমাল যেমন ভেবেছিল উনি কী সেরকম নন?

ভাবতে ভাবতে তমালের মনে পড়ল সুহাসের ডায়েরির কথা। নিজের ডায়েরিতে সুহাস লিখেছিল একটা অদ্ভুত ল্যাম্পের কথা। বৈদ্যুতিক ল্যাম্প। যা দেখতে একঝাঁক ফুলের মতন। সেই ফুলগুলো আসলে এক একটা টুনিবালব। অন্ধকার ঘরে জ্বালিয়ে দিলে মনে হবে আলোর অপরূপ ফুল ফুটে আছে। সেই আলো সুহাস চাঁদনি চকের কোনও দোকান থেকে কিনেছিল। সেই আলোর ফুল দেখে খুকু খুব আনন্দ পেত। দুর্ভাগ্যবশত বৈদ্যুতিক ল্যাম্পটা একদিন ভেঙে যায়। আর কেনা হয়নি সেই ল্যাম্প। তমালের মনে হ'ল বিকেলের দিকে সে চাঁদনি চক অঞ্চলে যাবে। খোঁজ করবে সেই আশ্চর্য ল্যাম্পের। খুকু খুব আনন্দ পাবে একরাশ আলোর ফুল দেখে। খুকুকে আনন্দ দেওয়াই তার একমাত্র কাজ।

—আবার কবে আসবে তমাল? তুমি এলে মেয়েটা খুব আনন্দ পায়।

—আসব মাসিমা। তাড়াতাড়ি আসব। —তমাল রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল!.....

জিনিসপত্র কিনতে চাঁদনি চকে কোনওদিন আসেনি তমাল। তবে চাঁদনি চক জায়গাটা সে চেনে। ধর্মতলায় নেমে লেনিন সরণি ধরে কিছুটা হাঁটলেই পরপর দোকান। ইলেকট্রিক সরঞ্জামের দোকানই বেশি। কয়েকটা দোকান বেশ বড় বড়। তমাল এরকমই একটা বড় দোকানে ঢুকে জিজ্ঞেস করল—আচ্ছা, রাতে ঘরে আলো হবে। দেখলে মনে হবে গাছে ঝাঁকঝাঁক ফুল ফুটে আছে। এরকম কোনও নাইট ল্যাম্প পাওয়া যাবে? বিক্রেতা অনেকরকম নাইট-ল্যাম্প দেখাল। কিন্তু কোনওটাই তমাল যেরকম খুঁজছে সেরকম নয়। পরপর বেশ কয়েকটা দোকান ঘুরল সে। অনেকরকম আলো দেখল। কিন্তু গাছে ফুল ফুটে আছে সেরকম ল্যাম্প কোথায়। তমালের মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেল। খুকুর জন্মদিনে সে একটা মনের মতো জিনিস তাকে দিতে পারবে না? একজন বিক্রেতা অবশ্য তাকে একটা হদিশ দিল। সে বলল—আপনি কীরকম ল্যাম্প খুঁজছেন বুঝতে পেরেছি। আমার কাছে কিছুদিন আগেও দু-তিন পিস ছিল। বিক্রি হয়ে গেছে। জিনিসটা সত্যিই বেশ অন্য ধরনের। অন্ধকার ঘরে জ্বাললে ঘ্যাম দেখায়। সত্যিই মনে হয় একটা গাছে ফুল ফুটে আছে। এই বাজারে আমিই একমাত্র বিক্রি করতুম ও জিনিস। এখানে আর কারোর কাছে ও মাল পাওয়া যাবে না। তবে পার্ক স্ট্রিটে কয়েকটা ইলেকট্রিক গুড্‌সের দোকান

আছে। সেখানে ট্রাই করে দেখতে পারেন।

—পার্ক স্ট্রিটে পাবো বলছেন?

—একবার অ্যাটেমপট্ নিয়ে দেখুন না.....।

এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনের পরই পার্ক স্ট্রিটে স্টেশন। মেট্রো রেলে পনেরো মিনিটে চলে এল তমাল। এত সময়ও হয়ত লাগত না। কিন্তু টিকিট-কাউন্টারে লম্বা কিউ থাকায় সেখানে কিছুক্ষণ দেরি হল। পার্ক স্ট্রিটেও কয়েকটা দোকানে জিগ্যেস করে জিনিসটা পেল না তমাল। একটা দোকানের বিক্রেতা বলল—কয়েক পিস্ ছিল। কিছুদিন আগে শেষ হয়ে গেছে। অর্ডার প্লেস করলে এনে দিতে পারি। অগত্যা কী আর করে তমাল। সে অর্ডার দিল। দুশ ষাট টাকা দাম ল্যাম্পটার। একশো টাকা অ্যাডভান্স দিতে হল। এক সপ্তাহ বাদে দোকানে এসে খোঁজ নিতে হবে। অ্যাডভানসের রসিদ নিজের মানিব্যাগের খোপে সযত্নে রেখে দিল তমাল।..... এবার কী করবে? কী আর। বাড়ির রাস্তা ধরবে। চওড়া এবং বেশ ঝকঝকে ফুটপাত ধরে হাঁটছে তমাল। পরপর বার-কাম-রেঁস্তোরা। খানিক তফাতে এরকম বার-কাম রেঁস্তোরার সামনে একটা ট্যাক্সি এসে থামল। নিজের চোখকে বিশ্বাস হচ্ছিল না তমালের। ট্যাক্সি থেকে নামছে,— (সত্যিই ঠিক দেখছে তো তমাল?) —তার বাবা। একা নয়। বাবার সঙ্গে একজন মহিলাও ঐ একই ট্যাক্সি থেকে নামল। তমাল হাঁটা থামিয়ে ভাল করে দেখছিল। কোনও ভুল নেই। বাবা! গতকাল ঘি-রং ট্রাউজার এবং আকাশ-নীল ফুলশার্ট পরে অফিস বেরিয়ে গিয়েছিল বাবা; সেই একই পোশাক পরনে। ট্যাক্সির ভাড়া মেটাচ্ছে বাবা। বাবার সঙ্গে যে মহিলা নামল তার বেশভূষা বেশ উগ্র ধরনের। জিনস্ ট্রাউজার আর সাদা টপ পরনে। কাঁধে একটা চামড়ার ব্যাগ। ঘাড় অব্দি ঢেউ-খেলানো চুল। ঠোঁটে গাঢ় লিপস্টিক। কপালে গোল টিপ। পায়ে হাই-হিল জুতো। মহিলা আনমনে একবার যেন তমালের দিকে তাকাল। তমাল চমকে উঠল। পাশ দিয়ে পথচারীরা হেঁটে যাচ্ছে। তাদের কারো একজনের আড়ালে যেতে চাইল তমাল। তার মনে হ'ল, এখুনই লুকিয়ে পড়া উচিত। এখন বাবা যদি তাকে দেখতে পায় তাহলে তারই খারাপ লাগবে বেশি। কিন্তু নিজেকে আড়ালে সরিয়ে নেবার দরকার হল না তমালের। সেই মহিলার সঙ্গে বাবা সামনের বার-কাম রেঁস্তোরায় ঢুকে গেল। তমাল একটু তফাত থেকে বড় সাইনবোর্ডটা পড়ল। ঐ রেঁস্তোরার নাম— ম্যাগনোলিয়া।

কয়েক মিনিট তমাল হাঁটতেই পারল না। তার দুটো হাঁটু কীরকম যেন দুর্বল লাগছিল। বাবার তো এখন কলকাতায় থাকার কথা নয়। মা যা বলেছিল আবার মনে করল তমাল। হঠাৎ জরুরি মিটিং পড়ে যাওয়ার জন্যে বাবা নাকি গতকাল বিকেলের ফ্লাইটে দিল্লি গেছে। আজকে বিকেলের ফ্লাইটে ফিরবে। কিন্তু এখন তো বিকেল চারটে। তাহলে কী বাবা দিল্লি যায়নি? কোথায় গিয়েছিল? রাতে তো বাড়ি

ফেরেনি বাবা। তাহলে কোথায় ছিল? সঙ্গের মহিলাটি কে? বাবা যে ঐ মহিলার সঙ্গে মেলামেশা করে সেটা কি মা জানে? চিন্তাভাবনা কীরকম গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল তমালের। এটা কী দেখল সে? বাবা কী তাহ'লে গোপনে ঐ মহিলার সঙ্গে.....। হাত দুটো ঠান্ডা লাগছিল তমালের। কপালে ঘামের অনুভব। অনেকটা হেঁটে সে কার্জন পার্কে এল। অনেকেই শুয়ে-বসে আছে পার্কের ঘাসে। এদিক-ওদিক নানা ভেন্ডাররা ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঘন ঘাস দেখে তমাল প্রথমে বসে পড়ল। তারপর শুয়ে পড়ল।

শুয়ে কি ঘুমিয়ে পড়েছিল তমাল? যখন চোখ খুলে ধড়মড় করে উঠে বসল তখন অন্ধকার নেমে এসেছে। দূরে—স্কাইলাইন জুড়ে নিওন আলোর সাইনবোর্ডগুলোর উজ্জ্বল আলোর আভাস যেন ভাসছে কার্জন পার্কের ঘাসে। আশেপাশে কেউ নেই। তমালের হঠাৎ খুব একা লাগল। সে নিজের শরীরটাকে টেনে তুলে এগিয়ে যাচ্ছিল। আশেপাশে ছায়ামূর্তির মতো কারা যেন ঘোরাফেরা করছে। কারা ওরা? ঘাসের নরম পায়ে লাগছে। কিন্তু তমাল কিছুই যেন অনুভব করছে না। কার্জন পার্কের বাইরে যাবে বলে সে হাঁটছিল। হঠাৎ এক চড়া সাজসজ্জার মহিলা তার সামনে এসে কর্কশ স্বরে জিজ্ঞেস করল—যাবেন ভাই?

তমালের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল—কোথায় যাব?

—কোথায় যাবেন?..... খিলখিল হাসল মহিলা। তারপর কোমর দুলিয়ে বলল—নরকের গুহায়।

কীরকম ভয়ের শিহরন তমালের সারা শরীরে। সে হঠাৎ ছুটতে লাগল। শহিদ মিনারের দিকে। তমাল শুনতে পাচ্ছিল মেয়েটা আর হাসছে না। কীরকম আর্তনাদের স্বরে বলছিল—সারা দিন ঘুরছি। কাউকে পাইনি। বাড়ি ফেরার পয়সাও নেই। চলুন না ভাই। বেশি দিতে হবে না। পনেরো টাকা দেবেন। আচ্ছা নাহয় দশ.....। আর শুনতে চাইছিল না তমাল। সে ঊর্ধ্বশ্বাসে বাসস্ট্যান্ডের দিকে ছুটছিল।.....

বাড়ি ফিরতে বেশ রাত হল তমালের। শৈবাল তার জন্যে অপেক্ষা করছিল। সে সন্ধে নাগাদ বাড়ি ফিরেছে। তমালকে দেখে শৈবাল বলল—কোথায় ঘুরিস এত রাত অব্দি? তমাল কোনও উত্তর দিল না। শুধু একবার জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাল বাবার দিকে। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে উঠতে তমাল শুনতে পেল বাবা বলছে, মা-কে—ছেলেটার ব্যবহার দিনদিন কীরকম পালটে যাচ্ছে দেখেছ? একটা কথা জিজ্ঞেস করলুম। কোনও উত্তর না দিয়ে চলে যাচ্ছে। মা বলল—ক্লান্ত হয়ে ফিরেছে তো বাড়িতে.....

—কী রাজকার্যে গেছিল শুনি। সময় পেরিয়ে যাচ্ছে আর কীরকম নিশ্চিন্তে বাড়িতে বসে সময় কাটাচ্ছে ছেলেটা দেখছ? ওর অ্যাটিচিউড একেবারে প্রফেশনাল

নয়। ও যে কী করবে, চাকরি বাকরি কী পাবে সেসব নিয়ে আমার চিন্তা।

—সব ঠিক হয়ে যাবে। মাথার ওপর গুরুদেব আছেন। তাঁর আশীর্বাদ আছে আমাদের সকলের ওপর।

—রাখো তোমার গুরুদেব। আশীর্বাদ নিয়ে ধুয়ে জল খাব? দিনকাল কীরকম পড়েছে তোমাদের কোনও ধারণা নেই। সব ব্যাপারে আজকাল ফাইট করতে হবে। অথচ তমুর ফাইটিং স্পিরিটটাই নেই।..... তমাল আর কিছু শুনল না। চানঘরে ঢুকে গেল।

অনেক রাতে খাওয়া দাওয়ার পর ছাদে সিগারেট খেতে উঠে শৈবাল তমালকে ডাকল। পরিষ্কার নীল আকাশ। চারপাশ কী নির্জন। একটা উড়ান মেঘের অনেক ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। কয়েকটা লাল আর সবুজ আলো সংকেতের মতো জ্বলছে আর নিভছে।

শৈবাল জিজ্ঞেস করল—কমপিটিটিভ এগজ্যাম-এর জন্যে প্রিপারেশান কীরকম প্রোগ্রেস করছে?

তমাল উত্তর দিল না।

শৈবাল ধমকে উঠল—কথার উত্তর দিচ্ছ না কেন?

তমাল উত্তর দিল না।

শৈবাল আরও জোরে ধমকে উঠল—কী বেয়াদপি হচ্ছে রাস্কেল? কথার উত্তর দিচ্ছিস না কেন? শৈবাল শুনল তমাল হিস্‌হিস্ স্বরে বলছে—আজ বিকেলে পার্ক স্ট্রিটে আমি সব দেখেছি। ট্যাক্সি.....ম্যাগনোলিয়া বার.....প্যান্ট-শার্ট পরা এক মহিলা.....আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করব না ঐ মহিলা কে। আমি কাউকে বলব না। শুধু একটা রিকোয়েস্ট বাবা।..... মাকে এভাবে ঠকিয়ো না। আমার মা খুব ভাল.....।

স্তম্ভিত শৈবাল দাঁড়িয়ে রইল। তমাল সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে যাচ্ছে.....।

১৯

আজ এই এলাকায় উপনির্বাচন। লোকসভা উপনির্বাচন। কিছুদিন আগে এখানকার এম.পি. মারা যান। ফলে এই উপনির্বাচন। প্রথম যখন আঠারো বছর বয়সে সে ভোটার হয় তাকে ভোট দিতে হয়েছিল বিধানসভা নির্বাচনে। আর দ্বিতীয়বার বোধহয় বছর দুই আগে সে আবার ভোটকেন্দ্রে যাবার সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু ভোট দিতে পারেনি। একটু দুপুর নাগাদ সে তাদের পাড়ার ভোটকেন্দ্রে ভোট দিতে গিয়ে শুনেছিল, তার ভোট পড়ে গেছে। এটা কী করে সম্ভব হল সে জানে না। অনেক কিছুই সে আজকাল বুঝতে পারে না। কিংবা অনেক কিছু তার এখনও বোঝা বাকি আছে।

বুথের প্রিসাইডিং অফিসার যখন তাকে বলেছিল—আপনি তো ভাই ভোট দিয়েছেন? তখন তমালের খুব রাগ হয়ে গিয়েছিল। সে বলেছিল—কী আজেবাজে কথা বলছেন? আমি যদি একবার ভোট দিয়েছি তাহলে আবার ভোট দেব কেন? ঐ বুথে আরও অনেকে ছিল। পোলিং অফিসারেরা ছিল। পোলিং এজেন্টরা ছিল। গোলমালের আভাস পেয়ে একটা চাপা গুঞ্জন উঠেছিল। তমাল উত্তেজিত হয়ে রীতিমতো তর্ক জুড়ে দিয়েছিল অফিসারদের সঙ্গে। প্রিসাইডিং অফিসার তার ডান হাতের তর্জনী পরীক্ষা করেছিল। সেখানে কালির কোনও চিহ্ন নেই। যে ভোট একবার দিয়েছে তার হাতে তো কালির মার্ক থাকবে। তখন প্রিসাইডিং অফিসার তমালকে জানিয়েছিল যে, তার নামে ফলস্ ভোট পড়ে গেছে। তমাল আর ভোট দিতে পারবে না। তবে একটা উপায় আছে। সে যদি একান্তই ভোট দিতে চায়, টেন্ডার ভোট দিতে পারে। টেন্ডার ভোট হ'ল সান্ত্বনা ভোট। সেই ব্যালট-পেপার ভোট-বাক্সে ফেলা যায় না। যে প্রার্থীর সপক্ষে ভোট পড়ে তার ভোট তাতে বাড়েও না। তমাল রেগেমেগে চলে এসেছিল। ভোট দেয়নি।

এবারের উপনির্বাচনে ভেবেছিল ভোট দেবে না। যা হচ্ছে হোক। সে আর ওসব ব্যাপারে মাথা ঘামাবে না। এমনিতেই সে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে আছে। বিশেষত নিজের বাবাকে সে যে অবস্থায় পার্ক স্ট্রিটে দেখেছিল সেটা সে ভুলতে পারছে না। তমাল কয়েক রাত ভাল করে ঘুমোতেও পারছে না। তার শুধুই মনে হচ্ছে, বাবা একটা মিথ্যের জীবন কাটাচ্ছে। বাবার একটা গোপন জীবন আছে। সেই জীবনের কথা মা জানে না। অথচ তমাল জেনে গেছে। সবথেকে খারাপ লাগে যখন তমাল দ্যাখে বাবাকে খুশি করার জন্যে সংসারে মা কীরকম প্রাণপাত করছে। তাদের সংসারে সচ্ছলতা আছে এটা ঠিক। কাজের লোক আছে। মা বললেই বাবা বাড়িতে রাঁধুনি রাখতে পারে। বাবা অনেকবার সে কথা বলেওছে। কিন্তু মায়ের এক কথা। তিনজনের রান্না আমি নিজে হাতে করব। এর জন্যে রাঁধুনি রাখার দরকার নেই। প্রায় সারাদিন মা রান্নাঘরে কাটায়। প্রতিদিনই রান্নার পদে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করে। বাবাকে খুশি করার জন্যে, ছেলেকে খাইয়ে তৃপ্তি দেবার জন্যে মায়ের চেষ্টার অন্ত নেই। ইদানীং বাবার সুগার ধরা পড়েছে। তাই মায়ের দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। দিনরাত মায়ের একটাই চিন্তা। বাবার শরীরটা যাতে ভাল থাকে। বাবা যেন সুস্থ থাকে। মায়ের এই আন্তরিকতা কত গভীর। কিন্তু বাবা তো সেরকম নয়। তমাল জেনেছে বাবা মিথ্যে কথা বলে। বাবা দিল্লি যাবার কথা বলে আসলে দিল্লিতে যায়নি। এই কলকাতাতেই ছিল। অন্য এক মহিলার সঙ্গে সময় কাটায় বাবা। হয়ত রাতও কাটায়। কিন্তু মা কিছু জানে না। বাবা ভালোমানুষের মতো মুখ করে মায়ের সঙ্গে কথা বলে। হাসি-ঠাট্টা করে। কিন্তু তমাল জানে এসব মিথ্যে, এসব অভিনয়। মায়ের আন্তরিকতার, বিশ্বাসের, সরলতার কোনও মূল্যই দেয়নি

বাবা। একে কি প্রতারণা বলে না? আজকাল তমাল বাবার মুখোমুখি হয় না। শৈবালও ছেলেকে এড়িয়ে যায়। কেউ কারোর মুখোমুখি হয় না। শুধু নিদারুণ এক সত্য বুকের মধ্যে নিয়ে তমাল ছটফট করে। তার কষ্ট হয়। এমনকী কদিন সে ইন্দ্রানীদের বাড়িও যায়নি। খুকুকে দেখা হয়নি। একদিন ইন্দ্রানী ফোন করেছিলেন। তমালের খোঁজ-খবর নিচ্ছিলেন। তমাল কবে তাদের বাড়ি আসবে জিজ্ঞেস করছিলেন। তমাল উত্তরটা এড়িয়ে গেছে। সে বলেছে কয়েকটা ব্যাপার নিয়ে একটু ব্যস্ত আছে। সময় পেলেই যাবে।

তমালও আজকাল মাঝে মাঝে ডায়েরি লেখে। সে একদিন লিখে রেখেছে— "কোন্ সময়ে আমরা বাস করছি এই পৃথিবীতে! যখন আবিষ্কার করতে হয় বাবা সত্যবাদী নয়। যখন বুঝে নিতে হয় আদর্শের কথাবার্তা সব বানানো, মেকি। সবাই চাইছে পেশাদারের জীবন। সবাই চাইছে যে কোনও মূল্যে সফলতা, খ্যাতি, প্রতিপত্তি, অর্থ এবং প্রচারের আলো। এই সময় আমাকে কষ্ট দেয়। আমার মনে শান্তি নেই। আমি এখন বুঝতে পারছি অনেক যন্ত্রণা নিয়ে কেন সুহাসকে আত্মহননের রাস্তা বেছে নিতে হয়েছিল। আমার চারপাশের পরিবেশ দূষিত। স্বস্তিতে নিঃশ্বাস নেবার উপায় নেই। কাউকে বিশ্বাস করা যায় না আজকাল। হয়ত নিজেকেও নয়। অসহ্য এই পরিবেশে আমি কীভাবে বাঁচব।....."

ভোটকেন্দ্রে যাবার জন্যে রাস্তায় বেরিয়েছে তমাল। ভোটের দিন সরকারি অফিসে ছুটি থাকে। স্কুল-কলেজেও ছুটি থাকে। রাস্তায় তেমন ভিড় থাকে না। চায়ের দোকানগুলোর সামনে জটলা থাকে। যানবাহনও তেমন চলাচল করে না। তমালদের ভোটকেন্দ্র তাদের বাড়ি থেকে একটু দূরে। বড়রাস্তা থেকে কিছুটা ভেতরে। একটা গলির ভেতরে প্রাইমারি স্কুলে। প্রথমে ভোট দিতে যাবে না ভেবেও তমাল শেষ পর্যন্ত ঠিক করল ভোট দিতে সে যাবে। নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার সে নষ্ট করবে কেন? সে এই দেশের একজন নাগরিক। ভোটের অধিকার সে যখন পেয়েছে, তা নষ্ট হতে দেওয়া ঠিক নয়। কাকে ভোট দেবে তমাল? এই লোকসভা কেন্দ্রে অনেকজন প্রার্থী। পাঁচ জন। তিনটি রাজনৈতিক দল থেকে তিনজন প্রার্থী। তাদের মধ্যে একজন অপরেশ-স্যার। আর বাকি দুজন নির্দল প্রার্থী। পাঁচজন প্রার্থীর পক্ষ থেকেই ভোটের কাগজপত্র দেওয়া হয়েছে তমালদের বাড়িতে। প্রত্যেকেই ভোটের জন্যে আবেদন জানিয়েছে। সেইসব কাগজপত্র পড়ে তমাল জানতে পেরেছে, পাঁচজন প্রার্থী। একজনকে ভোট দিতে হবে। কাকে দেবে সে নিজের অমূল্য ভোট। তমাল মনে মনে হেসেছিল। কাকে আবার দেবে? অপরেশস্যারকে। ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন স্যার সেই দলের প্রার্থী হয়ে যারা তাঁকে অপমান করেছিল একদিন। তাঁর সত্যকথনকে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকে কোনও পাত্তাই দেয়নি। তারপর কোন ফুসমন্তরে স্যারের সঙ্গে তাঁর পার্টির সব বিরোধের নিস্পত্তি হয়ে

গেছে। সেই রাজনৈতিক দলের হয়ে অপরেশ স্যার নির্বাচনে লড়ছেন। এই ব্যাপারটা তমালের হয়ত পছন্দ নয়। কিন্তু ভোট যদি দিতে হয় অপরেশস্যারকেই সে দেবে। এটা তো ঠিক যে প্রার্থী হিসেবে অপরেশ সত্যিই যোগ্য। তিনি শিক্ষিত মানুষ। এলাকার একজন শিক্ষক হিসেবে তাঁর ভাবমূর্তি যথেষ্ট উজ্জ্বল। রাজনীতি ভাল বোঝেন। একজন অসাধারণ বক্তা! অতএব তিনি এলাকার এম.পি. হলে নিশ্চয়ই ভালোই হবে।

কিন্তু কে জানত আজ ভোট দিতে এসেও তমালের খুব খারাপ অভিজ্ঞতা হবে?

ভোটকেন্দ্র সেই প্রাইমারি স্কুল। গলির কিছুটা ভেতরে। তমাল সেদিকেই আসছিল। কিন্তু গলির কাছাকাছি আসতেই সে দেখল জায়গাটা কীরকম থমথম করছে। গলির ঠিক মুখে তিনটে রাজনৈতিক দলের শিবির হয়েছে। শিবিরে বসে রাজনৈতিক দলের সমর্থক বা কর্মীরা ভোটাররা কতজন বুথে ভোট দিতে আসছে তার একটা হিসেব রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু একটা শিবির ছাড়া অন্য শিবির দুটোতে কোনও লোকজন নেই। দুটো শিবির খাঁ খাঁ করছে। পোস্টার ছেঁড়া মাটিতে লুটোপুটি খাচ্ছে। শুধু একটা শিবির এখনও অক্ষত আছে, বেশ কিছু মানুষের জটলা সেখানে। ঐ শিবিরের পোস্টারগুলো অবশ্য ঠিকই আছে। ছেঁড়া হয়নি। সেই পোস্টারে প্রার্থী হিসেবে অপরেশ রায়-এর নাম দেখা যাচ্ছে। তাহ'লে কি এটা অপরেশ রায় যে রাজনৈতিক দলের প্রার্থী, সেই দলের শিবির? তমাল কিছুই বুঝতে পারছিল না। একজন বয়স্ক মানুষ রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন অনিশ্চিতভাবে। তমালকে দেখে তিনি নীচু স্বরে জিজ্ঞেস করলেন—কোথায় যাচ্ছেন ভাই? তমাল উত্তর দিল—কেন ভোট দিতে? বয়স্ক মানুষটি বললেন—যাবেন না। বুথে গন্ডগোল হচ্ছে। —কী গন্ডগোল? ভদ্রলোক এধার ওধার তাকালেন। তারপর নীচু গলায় বললেন—অপরেশ রায়ের পক্ষে ছাপ্পা ভোট পড়ছে। ওরা বুথ জ্যাম করে দিয়েছে। কোনও ভোটারকে ঢুকতে দিচ্ছে না। একজন গুন্ডা রিভলভার নিয়ে সকলকে শাসাচ্ছে। বুথের মধ্যে ঢুকলেই ফিনিশ করে দেবে। —কী বলছেন? মগের মুলুক নাকি? পুলিশ নেই? —পুলিশ মানে দুজন হোমগার্ড ছিল। লাঠি নিয়ে দুটো ছোকরা। ব্যাপার দেখে তারা কোথায় সটকে পড়েছে!

—তার মানে কী বলছেন? ভোট দিতে পারব না?

—লাইফ-রিস্ক হয়ে যাবে। অল্প বয়স। কী দরকার ঝামেলায় গিয়ে? বাড়ি ফিরে যান।

—নাহ, বাড়ি ফিরব কেন? আমি ভোট দেব। —এই কথা যেন নিজেকেই বলে তমাল গলির মধ্যে ঢুকে গেল। বুথের কাছাকাছি যেতেই দুজন যুবক যেন মাটি ফুঁড়ে সামনে এল।

—কোথায় যাচ্ছেন ভাই? —একজন জিজ্ঞেস করল।

—ভোট দিতে।

—আপনাকে আর কষ্ট করে ভোট দিতে হবে না। সব ভোট আমরা দিয়ে দিচ্ছি। তমাল বলল—কী আজেবাজে বকছেন? রাস্তা ছাড়ুন। আমার ভোট আমি নিজে দেব। —এই কথা বলে সে এগিয়ে যাচ্ছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে আর একজন যুবক তার হাত চেপে ধরল। জিনস ট্রাউজার আর কালো রাউন্ড-নেক গেঞ্জি যুবকের পরনে। লম্বা, ছিপছিপে চেহারা। গালে চাপ দাড়ি। চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ।

—ওহে চাঁদু বাড়ি ফিরে যাও। আর ভোট দিতে হবে না। —সে বলল।

—কেন ভোট দেব না? আমার নাগরিক অধিকার আমি প্রয়োগ করতে পারব না?

—ভাগ শালা! এখান থেকে। আবার লেকচার ঝাড়া হচ্ছে? হাতে এটা কি দেখছিস?

তমাল দেখল যুবকের হাতে একটা রিভলভার। তার বুক কেঁপে উঠল। যুবক আবার বলল—কেটে পড়ো। তা না হ'লে এমন প্যাঁদানি দেব বাপের নাম ভুলে যাবি। তমাল পেছু হঠে ফিরে এসেছিল। সে যখন গলি থেকে বেরিয়ে আসবার জন্যে পেছন ফিরেছে, তখন তার কানে এল একজন যুবক হাসতে হাসতে বলছে—শালা যা চলচে তাতে মনে হচ্ছে অপরেশ রায় এখানকার সব ভোটই পাবে।

—সেটা যেন না হয়। —রিভলভার দেখিয়েছিল যে যুবক সে কথা বলছে বুঝতে পেরেছিল তমাল। যুবক বলছিল—এই লাট্টু তুই বুথের ভেতরে যা। অপারেশনটা এমনভাবে করতে বল যাতে অপরেশ রায়ের বিপক্ষেও কিছু ভোট পড়ে। তা না হ'লে আবার নিউজপেপারগুলো পোঁদে লাগবে।

তমাল পালিয়ে এসেছিল ভয়ে। বাড়ি ফেরেনি। সে অনেকক্ষণ পৌরসভার পার্কে সিমেন্টের বেঞ্চিতে বসেছিল। বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ তার গা ঘুলিয়ে উঠেছিল। সকালে জলখাবার খেয়েছিল সে বাটার-টোস্ট আর ওমলেট। হঠাৎ ওমলেটের টক ঢেঁকুর গলার কাছে অনুভব করেছিল সে। চিনচিন করছিল গলা। বমি করতে হয়েছিল তমালকে। হড়হড়ে বমি। পার্কে তেমন লোকজন ছিল না। ভোটের দিন রাস্তাঘাট ফাঁকা থাকে। অফিস-কাছারি, স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকে। পার্কও ছিল ফাঁকা। তমাল যখন নিজের কষ্ট দুঃখ, ক্ষোভ সব বমি করে বের করে দিয়ে মুক্ত হতে চাইছিল তখন কেউ তাকে লক্ষ্য করেনি। দু-একটা রাস্তার কুকুর ছাড়া। কিন্তু বমি করেও মনের জ্বালা কমেনি। শরীরের জ্বালা হয়ত একটু কমেছিল। মনে শান্তি আসেনি। সেদিন গভীর রাতে শুয়ে তমাল ডায়েরিতে লিখেছিল—

"তুমি কেন নিজের শরীরে কেরোসিন ঢেলে দেশলাই কাঠি জ্বেলে দিয়েছিলে তা আমি এখন বুঝতে পারছি সুহাস। এই পৃথিবী একেবারেই বাসযোগ্য

নয়। জীবনের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে যাচ্ছে আমার। এই জীবন নিয়ে আমি কী করব???"

২০

উপনির্বাচনের ফলাফলে দেখা গেল অপরেশ রায় বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছেন। বিজয়মিছিল বেরিয়েছিল পাড়ায়। অনেক মানুষের লম্বা এক মিছিল। মিছিলে পুরোভাগে অপরেশ রায় হাঁটছিলেন। তার কপালে গোলাপ-রং আবির। মিছিলের অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকের কপালে আবির। বাতাসে আবির উড়ছিল। মিছিলের কেউ কেউ উন্মাদের মতো নাচানাচি করছিল। রাস্তার দুধারে মানুষ ভিড় করে দেখছিল সেই বিজয়মিছিল। উঁচু বাড়িগুলোর বারান্দাতেও ভিড় ছিল মানুষের। সবাইকে দু-হাত তুলে নমস্কার জানাচ্ছিলেন অপরেশ রায়। কে তাঁকে ভোট দিয়েছে আর কে দেয়নি সেই বিচার তিনি করবেন কেন? তিনি দলমত নির্বিশেষে এলাকার সব মানুষকে অভিনন্দন জানাতে চান। আগামী দিনে সাংসদ হিসেবে তিনি এলাকার উন্নয়নমূলক অনেক কাজ করতে চান। সকলের পরামর্শ এবং সহযোগিতা তাঁর দরকার।

ভিড়ের মধ্যে থেকে হঠাৎ ছুটে এসেছিল এক যুবক। অপরেশের দিকে ছুটে এসেছিল। তাকে সামনে ওভাবে ছুটে আসতে দেখে অপরেশ বেশ অবাক হয়েছিলেন। তিনি দেখেছিলেন যুবক দৃশ্যত উত্তেজিত। তার মুখের ভাব কঠিন। নাকের দুই পাটা ফুলে আছে। বেশ দ্রুত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে তার। উন্মত্ত সমর্থকদের জটলা-ভিড় ঠেলে যুবক অপরেশের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল। অপরেশ থেমেছিলেন। অবাকও হয়েছিলেন বেশ। তমালকে এত উত্তেজিত লাগছে কেন?

—কিছু বলবে তমাল? —অপরেশ জিজ্ঞেস করেছিলেন।

—আপনাকে বিপুল ভোটে জেতার জন্যে অভিনন্দন। —তমাল বলেছিল। উত্তরে অপরেশ কিছু বলেননি। শুধু হেসেছিলেন। গর্বের হাসি। আত্মপ্রত্যয়ও ছিল সেই হাসিতে। কে একজন এসে তমালের কপালে এবং গালে গোলাপি আবির লেপে দিয়েছিল। বারবার জয়ধ্বনি উঠছিল অপরেশের নামে। তমাল বাধা দেয়নি। সকলের মতো সেও আবির মেখেছিল। তারপরও অবশ্য সে অপরেশের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল।

—আর কিছু বলবে তমাল? —অপরেশ জিজ্ঞেস করেছিলেন।

—হ্যাঁ বলব।

—কী বলতে চাও? যদি আরও কিছু বলতে চাও একদিন বাড়িতে এসো। এটা কি কথা বলার জায়গা?

—নাহ স্যার বাড়িতে আর যাব না। আপনি এখন একজন এম.পি.। সবসময়েই

ব্যস্ত থাকতে হবে আপনাকে। এবেলা ওবেলা দিল্লি যেতে হবে। আপনি এখন জননেতা। বাড়িতে গিয়ে আপনার অমূল্য সময় আর নষ্ট করব না। শুধু একটা প্রশ্ন.....

—কী প্রশ্ন?

—অনেকদিন আগে আপনি আমাকে বলেছিলেন—মানুষ সাময়িকভাবে হেরে যেতে পারে, দমে যেতে পারে, বিশ্বাস হারাতে পারে। কিন্তু মানুষকে কখনও নষ্ট করা যায় না। এটা কি ঠিক স্যার? এখনও কী আপনি বিশ্বাস করেন যে মানুষকে নষ্ট করা যায় না?

—হঠাৎ এরকম প্রশ্ন করছ কেন?

—কারণ আমার ধারণা আপনি এখন একজন নষ্ট মানুষ। আপনি এখন যাদের সঙ্গে ওঠাবসা করবেন তারাও প্রত্যেকে নষ্ট মানুষ।

বেশ চেঁচিয়ে বলেছিল কথাগুলো তমাল। অনেক মানুষের সামনে বলেছিল। অপরেশ ভীষণ অপমানিত বোধ করেছিলেন। রেগে গিয়েছিলেন তিনি ভীষণ। প্রকাশ্যে এত রাগতে তাঁকে কেউ কোনওদিন দেখেনি। রাগে কাঁপছিলেন অপরেশ। সপাটে একটা চড় কষিয়েছিলেন তমালের গালে। আশপাশ থেকে অনেকে ছুটে এসেছিল। তমালের কলার ধরেছিল একজন। আবিরে লোকটার মুখ কিম্ভূত হয়ে গেছে। তাকে চেনাও যাচ্ছিল না।

—এই শুওরের বাচ্চা! স্যারকে কী বলেছিস রে? —লোকটা জিজ্ঞেস করেছিল। অপরেশ তার হাত তমালের কলার থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। চাপা স্বরে বলেছিলেন—ছেড়ে দাও মনা। ওকে মেরো না। ওকে ইগনোর করো.....।

তমালের ঠোঁটে চাপা হাসি ছিল। সে ঠিকই বুঝেছে। অপরেশ নষ্ট হয়ে গেছেন। নিজে এভাবে প্রকাশ্যে অপমানিত হওয়ার জন্যে নয়; বরং অপরেশের জন্যে তমালের মনটা হু হু করে উঠেছিল। সে জানে, অপরেশ যত সম্মানই পান; ক্ষমতার শীর্ষে উঠুন, খবরের কাগজে তাঁর ছবি ছাপা হোক; কোনওদিন তিনি শান্তি পাবেন না। নষ্ট হয়ে যাওয়ার গোপন দুঃখ তাঁকে চিরকাল বয়ে বেড়াতে হবে। কেউ বুঝবে না জীবনে খ্যাতি, প্রতিপত্তি, প্রচারের আলো পেয়েও কেন অপরেশ অসুখী।

তারপর আর কী করবে তমাল? এলোমেলো সে রাস্তায় ঘুরেছিল অনেক। বিকেল গড়িয়ে সন্ধে নামলে সে একা একা পৌরসভার পার্কের নির্জনে গিয়ে বসেছিল। এই পার্ক এককালে বেড়াবার জায়গা ছিল। এখন শ্রীহীন। টাকার অভাবে পৌরসভা ঠিকমতো পার্কের মেনটেনান্স করতে পারে না। ঘাস ছাঁটা হয় না। আগাছা জন্মে গেছে। সন্ধের পর পার্কের আলোগুলো প্রায় জ্বলেই না। মাতাল আর গেঁজেলদের ভিড়। আজও পার্কের ভেতরটা প্রায় অন্ধকারই। তমালের আসলে অন্ধকারেরই প্রয়োজন ছিল। অন্ধকারে বসে ছিল সে চুপচাপ। কিছুই ভাবছিল না।

কিংবা সুহাসের কথা ভাবছিল। এতদিন পর তমাল যেন বুঝতে পারছে কেন সুহাস ওরকম ভয়ঙ্করভাবে নিজেকে জ্বালিয়ে দিয়েছিল, পুড়িয়ে দিয়েছিল। সারাদিন তমাল ভেবেছে সেই বা কেন বেঁচে থাকবে? জীবনের প্রতি আর কোনও আস্থাই সে পাচ্ছে না। নিজের চারপাশে সে শুধু দেখতে পাচ্ছে, মূল্যবোধের অবক্ষয়। যারা দুর্নীতিগ্রস্ত তাদেরই যেন আজকের সমাজে প্রতিপত্তি বেশি। মানুষ পচে গেছে। নষ্ট হয়ে গেছে। যেন তেন প্রকারে মানুষ চাইছে অর্থ, খ্যাতি, সম্মান। ধারাবাহিক এক পতনের দিকে সবাই যেন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। এই সমাজে সুহাস সুস্থ বোধ করেনি। তমালও ক্রমশ অসুস্থ হয়ে পড়বে। হয়তো পাগল হয়ে যাবে সে। রাস্তায় রাস্তায় পাগল হ'য়ে ঘুরে বেড়াবে। বাচ্চা ছেলেরা তাকে দেখে টিটকিরি দেবে। ঢিল ছুঁড়বে। খিদে পেলে সে কুকুর-বেড়ালের সঙ্গে আঁস্তাকুড় থেকে খাবার খুঁটে খাবে। এসব ভেবে শিউরে ওঠে তমাল। এরকম পরিণতির থেকে মৃত্যুও ভালো। সে মৃত্যুকেই বেছে নেবে। কীভাবে মরবে তমাল? আর বেঁচে থেকে লাভ কী? নিজের বাবা মিথ্যেবাদী সে জানে। অবৈধ জীবন আছে তার বাবার। আর একজনকে সে খুব পছন্দ করত। অপরেশ স্যার। কিন্তু অপরেশ-স্যার নষ্ট হয়ে গেছেন সে জানে। তাহলে আর কেন বাঁচবে তমাল? সে নিজের হাতে নিজেকে পুড়িয়ে মারবে। সুহাসের মতো। কিংবা একগাছা দড়ি নিয়ে নিজেকে ফ্যানের ব্লেডে ঝুলিয়ে দেবে। মৃত্যু কত সোজা! তমালের মনে হয়। সুহাসের ডায়েরিতে সে পেয়েছিল একটা লাইন—'মৃত্যু দু-তিন পয়সার খেলা'। সত্যিই বোধহয় তাই। মৃত্যু দু-তিন পয়সার খেলা—। মৃত্যুকে আজ বড় নিজের মনে হয়। তমাল মরতে চায়। আর যন্ত্রণা পেতে সে চায় না। মরতে চায়। শান্তি চায়। শুধু এক টুকরো কাগজে সে লিখে রেখে যাবে—'আমার মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয়'—। যারা মৃত্যুকে ভালবাসে তারা এরকম লিখে রেখে যায়।

পার্কের সিমেন্ট-আসনে বসে তমাল ঝরঝর কাঁদছিল। তার এই কান্না কেউ জানবে না। শুধু সে ছাড়া। জীবনকে তো সে ভালবাসতেই চেয়েছিল। বাঁচতে চেয়েছিল সকলকে নিয়ে। সুহাসও তাই চেয়েছিল। কিন্তু সুহাস বাঁচতে পারেনি। তমালও পারবে না।

—তোমাকে বাঁচতে হবে তমাল!..... কে যেন কথা বলল। কে? তমাল অন্ধকারে এপাশ-ওপাশ তাকাল। কে কথা বলল? কে তার নাম ধরে ডাকল? ধারে-কাছে কেউ নেই। কিন্তু সে স্পষ্ট শুনেছে একজনের স্বর।

—কে কথা বলছ? —তমাল জিজ্ঞেস করল।

—আমি কথা বলছি। সুহাস। —অন্ধকার ভেদ করে ভেসে এল।

—সুহাস? কী বলতে চাইছ তুমি?

—আমি বলতে চাইছি তোমাকে বাঁচতে হবে।..... বাঁচতেই হবে!

—কী জন্যে আমি বাঁচব? বেঁচে থাকার জন্যে মানুষের কিছু স্বপ্ন থাকে, আদর্শ থাকে। আমার সামনে কোনও আদর্শ নেই, আমার চোখে কোনও স্বপ্ন নেই। আমি আজ বুঝতে পারছি কেন তুমি আত্মহত্যার পথ বেঁচে নিয়েছিলে.....।

—আমি ভুল করেছিলুম তমাল। জীবন বড় অমূল্য। আমি বুঝিনি। সাময়িক আবেগের বশে আমি যে কাজ করেছিলুম তাকে আর কি বলা যায় হটকারিতা ছাড়া?

—হটকারিতা?

—হ্যাঁ হটকারিতা। একটাই জীবন দেওয়া হয়েছে মানুষকে। যত আঘাতই আসুক সেই জীবনকে অস্বীকার করা ঠিক নয়। আর শুধু নিজের জন্যেই বা বাঁচবে কেন তুমি? তোমাকে তো অন্যের জন্যেও বাঁচতে হবে।

—অন্যের জন্যে বাঁচব? সেটা কীরকম সুহাস?

—অপরের মঙ্গল কামনা করে বাঁচা। চারপাশের মানুষের জন্যে কিছু করার চেষ্টা সেটাও একধরনের বাঁচা। শুধু নিজের কথা ভাবছ কেন? এই পৃথিবীতে কি তোমার আপনার জন কেউ নেই?

—হ্যাঁ আছেন। বাবা আর মা। বাবার কার্যকলাপ আমাকে জীবনকে ঘৃণা করতে শিখিয়েছে। আর মা বড় সরল। বড় ভালমানুষ। এই পচে যাওয়া জীবনে তিনিও বড় অচল।

—জীবন কখনও পচতে পারে না তমাল। ওটা তোমার ভুল ধারণা। আসলে আমরা যারা সাধারণ মানুষ তারা ঠিক জীবনের মাধুর্যকে আবিষ্কার করতে পারি না। তাই জীবনের প্রকৃত আস্বাদ এবং সৌন্দর্যও আমাদের হাতের বাইরে থেকে যায়। তুমি জীবনের সৌন্দর্য আবিষ্কার করবে না তমাল? তুমি ভালবাসবে না? প্রকৃত ভালবাসতে পারলে তবেই তো জীবনকে ভালবাসতে পারা যায়।

—ভালবাসা? আমি কি কাউকে ভালবাসি?

—নিজের মনকে জিজ্ঞেস করো।

—আমি কাকে ভালবাসি?..... ভালবাসা নিয়ে আমি তেমনভাবে কোনওদিন ভাবিনি সুহাস।

—কেন ভাবোনি? একজন তো তোমাকে ভালবাসে? সে নিজের ভালবাসা হয়তো প্রকাশ করতে পারে না। কিন্তু তোমাকে খুব ভালবাসে। তোমার আশায় অপেক্ষা করে সারাদিন। কখন তুমি আসবে।

—তুমি কি খুকুর কথা বলছ?

—আমি খুকুর কথা বলছি। খুকুকে তুমি ভালবাসো তমাল। খুকুকে ভালবাসতে পারলে তোমার মনে হবে জীবন কত সুন্দর। খুকুর জন্যে তোমাকে বাঁচতে হবে তমাল।

—খুকুর জন্যে বাঁচতে হবে? কিন্তু শুধু ভালোবাসা দিয়ে আমি খুকুর কতটা উপকার করতে পারি? খুকুর যে বড় কষ্ট। সে প্রতিবন্ধী। জন্ম-প্রতিবন্ধী। তার কোমর থেকে শরীরের নিম্নাঙ্গ আজীবন অসাড়। এছাড়া কথা বলতে পারে না খুকু। হয়ত সে শুনতেও পায় না। শুধু ভালবাসা দিয়ে আমি খুকুর কতটা ভাল করতে পারি?

—নিশ্চয়ই পারা যায় তমাল। শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে মেনে নিয়েও অনেক মানুষ দিব্যি বেঁচে আছে। কোনও না কোনও সৃষ্টিশীল কাজের মধ্যে দিয়ে বেঁচে আছে। আমাদের সামনে কি কোনও উদাহরণ নেই? বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং-এর কথা কী তুমি জানো না?

—হ্যাঁ। স্টিফেন হকিং। কিন্তু তিনি তো অসাধারণ প্রতিভাবান।

—অনেক সাধারণ মানুষও আছে। ভয়ংকর শারীরিক প্রতিবন্ধকতা নিয়েও কিছু না কিছু কাজের মধ্যে তারা বেঁচে থাকার প্রেরণা খুঁজে নিয়েছে। জীবনকে অস্বীকার করেনি তারা। বরং নতুন উদ্যমে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছে জীবনকে। খুকুকে তুমি সেরকমভাবে বাঁচতে শেখাতে পারো না?

—কীভাবে বাঁচতে শেখাব খুকুকে?

—কেন? আজকাল প্রতিবন্ধীদের জন্যেও তো কতরকম আবিষ্কার করেছে বিজ্ঞান। কোমর থেকে পা পর্যন্ত অসাড় প্রতিবন্ধীরাও হুইল চেয়ারের সাহায্যে চলে-ফিরে বেড়াচ্ছে। অসাধ্য সাধন করছে। কানে শুনতে পায় না যে প্রতিবন্ধী তার জন্যে যন্ত্র আছে। নিজেদের কীভাবে প্রকাশ করতে হয় তার জন্যে প্রতিবন্ধীদের স্কুল আছে। তুমি খুকুকে নতুনভাবে বাঁচার দিশা তো দেখাতেই পারো। খুকুর জন্যে এতকাল এসব ভাবা হয়নি। কে ভাববে? একা মায়ের পক্ষে সব ব্যবস্থা করা কী সম্ভব। আঘাতে আঘাতে তাঁর জীবন তো শুকিয়ে এসেছে। বয়স হয়েছে মায়ের। একমাত্র তোমার উদ্যোগের ওপরই নির্ভর করছে খুকুর নতুনভাবে বাঁচতে শেখা।

তমালের শরীরের মধ্যে বিচিত্র শিহরন! এভাবে সে আগে কোনওদিন ভাবেনি। সুহাস তাকে ভাবতে শেখাল। নাহ, সে আত্মহননের চিন্তা আর করবে না। সে বাঁচতে চাইবে নতুন উৎসাহে, উদ্যমে। খুকুকে বাঁচতে শেখাবে। খুকুকে মানুষের মতো বাঁচতে শেখাবে। নিজের প্রতিবন্ধকতাকে মেনে নেবে না খুকু। কিংবা শারীরিক সীমাবদ্ধতা মেনে নিয়েও খুকু বাঁচতে শিখবে। কাজের মধ্যে বাঁচবে খুকু। উদ্যোগের মাঝে বাঁচবে। আর খুকুকে বাঁচতে শেখানোর মাঝেই তমাল খুঁজে পাবে বাঁচবার অনুপ্রেরণা।

—তুমি ঠিক বলেছ সুহাস। শুনতে পাচ্ছো আমার কথা? উত্তর নেই। সন্ধে আরও ঘনীভূত হয়েছে। অন্ধকার আরও নিবিড় হয়েছে। কাছাকাছি সিমেন্টের বেঞ্চে কয়েকজন মানুষ এসে বসেছে। নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে। হাসছে। ওরা

তালও হতে পারে। তমালের একটু ভয় করল। তার মনে পড়ল, একটু বেশি রাতে এই পার্কের অন্ধকারে বসে থাকা নিরাপদ নয়।

কিন্তু সুহাস কোথায় গেল? সুহাস! সুহাস! তমাল ডাকল। কোনও উত্তর নেই। তাহ'লে সে কার সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলছিল? নিজের সঙ্গেই কী? নিজের সঙ্গে মানুষ কখনও কখনও কথা বলে। তাদের ভুলও হয়। তারা ভাবে অন্য কারোর সঙ্গে কথা বলছে। কিন্তু আসলে তারা নিজের সঙ্গেই কথা বলে। জীবনের অনেক জটিল প্রশ্নের উত্তর তারা নিজের কাছ থেকেই পেয়ে যায়। যেমন তমাল পেয়েছে। নাকি তমাল সত্যিই সুহাসের সঙ্গে কথা বলছিল এতক্ষণ? সুহাস শারীরিকভাবে পৃথিবীতে নেই। এটা ঠিক। সুহাস মৃত। কিন্তু মৃত্যুর পর মানুষের সত্যিই কি সব শেষ হয়ে যায়? তাহ'লে এই যে বলা হয় আত্মার মৃত্যু নেই, আত্মা অবিনশ্বর। এসব কথার কি কোনও ভিত্তি নেই? এরকমও কী হতে পারে না যে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অদৃশ্য ইথার-স্তরে সুহাসের অবিনশ্বর আত্মা ভাসমান? সুহাসই এতক্ষণ হয়ত কথা বলছিল তমালের সঙ্গে।

তমাল উঠে দাঁড়াল। তারপর অন্ধকারে হাঁটতে লাগল পার্কের গেটের দিকে। ঠিক ততটা অন্ধকার মনে হচ্ছে না এখন। আকাশে আধভাঙা চাঁদ আছে। হয়তো এতক্ষণ আকাশ জুড়ে মেঘ ছিল। এখন সরে গেছে মেঘ। তাই ভাঙা চাঁদের অল্প আলো চুঁইয়ে নামছে পৃথিবীতে। তমাল এখন সব দেখতে পাচ্ছে। পার্কের আগাছা মাড়িয়ে তার হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছে না।

রাস্তায় এল তমাল। গাড়ির চলমান মিছিল। মানুষ। আলোর রোশনাই। স্বচ্ছন্দ গতিতে সব ঠিকঠাক চলছে। হাতের ঘড়ি দেখল তমাল। রাত সাড়ে আট। কী আর এমন রাত? এখনও তো যাওয়া যায়। সে যাবে। পকেটের মানিব্যাগ খুলে দেখে নিল। দুটো একশো টাকার নোট আর কিছু খুচরো টাকা আছে। একটা ফাঁকা ট্যাক্সি গুটিগুটি এগিয়ে আসছে। তমাল হাত তুলে থামল ট্যাক্সিটা। উঠে বসল। গন্তব্য বলে দিল চালককে।

এত রাতে ডোরবেল বাজছে! ইন্দ্রানী জিজ্ঞেস করলেন কে?

—আমি মাসিমা। তমাল।

—তুমি? এত রাতে? —দরজা খুলে জিজ্ঞেস করলেন ইন্দ্রানী।

—চলে এলুম মাসিমা।..... খুকু কেমন আছে?

—খুকু? —ইন্দ্রানী দেখছিলেন তমালকে। তাঁর চোখে যেন বিস্ময়।

—কী হল মাসিমা? খুকু ভাল আছে তো?

—শারীরিক অসুবিধে তেমন কিছু নেই। খাওয়া-দাওয়া করেছে। কিন্তু এত রাত অব্দি তো খুকু জেগে থাকে না? আজ কেন জানি না জেগে আছে। অন্যদিন ঘুমিয়ে পড়ে। আজ এখনও ঘুমোয়নি। কীরকম এক অস্থিরতা যেন ওর চোখে-মুখে। কেন

বুঝতে পারছিলুম না। শুধু মনে হচ্ছিল, তুমি কয়েকদিন আসছ না। কোনও খবর নেই। খুকু কি তাই এত অস্থির হয়ে পড়েছে?

—এবার প্রত্যেকদিন আমি আসব মাসিমা। প্রত্যেকদিন। যত কাজই থাকুক।

—তুমি এলে খুকু ভাল থাকে তমাল।

—জানি মাসিমা।

দোতলায় উঠে আসে তমাল। খুকুর বিছানার সামনে এসে দাঁড়ায়। ইন্দ্রানী য ভেবেছেন তাই। প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে এক রহস্যময় আলো থাকে। যখন মানুষ অনুপ্রাণিত হয় তখন হৃদয়ের সেই আলো, সেই বিভা তার মুখমন্ডলেও ছড়িয়ে থাকে। যেমন এখন ইন্দ্রানী দেখতে পাচ্ছেন, খুকু আর তমাল দুজনেরই চোখ-মুখ হৃদয়ের অপূর্ব আলোয় উজ্জ্বল।

—খুকু আর বিছানায় শুয়ে থাকবে না কাকিমা। ওর জন্যে হুইল চেয়ারের ব্যবস্থা করতে হবে। ঘুরে ফিরে বেড়াবে ও আমাদের এই সুন্দর পৃথিবীতে। লেখাপড়া শিখবে। হাতের কাজ শিখবে। মানুষ হয়ে উঠবে খুকু। আমি ওকে সাহায্য করব আমি ওকে প্রেরণা দেব। বাঁচার প্রেরণা পাব আমিও। —তমাল বলছিল। আবেগে কাঁপছিল তার স্বর। তমাল একহাত পরম স্নেহে ও ভালবাসায় খুকুর কপালে রাখল। খুকুর চোখ থেকে গড়িয়ে নামছে ফোঁটা ফোঁটা মুক্তো।..... সেই অপূর্ব দৃশ্য ইন্দ্রানী দেখছিলেন। তাঁরও চোখ জলে ভরে উঠেছে। এই প্রথম প্রকাশ্যে কাঁদছেন তিনি। কিন্তু এ তো আনন্দের অশ্রু।..... বেদনাময় আনন্দের.....।